তরঙ্গিণী

তরুণিমা

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম্. এ., বি. এল্

প্রণীত

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

স্বদেশবাণী ভবন

৫৯বি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৯

১৩৬৩

ভূমিকা

এই গ্রন্থখানি কতিপয় প্রবন্ধের সমাবেশ মাত্র। তন্মধ্যে কয়েকটি কোন কোন সভায় সভাপতির অভিভাষণ-রূপে পঠিত হইয়াছিল।

প্রথম প্রবন্ধটির নামানুসারে গ্রন্থখানির নামকরণ করা হইয়াছে। তাছাড়া আরও একটু কারণ আছে। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে নানাদিকে নানাভাবে যে "তরুণ"-রোগের সংক্রামকতা পরিলক্ষিত হইতেছে, এই প্রবন্ধগুলিতে বিভিন্ন দিক্ দিয়া—বিশেষতঃ সাহিত্য ও শিক্ষা ও আচার-ব্যবহারের দিক্ দিয়া—সেই রোগের লক্ষণ নির্দ্দেশের সামান্য কিছু চেষ্টা করা গিয়াছে। কোন কোন স্থলে হয়ত প্রসঙ্গক্রমে এই আলোচনা আসিয়া পড়িয়াছে। গ্রন্থখানির নামের ইহাই দ্বিতীয় কারণ।

ভাষাতত্ত্বে degradation of words বলিয়া একটা ব্যাপার বর্ণিত আছে। নানা কারণে মাঝে মাঝে শব্দার্থের অধঃপতন ঘটিয়া থাকে। আমাদের "আধুনিকতা"-গ্রস্ত "প্রগতি"-যুগের বাঙ্গালাতে "তরুণ" শব্দটির এই প্রকার অধঃপতন ঘটিয়াছে। "তরুণ" শব্দে এখন আর টাট্‌কা তাজা যৌবনের নির্ভীক পৌরুষ ও অটুট বীর্য্যের সূচনা করে না, নবীন জীবনের স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত স্বচ্ছন্দ সতেজ অভিব্যক্তির দ্যোতনা করে না: শুধু একটা কৃত্রিম নধর চটুল লীলায়িত ভঙ্গিমার আবেশের সৃষ্টি করে, কিংবা একটা নিস্তেজ নির্ব্বীর্য্য ক্লান্ত-শ্রান্ত ক্ষয়-শিথিল অকাল-বার্দ্ধক্যের ব্যথাতুর করুণ ম্লানিমার ব্যঞ্জনা করে মাত্র। হালের বাঙ্গালী সমাজে "তরুণিমা" একটা morbid, anaemic ব্যাধিগ্রস্ততাতে পর্য্যবসিত হইয়াছে; এবং এই ব্যাধির লক্ষণ সমাজের নানাবিভাগে—সাহিত্যে, শিল্পে, শিক্ষায়, রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে—প্রায় সর্ব্বত্রই প্রকট হইয়াছে। প্রকৃত যে তারুণ্য—সুস্থ সবল যে তারুণ্য—যে তারুণ্যের লক্ষণ ঋজুতা দৃঢ়তা নিঃশঙ্কতা, যে তারুণ্যের পরিচয় আদর্শ-নিষ্ঠায়, অদম্য উৎসাহে, একাগ্র সাধনায়—আমাদের দেশে ও সমাজে সেই প্রকৃত তারুণ্যেরই একান্ত অভাব ঘটিয়াছে, এবং পুনরায় ইহার বিকাশ না করিতে পারিলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

এই প্রসঙ্গে তথাকথিত "আধুনিকতা" ও "তারুণ্য" সম্বন্ধে বিখ্যাত জার্ম্মাণ মনীষী Max Nordau-এর বজ্রনির্ঘোষ-বাণী স্বতঃই মনে উদিত হয়:

"In opposition to healthy art, which they deride as musty and antiquated, these 'modernists' pretend to represent youth. An ill-advised criticism has actually been caught by their lime, and emphasises their youth with constant irony. What clumsiness! As if any effort in the world could deprive of its charm the word 'young'—this essential notion of all that is blooming and fresh, this note of the dawn and the spring—and transform it into a term of reproach and insult! The truth, however, is that these 'modernist' degenerates are not only not young, but that they are weirdly senile. Senile is their splenetic calumniation of the world and life; senile are their babblings, drivellings, ravings and divagations; senile their impotent appetites, and their cravings for all the stimulants of exhaustion. To be young is to hope; to be young is to love simply and naturally; to be young is to rejoice in one's health and strength, and in that of all human beings, and of the birds of the air and the beetles in the

grass; and of these qualities there is not one to be met with among these youth-simulating decayed degenerates.

"Some among these degenerates in literature, music and painting have in recent years come into extraordinary prominence, and are revered by numerous admirers as creators of a new art and heralds of the coming centuries.

"We must resolutely set ourselves in opposition to these miserable mongers who seize upon our dearest watch-words, with which to entrap the innocent. The 'freedom' and 'modernity', the 'progress' and 'truth' of these fellows are not ours. We have nothing in common with them. They wish for self-indulgence; we wish for work. They wish to drown consciousness in the unconscious; we wish to strengthen and enrich consciousness. They wish for evasive ideation and babble; we wish for attention, observation and knowledge. The criterion by which true moderns may be recognized and distinguished from impostors

calling themselves 'moderns' must be this: Whoever preaches absence of discipline is an enemy of progress; and whoever worships his 'I' is an enemy to society.

"Society has for its first premise neighbourly love and capacity for self-sacrifice; and progress is the effect of an ever more rigorous subjugation of the beast in man, of an ever tenser self-restraint, an ever keener sense of duty and responsibility. The emancipation for which we are striving is of the judgment, not of the appetites." (Max Nordau : *Degeneration*).

এই বাণী আমাদের ব্যাধিগ্রস্ত বর্ত্তমান সমাজ-শরীরে সঞ্জীবনী শক্তির সঞ্চার করুক—ইহাই প্রার্থনা।

এই সামান্য গ্রন্থখানি যদি এই ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে আমার দেশবাসীকে সজাগ করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও সহায়তা করে, তবেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব। অলমতিবিস্তরেণ। ইতি

বৈশাখী পূর্ণিমা
১৯শে বৈশাখ, ১৩৪৬
কলিকাতা

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বিশ বৎসরের উপর হইল আমার কয়েকটি সাময়িক প্রবন্ধ ও বক্তৃতা—প্রধানতঃ শিক্ষা, সাহিত্য ও সমাজ-বিষয়ক—"তরুণিমা" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। সে গ্রন্থখানি এখন আর ছাপা নাই।

সেই প্রবন্ধ ও বক্তৃতাগুলি পুনর্মুদ্রিত করা হইল; এবং তৎসঙ্গে আরও কয়েকটি প্রবন্ধ ও বক্তৃতা এই সংস্করণে সংযোজিত হইল। ফলে, গ্রন্থের আকার দ্বিগুণের উপর বাড়িয়া গিয়াছে।

গ্রন্থখানির এই পরিবর্দ্ধিত সংস্করণের প্রতি দেশবাসীর পূর্ব্বের ন্যায় দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলেই আনন্দিত হইব। ইতি

রাখী পূর্ণিমা

২২শে শ্রাবণ, ১৩৬৭ **শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ**

কলিকাতা

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
তরুণিমা	...	...	১
লেখা ও পড়া	...	...	২৩
বাঙ্গালীর পত্রিকা	...	...	৩৭
বঙ্গসাহিত্যে অর্ব্বাচীন যুগ	...	....	৪৭
বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙ্গালার নবযুগ	...	...	৮১
বাঙ্গালায় লোকশিক্ষা	...	...	১০৩
রাষ্ট্রভাষা-সমস্যা	...	...	১২৯
বাঙ্গালা ভাষার রূপ	...	...	১৪১
বৃহত্তর বঙ্গ	...	...	১৬৭
সাহিত্যে প্রলাপ ও বিলাপ	...	...	২০৯
ছিন্ন-বঙ্গে শিক্ষা-সঙ্কট	...	...	২৩১
বিবেক-বুদ্ধি	...	...	২৫৫

তরুণিমা

তরুণিমা

ভাদ্র মাসের প্রায় শেষ। বহুদিন অনাবৃষ্টির পর গুমট কাটিয়া গিয়া কয়েকদিন হইল ধারাবর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। আজ সারাদিনই মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্ হইয়া রহিয়াছে, এবং ক্ষণে ক্ষণেই আকাশ ভাঙ্গিয়া এক এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যাইতেছে। এখন ঘোর সন্ধ্যা। সারাদিন কাজ কর্ম্মের খাটুনীর পরে চুপচাপ করিয়া বৈঠকখানায় বসিয়া আছি। এখন আর জোর বর্ষা নাই, শুধু টিপ্ টিপ্ করিয়া একটু একটু পড়িতেছে। প্রাত্যহিক সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইতেও আর ইচ্ছা হইতেছে না। কি করিয়া যে সময়টা কাটাই তাহাই বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছি। চারিদিকে যেন একটা অবসন্ন আচ্ছন্ন ভাব।

সে ভাবের কতকটা ছোঁয়াচ যে মনেও না লাগিয়াছে এমন নয়। বাড়ীতেও কোন কোলাহল নাই—সব নিঃঝুম। গৃহিণী বর্ষারম্ভের গোড়াতেই পিত্রালয়ে প্রস্থান করিয়াছেন—বোধ করি বিরহরস নিবিড়ভাবে অনুভব করিবার নিমিত্তই। সুতরাং কবির বর্ণনা,

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর,

একেবারে অক্ষরে অক্ষরে আমার বর্ত্তমান অবস্থার উপরে খাটিয়া গিয়াছে। এই মেঘমন্তর বর্ষামন্দ্রিত সন্ধ্যায় একাকী বসিয়া বসিয়া কতকটা যে তন্দ্রাতুর হইয়া আসিতেছিলাম তাহা স্বীকার না করিলে বোধ করি সত্যের অপলাপ হইবে।

হঠাৎ এক চমকে এই তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া দিয়া, এই টিপ্ টিপ্ বর্ষার মধ্যে, আমাদের বাড়ীখানির স্যাঁৎস্যেঁতে গলির সূচিভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া, এক বন্ধুবরের আবির্ভাব। আমি ত অবাক্। এমন বর্ষা-কাদার মধ্যে আবার মানুষ বাহির হয়? সিক্ত ছত্রখানি বৈঠকখানা ঘরের এক কোণে রাখিয়া দিয়া বন্ধু বিনা উপক্রমণিকাতেই প্রশ্ন করিলেন, "তুমি যে বসে বসে ঢুল্‌ছ বড়? ঝিমুচ্ছ কেন? আফিম্ টাফিম্ ধরেছ নাকি?"

আমি বলিলাম, "আর আফিম্ ধরতে হবে কেন? যা weather হয়েছে, এতেই যথেষ্ট আফিমের কাজ করে। কোন ভদ্রলোকে এই সময়ে রাস্তায় বেরোয় নাকি? আর কাজকর্ম্মও হাতে কিছু নেই, খবরের কাগজেও দুচারবার চোখ বুলিয়ে দেখলুম—সেই পুরোণো থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়,

যা তিন মাস থেকে পড়ে আসছি—সেই আদ্দিস্ আবাবা আর রোম, মুসোলিনির পাঁয়তাড়া কষা আর রাস্ তাফারির কান্নাকাটি, আর জেনিভার স্বয়ংসিদ্ধ কর্ত্তাদের অফুরন্ত কচায়ন। এ পড়ে পড়ে ঘেন্না ধরে গেছে। তাই খবরের কাগজে পাথর চাপা দিয়ে একটু যোগনিদ্রা অভ্যাস করছিলুম।"

বন্ধুবর অসহিষ্ণুভাবে বলিয়া উঠিলেন. "ঐ যোগনিদ্রাই ত দেশটাকে খেলে। হেম কবি ঠিকই বলেছিলেন, 'ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়'। বলি, আদ্দিস্ আবাবা আর রাস্ তাফারির সমস্যা ভেবে ভেবে মাথা খারাপ না করে, ঘরের সামনে যে ভীষণ কাণ্ডকারখানা হচ্ছে তার খবর রাখলেও ত পার?"

আমি বলিলাম, "ঘরের সামনে আবার কি এমন ভীষণ কাণ্ড ঘটল?"

বন্ধু বলিলেন, "শোন নি? বেশ লোক যা হোক্! এই সেদিন জয়পুর থেকে গান্ধীর চেলা এক পণ্ডিত রামশর্ম্মা কল্‌কাতা এসে উপস্থিত। তিনি পণ করেছেন, যে পর্য্যন্ত না কালীঘাটে মা কালীর সামনে পাঁঠা বলি বন্ধ হবে, সে পর্য্যন্ত তিনি অনাহারে থাকবেন। এই ভীষণ পণের কথা শুনে কল্‌কাতাময় একটা হুলুস্থুলু পড়ে গেছে। জান না?"

আমি বলিলাম, "জান্‌ব কোত্থেকে? আমি কি ছাই তোমাদের এলবার্ট হলের দৈনন্দিন মীটিংএ যাই? আর খবরের কাগজের ভেতরে পড়ি 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান,' তাতে ত কোন রামশর্ম্মার টিকিটিও খুঁজে পাই নি। আমি ত জানি পৃথিবীতে

এক রামশর্ম্মাই জন্মেছেন, যাঁরা বিচক্ষণতা প্রবাদে পরিণত হয়েছে ঃ

'যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রামশর্ম্মা।'

তা তোমার এ রামশর্ম্মাটি কে হে? এঁর চেহারাখানা কি রকম? আর নধর কচি তরুণ পাঁঠাসম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর এত সদয় করুণ ভাবই বা হঠাৎ জেগেছে কেন যে তিনি খোদ মা কালীকে পর্যন্ত নিরানিযাশী করে গান্ধীজীর চেলা বানাতে চান? ব্যাপারটা কি বল দেখি? এ কি শুধু কালীমাইজীকে শুদ্ধি করবার চেষ্টা, না স্রেফ জীবে দয়া? জীবে দয়াই যদি হয়, তবে কালীঘাটে হত্যা না দিয়ে উনি গিয়ে একবার ট্যাংরার কসাইখানায় গিয়ে অহিংসামন্ত্র প্রচার করুন না, যেখানে ইয়া ইয়া দাড়িওয়ালা পেশোয়ারী হাজারে হাজারে গরু মোষ ভেড়া পার করে দিচ্ছে? হ্যাঁ, সেখানে অহিংসা চালাতে পারলে বুঝি রামশর্ম্মা বটে।"

বন্ধু ঈষৎ বেজার হইয়া বলিলেন, "তা তুমি যত সব কথা বল্লে অতটা ত ভেবে দেখিনি ভাই। মোদ্দা কি জন্যে যে এমন একটা পণ করে বসলে, তা ঠিক আমিও বুঝতে পারছিনে। তবে হ্যাঁ,- কি বলছিলে, চেহারা কেমন? তা যাই বল, চেহারার জৌলুষ আছে। দিব্যি নধর কান্তি, চুল বাবরীর মত করে মাথার চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, ধব্‌ধবে ফর্সা চেহারা, বয়সেও নবীন, অর্থাৎ এক কথায়, আন্‌কোরা একখানি তরুণ।"

এতক্ষণে কতকটা হালে পানি পাইয়া আমি বলিলাম, "তাই বল, তরুণ! তবে ত ব্যাপারটা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে আসছে ভাই। তরুণ যদি, তবে সে ট্যাংরার কসাইখানায় যাবে কেন? সে বড় unsafe জায়গা। কোন তরুণকে কোন দিন কোন unsafe জায়গায় যেতে দেখেছ? তাদের প্রধান কায়দাই হচ্ছে এই, যাহোক একটা নতুন কিছু করে লোকের চমক লাগান। ঐ যে সেই সাবেক দ্বিজু রায় গেয়ে গিয়েছিলেন না,

'নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো
যা হয় একটা করো—কিছু রকম নতুনতরো।
পাহাড় থেকে পড়ো, সমুদ্রে দাও ডুব,
মর্ব্বে, না হয় মর্ব্বে—একটা নতুন হবে খুব।
নতুন রকম বাঁচো কিংবা নতুন রকম মরো
—নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।'

—ঐটি একেবারে তরুণের হুবহু snapshot। তবে কবি কিনা, তাই একটু বাড়িয়ে বলেছেন। কারণ, নতুন কিছু করতে হবে বলে যে বেঘোরে পড়ে সত্যি সত্যিই পৈত্রিক প্রাণ হারাতে হবে অথবা নেহাৎ খুঁচিয়ে ঘা করতে হবে, এমন কথা তরুণ শাস্ত্রে লেখে না। তাই দেখছ না, দিব্যি নিরাপদ্ কালীঘাটের মন্দির-প্রাঙ্গণে আগে থেকেই অনেক সভাসমিতি করে বিজ্ঞাপনাদি প্রচার করে—অর্থাৎ পূরোমাত্রায় গান্ধী-ষ্টাইলে আড়ম্বরটি করে—timely notice দিয়ে—আ-রবীন্দ্র-হীরেন্দ্রনাথকে প্রকম্পিত

করে—এই মহান্ অনশন-যজ্ঞ সুরু হল। ট্যাংরায় এমনটি হলে হয়ত বা কসাইয়ের হাতের শাণিত খড়্গ গো ছেড়ে ব্রাহ্মণের ঘাড়েই গিয়ে পড়ত। কালীঘাটের হালদারগোষ্ঠী আর যাই করুক নরবলি যে দেবে না, এটা একেবারে নির্দ্ধারিত। সুতরাং তরুণ অহিংসবীর সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাত হয়ে কালী-ঘাটই আশ্রয় করেছেন, ট্যাংরায় যান নি।”

বন্ধু বলিলেন, “তা ত যেন বুঝলুম। কিন্তু তুমি যা বল্লে তাতে পূরোপূরি সায় দিই কি করে? এই যে আমাদের তরুণ রামশর্ম্মার উদয় হয়েছে, ইনি ত মরতে ভয় পান না। অবিশ্যি জবেহ্ হতে হয়ত রাজী নন, তবে না খেয়ে খেয়ে উপোষ করে করে নেহাৎ অহিংসভাবে মরতে এঁর ত খুবই উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। এর তুমি কি বল?”

আমি বলিলাম, “আমি ছাই আর কি বলব? অবিশ্যি এঁর ইতিহাস ত আমি কিছু জানিনে, কাজেই আমার অবিশ্বাসে হয়ত এঁর প্রতি কিছু অবিচার করছি। কিন্তু তুমি যাই বল্লে তরুণ ‘নদের নিমাই’ প্যাটার্ণ চেহারা এবং রকমসকম, তাইত আমার মনে হচ্ছে যে মরবার মত অমন একটা গন্ধময় বিচ্ছিরি ব্যাপার কোন তরুণ হতেই দিতে পারে না। আর, তাছাড়া তুমি না বলছিলে যে এই নবীন সন্ন্যাসীটি আস্ত একটি গান্ধীর চেলা? তা হলে এ মরবে কি করে? গান্ধী মহাত্মা স্বয়ং কতবার অনশন করেছেন, কিন্তু কোন বার মরেছেন দেখেছ?

তরুণিমা

"সেই গয়লার গল্প জান ত ? মস্ত বড় নেমন্তন্ন। বাড়ীর কর্ত্তা গয়লার কাছে দৈএর বায়না দিয়েছেন। খাওয়াতে হবে অনেক লোককে, অথচ সস্তায় সারতে হবে। তাই গয়লার সঙ্গে কর্ত্তা-বাবুর বন্দোবস্ত হল, 'বেটা, তুই বেশ করে জলো দৈ দিবি, কিন্তু খেতে বসলে লোকেরা যখন হৈ চৈ করে উঠবে, দৈ ভারী খারাপ হয়েছে বলে, তখন আমি তোকে খুব বকে দেব। বুঝলি ?' 'আজ্ঞে কর্ত্তা, এ আর বুঝিনি ?' বলে গয়লা ত চলে গেল এবং যথারীতি সজল দধি সরবরাহ করল। তখন দৈএর রকম দেখে সব লোক যেখানে খেতে বসেছে সেই সভার মধ্যে কর্ত্তাবাবুর কি রাগ ! বলেন, 'বেটা তুই করেছিস্ কি ? এত করে পই পই করে তোকে বুঝিয়ে বল্লুম যে সভায় যেন আমার মান থাকে, এমন দৈ দিবি যে হাঁড়ি ওল্টালেও না পড়ে। আর তুই কি না দৈএর ভেতর পুকুর পুকুর জল ঢেলেছিস্। লোকের ভেতর আমার মাথা কাটা গেল। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।' এই না বলে কর্ত্তাবাবু দিলেন গয়লার গালে সটান এক থাপ্পড় বসিয়ে। থাপ্পড় খেয়ে গয়লার পো ত একেবারে ভড়কে গেল ; বলে ফেল্লে 'থাপ্পড় দেবেন এমন ত কথা ছিলনা কর্ত্তাবাবু, দুটো গালমন্দ দেবেন এই ত বলেছিলেন।' বুঝলে ভায়া এও ঠিক তাই।

"অনশন হবে, তার আস্ফালন হবে, আড়ম্বর হবে. অনশন থেকে ফেরাবার জন্যে deputation যাবে, হৃদ্‌যন্ত্রের ও রক্তচাপের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য বড় বড় ডাক্তারদের একটা board বসবে, তার রোজ রোজ bulletin বেরুবে, তারপর একটা

strong committee তৈরী হয়ে ঘোষণা করবে যে তারা পশুহত্যা নিবারণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। তারপর অনেক অনুনয় বিনয়ের পর, অনুরোধ উপরোধের পর, অনশনব্রত থেকে বিরতি হবে—কমলামধু কি ঐরকম একটা কিছু পান করে—দেশময় হৈ হৈ পড়ে যাবে। দ্বিজুরায়ের নন্দলাল যে একদা করিল ভীষণ পণ—তার উদ্‌যাপনের পাকা প্রোগ্রামই ত হচ্ছে এই। এই প্রোগ্রামের মধ্যে মরবার কথা তুমি কোথায় পেলে? হঠাৎ মরণের মত একটা অঘটন ঘটলে আমিও সেই গয়লার মতই বিস্মিত হব। এমন যদি হয়েই পড়ে তবে এই নবীন সন্ন্যাসীর তারুণ্য সম্বন্ধে আমি অন্ততঃ ঘোরতর সন্দিহান হব।"

বন্ধু বলিলেন, "থাক্ গে রামশর্ম্মা পণ্ডিত। সে যা হয় একটা হবে অখন। কিন্তু তরুণদের ওপর তুমি এত খাপ্পা কেন বল ত?"

জিভ্ কাটিয়া আমি বলিলাম, "রাম বল! কি কথা বল্লে তুমি? খাপ্পা? তরুণদের ওপর খাপ্পা আমি? কদাপি ন। আমি কেন, তরুণদের ওপর কেউই কি খাপ্পা হতে পারে? যদি কারুর ওপর তোমার খাপ্পা হতে হয়, তা হলে অন্ততঃ তার একটা মেরুদণ্ড থাকা দরকার—একটা সবলতা, একটা দার্ঢ্য থাকা দরকার। তা হলেই তার উপর ক্রোধ করা সম্ভবে। খড়্গে খড়্গেই সঙ্ঘাত হওয়া সম্ভব—খড়্গেতে জলেতে কি সঙ্ঘাত হয়? বিশাল বনস্পতিই প্রভঞ্জনে উন্মূলিত হয়, শষ্পতৃণগুচ্ছকে ঝড়ে কোনদিন পড়তে দেখেছ? কিন্তু দার্ঢ্য, মেরুদণ্ড, সবলতা, এসব থাকলে তরুণ হবে কি করে? তরুণের থাকবে কায়দা,

পালিশ, smartness, finesse, style, কেমন যেন একটা এলিয়ে পড়া নেতিয়ে পড়া ভাব—একটা supple willowy ধরণের গড়ন, দেহ ও মন উভয়েরই—একটা এলায়িত, লীলায়িত, দোলায়িত ভঙ্গী—তবেই না হবে typical তরুণ !"

বন্ধু বলিলেন, "এ সব তুমি কি বলছ ? আমরা ত জানি তরুণ মানে যুবক। তার থাকবে যুবকজনোচিত দৃঢ়বলিষ্ঠ ভাব। এলিয়ে পড়া নেতিয়ে পড়া, এসব কি বলছ ?"

আমি একেবারে হাসিয়া ফেলিলাম ; বলিলাম, "দেখ ভায়া, যা বল্লে আজ আমার কাছে, একথা যেন আজকাল আর রাস্তায় ঘাটে বলো না। বল্লে মুস্কিলে পড়বে। হতে পারে শব্দকল্পদ্রুমে লেখা আছে, তরুণ মানে যুবক ; এবং এও হতে পারে যে এক কালে সেই অর্থেই ওশব্দটির প্রয়োগ ছিল। কিন্তু আজকাল ও সংজ্ঞা একেবারেই অচল। তুমি আজকালকার কোন উদীয়-মান তরুণকে একবার যুবক কিংবা যুবাপুরুষ বলে দেখ দেখি—সে যদি না তোমায় মানহানির দায়ে ফেলে তা হলেই তোমার পরম ভাগ্যি বলতে হবে। পৌরুষ ভাব, রূঢ় কর্কশ masculi-nity, ঋজু মেরুদণ্ড, এসব থাকলে সে আবার তরুণ ? সে ত একটা boor, অসভ্য বর্ব্বর। তেজস্বী যুবক যে, সে ভাঙ্গে কিন্তু মচকায় না। আর নধর তরুণ যে, সে মচকায় কিন্তু ভাঙ্গে না—সত্যি বলতে কি, সে ভাঙ্গেও না, মচকায়ও না ; স্থিতিস্থাপক বেত্রদণ্ডের ন্যায় সে বেগতিক দেখলে বেশ মোলা-য়েমভাবে নুয়ে পড়ে, তার পর আবার অবসর বুঝে সোজা

হয়ে ওঠে। এই নমনীয়তা কমনীয়তা রমণীয়তাই হচ্ছে আধুনিক তরুণিমার প্রাণ। শঙ্করাচার্য্যের মোহমুদ্গর পড়েছ ত? সেখানে তরুণের একটি অতি সুন্দর up-to-date definition আছে। মনে পড়ে?

'তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ'.

অর্থাৎ কি না দেহের তাবৎ রক্ত যাদের তরুণীদের ন্যায়, তারাই হচ্ছে খাঁটি তরুণ। ওকি হাসছ যে?"

বন্ধু একেবারে হো-হো করিয়া অট্টহাস্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এবার যা হোক একটা original শাঙ্কর-ভাষ্য বার করেছ তুমি? 'তরুণীরক্তঃ' মানে 'তরুণীর ন্যায় রক্ত যার'? হাঃ হাঃ হাঃ! আমরা ত চিরকাল জানতুম যে আচার্য্য শঙ্করের ওকথার অর্থ হচ্ছে এই যে, তরুণরা তরুণীতে অনুরক্ত হয়ে থাকে। সমাস সপ্তমীতৎপুরুষ।"

আমি বললাম, "দেখ ভায়া অত হাসবার কোন কারণ নেই। আপ্তবাক্যের কি একটি মাত্র অর্থই হয়? তা হলে ত Delphic Oracle-এর পেশাই বন্ধ হয়ে যেত। যত সব টীকা-টিপ্পনী-ভাষ্যকার ত একেবারে বেকার হয়ে পড়তেন! বুঝলে? শাস্ত্র-বাক্যের, মহাজনবাক্যের নানা অর্থ সম্ভবে। যুগে যুগে নানাবিধ ব্যাখ্যার আবশ্যক হয়। এখন আমার বিংশ-শতাব্দীয় মোহমুদ্গরের ব্যাখ্যা বুঝিয়ে বলি শোন। তুমি বল্লে, যে তরুণীতে অনুরক্ত হবে সেই তরুণ? এও ত বড় তাজ্জব ব্যাপার, তরুণীতে অনুরক্ত ত অনেক গোস্বামী মহাপ্রভুদেরও হতে দেখা যায়।

তা ছাড়া শাস্ত্রেই ত লেখা আছে, 'বৃদ্ধস্য তরুণী·ভার্য্যা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী।' তা বলে সেই সব বৃদ্ধ স্থবিরকে তরুণ বলবে নাকি তুমি? তা হলেই হয়েছে আর কি? আসলে ভেবে দেখলে, ও একটা অর্থই নয়। তাছাড়া, সপ্তমীতৎপুরুষ দ্বারা কোন তরুণ নিষ্পন্ন হতে পারে না—কোন পৌরুষের সংযোগ থাকলে তরুণিমা ফুটতেই পারে না। সমাসটি হচ্ছে নিছক বহুব্রীহি। ব্যাসবাক্য ত আগেই বল্লুম। এখন আসল তাৎপর্য্যটি বুঝিয়ে দিচ্ছি। যাদের রক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি চেহারা রকম সকম—রক্তের ধারার উপর যা নির্ভর করে সেই সব—তরুণীর ন্যায় অর্থাৎ রমণীজনসুলভ, তারাই হচ্ছে খাঁটি তরুণ।"

বন্ধু একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, "এ তুমি বড্ড বাড়িয়ে বলছ। আজকালকার তরুণ ছোকরারা—অথবা বলা উচিত তরুণিমা-প্রয়াসী ছোকরারা—একটু ফিন্‌ফিনে বাবুগিরি করে বটে, একটু মিহি মিঠে চাল দোরস্ত করতে চায় বটে; কিন্তু তা বলে একেবারে তরুণী!"

আমি বলিলাম, "বেশ, এবিষয়ে তর্কই যদি করতে চাও, তাই সই। তরুণী চেনা যায় কিসে বল ত? অন্ততঃ সভ্যসমাজে। কেশে বেশে ভাবে ভঙ্গীতে চাহনীতে চলনে। প্রথম, কেশই ধরা যাক। শিরোজকেশই যদি ধর, তবে দেখতে পাবে যে তরুণী আর তরুণের কুন্তলবিন্যাসে বেশ একটা—যাকে আমরা গণিতব্যবসায়ীরা বলি close approximation—সেটা সম্যক্

ভাবেই পরিস্ফুট হচ্ছে। একবার ইংরিজীতে ওদেশের সমাজের Bohemia অংশের একটা বর্ণনা পড়েছিলুম মনে পড়ে, 'Bohemia is where the women are short-haired and the men long-haired'; এও অনেকটা তদ্বৎ। তারুণ্যাভিমানী ছেলেরা তাদের মস্তক-আবরণকারী কেশদামকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বাঁকিয়ে চুরিয়ে এমনই অপূর্ব্ব নয়নবিমোহনভাবে পল্লবিত তরঙ্গিত করে তোলে যে রমণীর চিকুরদাম থেকে তার ভিন্নতা অনেক গবেষণা না করলে মালুম হয় না। তারপর, বদনমণ্ডলস্থ যে কেশ তার কথাই যদি ধর, তবে ত প্রমাণ আরও সুস্পষ্ট। বদনমণ্ডলে কেশের ভাব অর্থাৎ অভাবই তরুণীসমাজের লক্ষণ। সুতরাং তৎস্থানীয় কেশের প্রতি তরুণ-সমাজের সদ্ভাব থাকতে পারে না। অতএব তরুণসমাজ সে কেশের প্রতি খড়্গহস্ত—থুড়ি ক্ষুরহস্ত। তাই শাণিত ক্ষুরপ্রয়োগে গুম্ফশ্মশ্রুর সমূল নির্ব্বাসন। অথচ ভেবে দেখ ভায়া এই গুম্ফশ্মশ্রুই চিরদিন পৌরুষের লক্ষণ বলে পরিচিত হয়ে এসেছে। এখনও শুনি ফরাসী সৈনিকদের গুম্ফ রাখা compulsory; তাই তাদের এক নাম *Poilu*—অর্থাৎ কেশবান্।

"আমাদের পরশুরাম এবিষয়ে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়ে কি লক্ষ্য করেছেন, মনে নেই? তিনি বলেছেন যে আজকাল বৃদ্ধ কেউ নেই—অন্ততঃ কেউ থাকতে রাজী নন, অথবা ও অপবাদ কেউ স্বীকার করেন না। আছেন তিন প্রকার মানব—প্রৌঢ়, যুবক ও তরুণ। প্রৌঢ় হচ্ছেন তাঁরা যাঁদের গোঁফদাড়ি

উভয়ই আছে, যথা, আছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, আর ছিলেন সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যে। যুবক তাঁরা যাঁদের দাড়ি নেই কিন্তু গোঁফ আছে, যথা ছিলেন আশু মুখুয্যে এবং এখন আছেন নরেন্দ্র দেব। আর তারাই তরুণ যাঁদের গোঁফ দাড়ি কোনটাই নেই, যথা শরৎ চাটুয্যে, প্রমথ চৌধুরী। এই শ্রেণী-বিভাগটি একেবারে অকাট্য। অনেকে অবিশ্যি দাড়ি গোঁফ রেখেই তরুণ হতে সময়ে সময়ে কামনা করেন—শিং না ভেঙ্গেই বাছুরের দলে প্রবেশ করতে চান—কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় না। তার জ্বলন্ত প্রমাণ স্বয়ং বিশ্বকবি—তিনি তরুণ সাহিত্যিকদের অজস্র অযাচিত সার্টিফিকেট দিয়েও তরুণের দলে তেমন আমল পেলেন না। অথচ বয়সে বৃদ্ধ শরৎচন্দ্র ক্ষুরের দৌলতে তরুণ হয়ে পূর্ব্বেরই ন্যায় তরুণমণ্ডলকে চন্দ্রাহত করে রেখেছেন। তরুণের কেশতত্ত্ব—অথবা নিষ্কেশ-তত্ত্ব—এতক্ষণে বুঝেছ ত ?

"তারপর ধর বেশতত্ত্ব। পৌরুষ-ব্যঞ্জক যে সব বেশ-পদ্ধতি আছে—যেমন শক্ত আঁটসাঁট বাঁধন—আমাদের কর্ম্মিষ্ঠদের মালকোঁচা অথবা গৌরুসদয়িক ব্রতচারী কোঁচা না হয় ছেড়েই দিলুম—সেরকম শক্ত বাঁধন তরুণের পেলব তনুতে সইতে পারে না। কাজেই তাদের বেশবিন্যাস কি একপ্রকার ঢিলেঢালা আলগোছ রকম—কোন্‌টা যে কাছা কোন্‌টা বা কোঁচা তাও নির্দ্ধারণ করা দূর থেকে দুরূহ। শরীরের অধোবাস কি এক রকম গোলগাল ফুলো ফাঁপা গোছের—তরুণীর জড়ান শাড়ী বা **skirt**-এর বোধ হয় একটা সচেষ্ট সযত্ন অনুকরণ। উর্দ্ধবাস

একটা ঢিলে পাঞ্জাবী বা শার্ট—আর যদি কোন উত্তরীয় ব্যবহার করাই হয়, তবে সেটা এমন পড় পড় ভাবে থাকে যে মাটি ছুঁল কি ছুঁলনা ঠিক মালুম হয় না—অনেকটা তরুণীর বসনাঞ্চলের ন্যায়ই চকিতচঞ্চল। আর যে পাঞ্জাবী বা শার্ট উর্দ্ধদেহ বিমণ্ডিত করছে, তারও হাতের ও গলার বোতাম থাকবে খোলা—এও বোধ করি আজকালকার তরুণীদের sleeveless পোষাক এবং হালফ্যাসানের decolletage-এর সশ্রদ্ধ অনুসরণ। কেমন যেন একটা সতর্ক উদাসীনতা বা সযত্ন আলুথালু ভাবেভোলা ভাব—যাকে ইংরিজীতে বলে artful artlessness—সুরভির ন্যায় তরুণ-প্রসাধনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। তারপর যদি ধর প্রসাধন ও অঙ্গরাগের অন্যান্য উপকরণ—যেমন পাউডার, স্নো, ক্রীম, সাবান, এসেন্স, ইত্যাদি—তা হলে তুমি যে কোন তরুণ ছাত্রাবাসে গিয়ে চাক্ষুষ দেখে আসতে পার যে সত্যি সত্যিই তরুণের ধমনীতে তরুণীর রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে কি না।

"তারপর বলছিলুম, ভাবে ভঙ্গীতে কথায় বার্ত্তায় চাহনীতে চলনে। সে বিষয়েও কি তোমায় বিস্তারিত বুঝিয়ে বলতে হবে? সরল সবল ঋজুতা, দৃপ্ত তেজস্বিতা, অনমনীয় মেরুদণ্ড—যৌবনোন্নত পুরুষের যা সব লক্ষণ—'শালপ্রাংশু মহাভুজঃ' চিত্র দিয়ে কালিদাস যে পৌরুষের ব্যঞ্জনা করতে চেয়েছিলেন—তা ত তুমি তরুণের কাছে পাবে না। তরুণ যে অতি নধর অতি কোমল, সে যে ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়, পুষ্পবাণবিলাস অবধি সে হয়ত বরদাস্ত করতে পারে, অন্যবিধ শরাঘাত যে তার প্রতি একেবারেই

নিছক cruelty to animals! বিশ্বের সব ব্যথা যে তার ওপর চেপে বসেছে—সেই চাপেই যে তার তনু বেপথুমতী। শকুন্তলার সে দৃশ্য তোমার মনে আছে? যেখানে দুষ্মন্ত হরিণশিশুদের দিকে লক্ষ্য করে বাণ ছুঁড়ছিলেন, আর অতি কোমল মৃগশাবকদের পীড়া দেওয়া যে অতি নিষ্ঠুরতা এই কথা বলে আশ্রমবাসিগণ তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করছিলেন? সে কথা আমাদের তরুণদের পক্ষেও একেবারে খেটে যায়:

ক্ব বত তরুণকানাং জীবিতঞ্চাতিলোলং।
ক্ব চ নিশিতনিপাতাঃ বজ্রসারাঃ শরাস্তে॥

এই যে অতিলোলজীবিত অতিক্ষীণপ্রাণ তরুণবৃন্দ আমাদের—এরা খাড়া হয়ে উঁচু করে মাথা তুলে দাঁড়াবে কি করে? তাই তরুণ যখন দণ্ডায়মান হয়, তখন তার posture অথবা ঢংটা হয় অনেকটা বঙ্কিম, ত্রিভঙ্গভঙ্গিম—ইংরিজীতে যাকে বলে lissom, lithe, svelte। সংস্কৃত-সাহিত্যে তরুণীকে বহু স্থলেই লতার সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে—'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব', 'হিরণ্ময়ী শাললতেব জঙ্গমা'। আমাদের তরুণদেরও ঠিক সেই ধরণের লতানে পল্লবিত ভাব—নিজের দুপায়ের ওপর স্বপ্রতিষ্ঠ হয়ে খাড়া হয়ে যেন দাঁড়াতে পারে না—একটি সহকার তরুর সহকারিতা নিতান্তই যেন তাদের আবশ্যক।

"তারপর যদি ধর ভাষা—তা ত অতি সুচিক্কণ ভাবে মোলায়েম এবং মিহি এবং মাজ্জিত এবং musical অর্থাৎ মেয়েলী: এবং ভাব তার অতি গায়ে পড়া, অতি বিগলিত, অথবা অতি

সূক্ষ্ম, অথবা অতি smart। সহজ সরল সুবোধ্য সুস্পষ্ট হলে সে ভাষা ও ভাব তরুণের নয়—তা হবে কতক হেঁয়ালী কতক ছেনালী কতক ন্যাকামীর বিচিত্র মিশ্রণ—যাকে ইংরিজীতে বলে skating upon thin ice এবং ফরাসীতে বলে *double entendre*—সেই জাতীয় আর কি? ভাব ও ভাষার ধাঁচা তরুণের হাতে পড়ে এই রকম হওয়াতে, যাকে বলা হয় বিশেষ করে তরুণ সাহিত্য তাও এই ভাবাক্রান্ত হয়ে উঠেছে।

"সেই তথাকথিত তরুণ সাহিত্যে—দেশের মধ্যে সমাজের মধ্যে যে সমস্ত জটিল প্রশ্ন মাথা তুলে উঠেছে, যে সমস্ত জীবন-মরণ সমস্যা সমাজকে চঞ্চল করে তুলেছে, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক যে সব বিপ্লব দেশকে মথিত করে তুলেছে—এই তরুণ সাহিত্যে সে সব সম্বন্ধে কোন গভীর চিন্তা, কোন নিপুণ বিশ্লেষণ, কোন সরল সমাধান-প্রচেষ্টা, এর কিছুই পাওয়া যায় না। মামুলী এবং ধার করা তথাকথিত শ্রমজীবী সমাজের চিত্র মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায় বটে—কিন্তু তাও অত্যন্ত unreal এবং conventional—ঐ জাতীয় পাশ্চাত্য উপন্যাসের ব্যর্থ অনুকরণ। তবে তরুণ সাহিত্যে আসল কোন্ চীজটি পাওয়া যায়? সে চীজটি হচ্ছে অর্থাৎ তরুণ সাহিত্যের প্রধানতম theme-ই হচ্ছে—জনৈক প্রণয়ী এবং তদীয় প্রণয়িনী, এবং তাদের ভাব-বিলাস। অবিশ্যি একাধিক প্রণয়ী প্রণয়িনীও হতে পারে, আজকাল pluralism-এর দিনে তারই রেওয়াজ বেশী—the more the merrier—আমাদের কলিযুগের পরশুরাম যার

সংস্কৃত অনুবাদ করেছেন, 'যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি'।
তা প্রণয়াস্পদ একই হোক বা অনেকই হোক, একমাত্র আখ্যান-
বস্তু হচ্ছে প্রণয়। নায়ক-নায়িকার বা নায়ক-নায়িকাবর্গের খেয়ে
দেয়ে আর কোন কাজই নেই—এবং খাবার দাবার জন্যেও তাদের
যে কোন কাজ করতে হয় এরকমও বোধ হয় না। সবই বেশ
rich aristocratic চালে চলছে, নিয়তই ড্রয়িংরুমে পিয়ানোর
টুং টাং ধ্বনি শোনা যাচ্ছে, এবং Bach, Handel, Beetho-
ven, ইস্তক তাঁদের Lohengrin, Kreutzer Sonata-রও
উল্লেখ মাঝে মাঝে পাওয়া যাচ্ছে—যদিচ কয়জন বঙ্গীয় আলোক
প্রাপ্ত তরুণ-তরুণীও ঐ সব য়ুরোপীয় সঙ্গীত ও সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গে
পরিচিত সে বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে। আর সেই
music-এর তালে তালে বা অন্তরালে নায়ক-নায়িকার অবিশ্রাম
প্রণয়গুঞ্জন চলছে। একেবারে idyllic অবস্থা—যেন eternal
honeymoon in the land of the lotus-eaters—
কৌমুদীবিধৌত মদির নিশিতে অফুরন্ত মদন-মহোৎসব। এই
নেহাৎ অবাস্তব, একেবারে airy, fairy, ethereal, কল্প-
লৌকিক যে জীবন—এরই রঙ্গীণ চিত্র যে তরুণ সাহিত্যে ফুটে
উঠেছে—সেই সাহিত্যই নাকি আবার দাবী করে যে সেই হচ্ছে
realistic বা বস্তুতন্ত্রতামূলক সাহিত্য? শুনে হেসে আর বাঁচিনে।

"তুমি বল্লে তরুণদের ওপর আমি খাপ্পা? আরে খাপ্পা যে
হব, তার ফুরসৎ কোথায়? এই তরুণিমার যে অপরূপ ভঙ্গী
ভাষাতে, সাহিত্যে, আচারে, ব্যবহারে প্রকটিত হচ্ছে, তাতে আর

যে রসেরই সঞ্চার করুক না কেন, রৌদ্র রসের সঞ্চার যে করে না তাতে সংশয় মাত্র নেই। সত্যি যে রসের সঞ্চার করে তার নাম হচ্ছে হাস্যরস। অন্ততঃ আমার ত তাই করে। তবে যাঁরা আমার চাইতে গম্ভীর প্রকৃতির লোক, যাঁরা সমাজের ভবিষ্যৎ ভেবে আকুল হন, তাঁদের কাছে হয়ত সঞ্চার করে করুণরস। আর বর্ত্তমানের তরুণ-প্রকৃতি যে বহুলপরিমাণে একটি করুণ চিত্রেরই উদ্রেক করে লোকহিতৈষীদের চিত্তে, সে কথাও যথার্থ। সে যাই হোক, এখন তুমি মানছ কি না যে আমার মোহ-মুদ্গরের বাখ্যা কিছু উড়িয়ে দেবার মত নয়?"

বন্ধুবর এতক্ষণ অতি নিবিষ্ট চিত্তে আমার চুলচেরা বিশ্লেষণ শুনিতেছিলেন। আমার প্রশ্নে যেন তাঁর চমক ভাঙ্গিল। তিনি বলিলেন, "তা বাখ্যা ত মন্দ শুনলুম না। একবার শুনেছি গান্ধীজী গীতার কর্ম্মচক্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'কর্ম্মচক্র আর কিছুই নয়, ওটা হচ্ছে চরকা।' তাতে মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল শুধু মন্তব্য করেছিলেন, 'O the shades of Shankara !' তোমার মোহমুদ্গরের ব্যাখ্যা শুনে আমারও শুধু সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করতে ইচ্ছে হচ্ছে। যাক্‌গে। তরুণীর রক্তই হোক আর তরুণীতে রক্তই হোক, আমরা বুড়ো-হাবড়া সেকেলে nineteenth-century-র লোক, আমাদের তাতে ভারী এসে গেল। আর ছাই এতও তুমি বকতে পার। কোথায় তুল্লুম রামশর্ম্মার কথা, আর তুমি কি না সুরু করলে তরুণিমার কৈশিক, বৈশিক, পৈশিক বিশ্লেষণ—

আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ব্যাখ্যা। একেবারে ধান ভানতে শিবের গীত। যাক, আর বক্ বক্ করতে ইচ্ছে করে না—রাতও অনেক হয়েছে—এখন তা হলে উঠি ?"

আমি বলিলাম, "বিলক্ষণ! এই ভরা বাদলের অর্দ্ধেক রাতটা এখানে কাটিয়ে দিলে, এখন উঠবে কি রকম? গিন্নী নেই বলে গেরস্থালী ত বন্ধ হয় নি। বেশ গরমাগরম খিচুড়ী রান্না হয়েছে, পেঁয়াজ দিয়ে ডিম ভাজা দিয়ে, তাই দুটি খেয়ে যাও।"

বন্ধুবর সোৎসাহে আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তাই নাকি? এতক্ষণ বলতে হয়। তথাস্তু। চল, খেতে চল। বিলম্বে নালম্।"

ভাদ্র, ১৩৪২।

লেখা ও পড়া

লেখা ও পড়া

তখন জুলাই মাস। দৈনন্দিন সান্ধ্যভ্রমণ সমাপন করিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া বাহিরের বৈঠকখানায় বসিয়া একটু বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছি আর এটা-ওটা কাগজ-পত্তর অলসভাবে নাড়াচাড়া করিতেছি। এমন সময় হঠাৎ একটি যুবক আসিয়া উপস্থিত। দেখিতে যুবকটি একটু তরুণভাবাপন্ন—বেশ-বাস সুচিক্কণ, কেশপাশ যেন সযত্নে অযত্ন-বিন্যস্ত, এবং রকম-সকম হইতে একটু সাহিত্যিকের মিহি আঘ্রাণ যেন টের পাওয়া যায়।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি চাই ?"

যুবকটি নমস্কার করিয়া বলিল, "এই এসেছি, আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে।"

আমি বলিলাম, "কি করা হয় ?"

উত্তর হইল, "বিশেষ কিছু করি নে। কলেজের পড়া এক রকম সাঙ্গ করেছি। এখন মাঝে মাঝে লিখি টিখি। সম্প্রতি কয়েকজন বন্ধুতে মিলে চাঁদা তুলে একটা মাসিক পত্রিকা বার করবার চেষ্টা করছি।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাদের কাগজের নামটি কি দিচ্ছ ?"

যুবক বলিল, "কুজ্ঝটিকা।"

আমি বলিলাম, "নামটি ত বেশ হেঁয়ালী আবছায়া ধরণের বার করেছ, তা বেশ। আর তোমার লিখবার অভ্যাস আছে, অথবা অভ্যাস করছ, এত উত্তম কথা। তা এদিকে পড়াশুনো কেমন করেছ ? আমি কলেজের পড়ার কথা বলছি নে—এই বাইরের বই টই।"

যুবকটি একটু বিনয়ের প্রক্ষেপ-মিশ্রিত গর্ব্বভরে উত্তর করিল, "আজ্ঞে, আজকাল একটু revolutionary literature-এর চর্চ্চা করছি।"

—"Revolutionary literature মানে ?"

—"এই আজকাল চারদিকে পৃথিবী টলমল করছে কিনা —আয়র্ল্যাণ্ড, রাশিয়া, জার্ম্মেণী, এই সব। এদেরই সব কথা, এদের নানান্ ideology—এই সবের একটু খবর নিচ্ছি।"

এই ideology-র অবতারণা শুনিয়া আমার কিঞ্চিৎ কৌতূহল হইল ; কারণ হালের তরুণ মহলে এই কথাটির কিঞ্চিৎ অত্যধিক

ছড়াছড়ি দেখিতে পাই। হাল ফ্যাশানের এই সব বাগাড়ম্বর শুনিলেই একটু সন্দেহ হয় যে বোধ করি বক্তার মস্তিষ্কের কিঞ্চিৎ শূন্যতা এবং শিরোদেশের কিঞ্চিৎ স্ফীতি ঘটিয়াছে। তাই একটু পরখ করিয়া লইবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না।

আমি বলিলাম, "তা বেশ ; বিদ্রোহ-বিপ্লবের সাহিত্য পড়ছ, তার ideology-র সন্ধান নিচ্ছ, বেশ কথা। শুধু একটু সাবধানে থেক—নেহাৎ পুলিশের খপ্পরে না পড়ে যাও।"

যুবক একট মৃদু হাসিয়া বলিল, "তা নেহাৎ মিথ্যে বলেন নি। আমার এক ভাই ত interned হয়েই আছে। আর আমিও দিন কয়েকের জন্যে শ্রীঘর দর্শন করে এসেছি।"

আমি বলিলাম, "তা বেশ করেছ, কিন্তু বিদ্রোহ-বিপ্লব ত পৃথিবীতে আজই যে নতুন করে হচ্ছে এমন নয়, পূর্ব্বেও অনেক হয়ে গেছে, তার খবর রাখ কিছু?"

—"তা কিছু রাখি বই কি? আমার ত এ বিষয়ে লিখতে টিখতেও হয় কিনা।"

আমি প্রশ্ন করিলাম, "এখন ত জুলাই মাস, বল দেখি ৪ঠা জুলাই পৃথিবীর ইতিহাসে বিখ্যাত কেন?"

যুবক নিরুত্তর।

আমি বলিলাম, "বটে, ৪ঠা জুলাইএর কথা কোনদিন শোননি? আচ্ছা, বলতে পার, ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে কি ঘটনা ঘটেছিল?"

পুনশ্চ নিরুত্তর।

পুনরায় বলিলাম, "আচ্ছা, জুলাই মাসের আর একটা তারিখ কেন প্রসিদ্ধ বলতে পার? ১৪ই জুলাই?"

নেহাৎ আর কিছু না বলিলে ভাল দেখায় না বুঝিয়া যুবক বলিল, "কৈ, এ সব যে তারিখ আপনি জিজ্ঞেস করছেন, এ ত কোনদিন শুনি নি?"

আমি বলিলাম, "শোন নি? অথচ তুমি বিপ্লবি-সাহিত্যে একজন ওস্তাদ এবং একজন লিখিয়ে। তবে শোন। আমেরিকার United States যে এক সময়ে ইংলণ্ডের অধীন ছিল এবং তারপর স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল, সে খবর রাখ? আচ্ছা, সেই স্বাধীনতা-ঘোষণার তারিখ হচ্ছে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই। পৃথিবীর বিপ্লবের ইতিহাসে একটা স্মরণীয় দিন। আর ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের কথা শুনেছ? কয়বার French Revolution হয় তা জান? না? তিনবার। প্রথমবারের বিপ্লবই সব চাইতে বড়। তার তারিখ জান? না? এই বিপ্লব সুরু হয় ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে এবং এর সুরুতেই একটা গুরুতর ঘটনা ঘটে। প্যারিসে একটা বড় জেলখানা ছিল—এই ধর আমাদের কল্‌কাতার প্রেসিডেন্সী জেলের মত। বিপ্লবোন্মত্ত জনতা একদিন লাঠি সোটা কুড়ুল খন্তা বন্দুক নিয়ে সেই জেলখানার দরজা ভেঙ্গে ফেল্লে। সেই জেলখানার নাম ছিল Bastille, আর সেই ঘটনাকে বলে Storming of the Bastille—এই ঘটনা ঘটেছিল ১৪ই জুলাই তারিখে। এখন বুঝলে? যেমন ৪ঠা জুলাইকে মার্কিণীরা

Independence Day বলে, সেই রকম ১৪ই জুলাইতে ফ্রান্স দেশে স্বাধীনতা-উৎসব হয়। চন্দননগরে যদি যাও, ত সেখানেও ১৪ই জুলাইএর উৎসবের ঢেউ দেখতে পাবে।

"'দেখ ছোকরা, তোমায় আমি একটা কথা বলি, কিছু মনে করো না। তুমি দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখ, কিছু অন্যায় কথা নয়। কিন্তু শুধু স্বপ্ন দেখলেই ত হয় না। অন্যান্য দেশ কি করে স্বাধীনতা অর্জ্জন করেছে, কোথায় কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়েছে, এসব বিচিত্র ইতিহাস একটু পড়ে দেখতে হয়। শুধু MacSwiney কিংবা DeValera, Karl Marx কিংবা Lenin সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত lyric পড়লেই বিদ্রোহ সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে না। ইটালীতে মাত্সীনি, গারিবাল্দি, কাভূর কি করেছিলেন, টিরোলের Andreas Hofer, হাঙ্গেরীর Kossuth, পোল্যাণ্ডের Kosciusko, স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য কি অসাধ্য সাধন করেছিলেন, এসব একটু আধটু পড়তে হয়। কি বল্লে? এদের তুমি নামও শোননি? তাহলে তোমায় বলি কি, তুমি তোমার 'কুজ্ঝটিকা' আপাততঃ বন্ধ রেখে, একটু পড়াশুনো কর ত? একটু জেনে শুনে, তারপর লিখতে স্বুরু করো।"

কিঞ্চিৎ বেজার হইয়া যুবক বলিল, "তা যা বল্লেন ঠিকই বল্লেন বুঝতে পারছি। আচ্ছা, আপনি আমায় কয়েকখানা ভাল ভাল বইয়ের নাম বলতে পারেন, যা পড়লে অন্ততঃ মোটামুটি রকম একটা ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক জ্ঞান জন্মে?"

আমি খুব উৎসাহ-সহকারে বলিলাম, "পারব না কেন? তোমায় আমি অবিশ্যি বই বাত্‌লে দেব। আর এর জন্যে তুমি নিরুৎসাহ হয়ো না। এজন্যে তোমায় গোটা Encyclopædia Britannica খানা মুখস্থ করে ফেলতে হবে না। আর তোমায় যে এতগুলি প্রশ্ন করলুম, তুমি হয়ত মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়েছ। এ আমি তোমায় snub করবার বা নিরুৎসাহ করবার জন্যে করিনি। তোমার ভালর জন্যেই বলেছি। তুমি বল্লে কিনা যে তোমার লিখবার সখ আছে, অভ্যাসও আছে। তাই তোমায় একটু সম্‌ঝিয়ে দেবার আমার লোভ হল যে লিখবার এবং ছাপাবার একটা গুরুতর দায়িত্ব আছে। কিছু না জেনে শুনে লেখা শুধু যে নিরর্থক তা নয়, তা এক হিসেবে criminal; কারণ আমাদের দেশের এখনও যা অবস্থা, ছাপার অক্ষরকে এখনও লোকে বেদবাক্য মনে করে—সুতরাং ছাপার অক্ষরে যা তা ভুলভ্রান্তিতে লোকের অত্যন্ত অপকার হয়। বুঝলে?"

যুবক বিনীতভাবে বলিল, "বুঝলুম ত ঠিক। কিন্তু আজ-কাল দেখুন অসংখ্য লেখা বেরুচ্ছে। আপনার কি মনে হয়, এরা সব কিছু জেনে শুনে পড়ে তারপর লেখে?"

আমি বলিলাম, "তাত লেখেই না। অন্ততঃ এদের অধিকাংশই কিছুমাত্র পড়াশুনো না করেই লেখে। আর তুমিই ত ধর না 'কুজ্মটিকা' লিখতে সুরু করেছিলে প্রায়! আজকাল, সস্তা সাপ্তাহিক ছেড়েই দাও না, লম্বা চওড়া আকারের মাসিক,

এমন কি পাঁচসিকে দেড় টাকা দামের আধুনিক উপন্যাস অনেক দেখেছি—তার ভেতরের লেখাতে এমন সব হাস্যকর বাণান ভুল, ব্যাকরণ ভুল, idiom ভুল আছে যে, চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রও সে রকম লিখলে মাষ্টার মশাই তাকে degrade করে দিতে চান। আর তার ফলও হয়েছে তাই, আজকালকার চল্‌তি সাহিত্য, অন্ততঃ সাময়িক সাহিত্য, একেবারে চতুর্থ শ্রেণীর সাহিত্য হয়ে পড়েছে। একটা গল্প শুনেছি। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল। আমাদের এক জন নবীন সাহিত্যিক—বাজারে তখন তাঁর খান দশ বার তক্‌তকে উপন্যাস বেরিয়েছে—তাঁকে নাকি শরৎ চাটুয্যে মশাই বলেছিলেন, 'দেখুন মশাই, আপনি উপন্যাস ত হরদম লিখছেন, সে কিছু মন্দ কথা নয়, কিন্তু দয়া করে লিখবার আগে একবার করে ব্যাকরণকৌমুদীর পাতা কখানা ওল্টাতে পারেন?' গল্পটি সত্যি কিনা জানি নে, তবে ইটালিয়ানরা যেমন বলে থাকে, Se non e' vero, e' ben trovato—সত্যি যদি না-ও হয়, সত্যি হওয়া উচিত বটে। কথাটা একেবারে খাঁটি।"

যুবক বলিল, "বাণান ভুল ব্যাকরণ ভুলের কথা যে বল্লেন, ও ত আজকাল আর কেউ মানেই না। স্বয়ং রবিবাবু ক-এ দীর্ঘ ঈকার দিয়ে 'কী' চালিয়েছেন।"

আমি বলিলাম, "দেখ, সে কথা আর এ কথা ঠিক এক নয়। আমি 'নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ' এই কথা বলে রবিবাবুকে খালাস দিতে চাই নে। একবার রবিবাবু 'প্রত্যূষ' অর্থে 'প্রদোষ' শব্দ ব্যবহার করেছিলেন; করে ভুলই করেছিলেন—কারণ ওশব্দটি সম্বন্ধে

তাঁর একটু অস্পষ্ট ধারণা ছিল। ভুল সবারই একটু আধটু হতে পারে। ধর, যদি কোন বড় সাহিত্যিকও 'ক্রন্দসী' শব্দটি 'ক্রন্দনশীলা রমণী' অর্থে ব্যবহার করেন—সেটা তাঁর ভুলই হবে। কিন্তু এখানে সে কথা নয়; রবিবাবু যে 'কী' কোন কোন স্থলে—সব স্থলে নয়, এটা মনে রাখবে—ব্যবহার করেন, তা ভুল করে করেন না; একটা পার্থক্য বোঝান দরকার মনে করে তিনি ওরকম করেন। তিনি অজ্ঞতার দরুণ করেন না, কারণ তাঁর সংস্কৃত-সাহিত্যে দখল অসাধারণ এবং সংস্কৃত ভাষা বাংলা ভাষার জননী; এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ আর কিছু না করুক বাংলা শব্দের কাঠামটা নিয়ন্ত্রিত করছে—নেহাৎ দেশজ শব্দ বাদ দিলে। আজকালকার 'বাজারে'-সাহিত্যে যাঁরা ষত্বণত্বের কোন ধারই ধারেন না, হ্রস্বদীর্ঘের তফাৎ যাঁরা করেন না, র এবং ড় উভয়ই যাঁদের লেখনী-মুখে তুল্যমান—তাঁদের যে ভুল, তা নেহাৎ অজ্ঞতা-জনিত ভুলই, এর মধ্যে বিদ্রোহাত্মক বাহাদুরীর কণামাত্র নেই। একমাত্র ব্যাকরণ-কৌমুদীই এর দাওয়াই।

"আসল ব্যাপার কি হয়েছে জান? বিশুদ্ধির ওপর একটা সম্ভ্রম, accuracy-র প্রতি একটা নিষ্ঠা, অজ্ঞতার জন্যে একটা সহজ লজ্জা—এই ভাবটাই যেন কেমন কমে গিয়েছে। তাই সর্ব্বত্রই একটা slipshod careless ভাব। ভাবটা যেন এই রকম, ভুল হয় হোক গে, শুদ্ধ করবার জন্য কে অত trouble নেয়? কত দিকে যে এর দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়, তার অন্ত

নেই। আজকাল ত অলিতে গলিতে সিনেমার সঞ্চার হয়েছে; আর তার poster-গুলি ত রাস্তায় ঘাটে দেয়ালে একেবারে চিত্রবিচিত্র হয়ে চোখে বিঁধছে। এগুলোর মধ্যেই যে কত রকমারি ভুল দেখতে পাওয়া যায়, তার কি আর সংখ্যা আছে? ছেলে-বেলায় signboard-এর হাস্যাস্পদ ভুলের উদাহরণ শুনতুম —'বিষ্টুপুরের উৎকৃষ্ণ তামাক'। কিন্তু আজকালকার poster-এর কাছে তা কোথায় লাগে? হঠাৎ একদিন বেড়াতে বেড়াতে দেখি, রাস্তায় ঘাটে প্রকাণ্ড poster লাগান, কোন একটি বিখ্যাত সিনেমায় নতুন একখানা ছবি আসছে—নাম তার 'ঘাউল'! আমি ত দেখে চমকে উঠলুম, 'ঘাউল' আবার কি? অনেক ইংরিজী শুনেছি, এ রকমটা ত শুনিনি। শেষে ঠিক পেলুম, যে এটি হচ্ছে ইংরিজী "ghoul" শব্দের বঙ্গীকরণ। ঐ ইংরিজী শব্দটির উচ্চারণ যে বাংলায় লিখলে 'গূল' হয়, একটু চেম্বার্স ডিক্‌শনারীখানা দেখলেই সে তথ্যটি জানা যেত—আর শব্দটিও নেহাৎ অপরিচিত শব্দ নয়। আর একদিন দেখি Marlene Dietrich (মার্লেনে ডীট্রিষ্) নাম্নী বিখ্যাত জার্ম্মাণ অভিনেত্রীব নামের বঙ্গীকরণ করা হয়েছে—মার্লিন ডায়েট্রিচ। এ রকম কি করা উচিত? যারা সিনেমার কারবার করেন, অন্ততঃ খ্যাতনামা অভিনেতা-অভিনেত্রীদিগের নামের প্রকৃত উচ্চারণ একটু চেষ্টা করলেই তাঁরা জানতে পারেন। কিন্তু আসল কথা কি জান, সে চেষ্টা করবার আবশ্যকতাই কেউ দেখে না। ভুল হয়েছে, হোক গে, বয়ে গেল।

"সিনেমা পোষ্টারের কথা ত শুধু এখন প্রসঙ্গতঃ মনে এল ; এতে হয়ত বেশী কিছু এসে যায় না—কিন্তু এই spirit-টা প্রায় সর্ব্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে। বিশুদ্ধি, accuracy, নির্ভুলতা, এর যে কত বড় মূল্য তা-ই যেন লোকে ভুলে যাচ্ছে। তাই ক্রমেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে লিখবার পূর্ব্বে যে একটা accurate knowledge আয়ত্ত করা দরকার—তা-ই বড় একটা কেউ মনে করে না। আর অসংখ্য ephemeral পত্রিকা প্রভৃতি হয়ে ফল দাঁড়িয়েছে এই যে তার 'কলম' সব ভরতে হবে, কাজেই যে কোন trash আসে তাই কোথাও না কোথাও ছাপা হয়। আর এমন অঘটনও যদি ঘটে যে কোন লিখন-কণ্ডূতি-সম্পন্ন তরুণ কিছুতেই কোথাও তার লেখা বার করতে পারছে না, তার যদি পকেটে কিঞ্চিৎ কাঁচা পয়সা থাকে, অম্‌নি নিজে সম্পাদক হয়ে বসে একখানি 'বেতালা' কিংবা 'বেপরোয়া' কিংবা 'কুজ্ঝটিকা' বার করে ফেলে মনের সাধে নিজের লেখা ছাপার অক্ষরে দেখে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। কাজেই দাঁড়িয়েছে এই যে বঙ্গ-সরস্বতীর সর্ব্বাঙ্গ যেন দুষ্টব্রণে একেবারে কণ্টকিত হয়ে উঠেছে।

"একটা জিনিষ তোমরা লক্ষ্য করো। ইংরিজীতেও কত সস্তা সাহিত্য বার হয় ; colloquial কিংবা local dialects-এও অনেক থাকে—যেমন সংস্কৃত-নাটকে স্ত্রীলোক এবং ছোটলোকের কথা সচরাচর প্রাকৃতে লেখা থাকে। কিন্তু যেখানে প্রচলিত সাধু ইংরিজী ভাষা প্রয়োগ হচ্ছে সেখানে কোন বাণান ভুল কিংবা idiom ভুল কেউ দেখতে পাবে না ; এবং যদি হঠাৎ অজ্ঞতা বা

অনবধানতাবশতঃ কেউ ঐ প্রকার ভুল করে ফেলেন, তবে তিনি লজ্জিতই হন, বাহাত্বরী করে অর্ব্বাচীনতার পরিচয় দেন না। এবং সেই সব পত্রিকা ও পুস্তকাদি পড়লেই মনে হয় যে তাদের লেখার পেছনে অনেকখানি তথ্যান্মুসন্ধান, অনেকখানি চিন্তাশীলতা রয়েছে। একেবারে "কলমস্থ চোটাং" ভূঁইফোঁড় কলমবাজ সেখানে সাহিত্যিক বলে গণ্য হয় না এবং তাদের রচনাকে কেউ সাহিত্য বলে না।

"আমাদের ছুর্ভাগ্য এই যে লেখার ও লেখকের serious-ness ও দায়িত্বের অম্নুভূতি আমরা যেন হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের দেশে লেখা ও পড়ার ভেতরে একটা divorce হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বঙ্কিমবাবু শুনতে পাই একবার আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'দেখহে, আমাদের ভেতরে যারা পড়ে তারা লেখে না, আর যারা লেখে তারা পড়ে না।' এর যদি একটা বিহিত না করা যায় তবে সাহিত্যই বা গড়ে উঠবে কি করে, আর লোকশিক্ষাই বা হবে কি করে? যাক্, কথায় কথা বেড়ে গেল। তোমার লিখবার ইচ্ছে আছে, লিখবে না কেন? তবে বেশ একটু তৈরী হয়ে নিয়ে লিখো—তাহলে হয়ত তোমার 'কুজ্ঝটিকা'র ভেতর থেকেও আলোক বিচ্ছুরিত হবে। কেমন?"

"সত্যিই তৈরী হয়ে নিতে চেষ্টা করব" বলিয়া যুবক বিদায় গ্রহণ করিল।

আশ্বিন, ১৩৪২।

বাঙ্গালীর পত্রিকা

বাঙ্গালীর পত্রিকা

এই কিছুদিন হইল *Advance* নামক দৈনিক সংবাদপত্র—যাহা শ্রদ্ধেয় ৺যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন—তাহা উহার পরিচালকগণ চালাইতে অসমর্থ হওয়ায় জনৈক অ-বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর হস্তে চলিয়া গিয়াছে। দিনের পর দিন কত খবরই ত আমাদের কাণে আসে; কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে যে এই সংবাদটি পড়িয়া বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মনে বেশ একটা অবসাদ আসিয়া পড়িয়াছিল।

এক সময় ছিল—যখন ধীরে ধীরে ঈষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মারফতে ব্রিটিশ রাজত্ব এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে—তখন আমাদের বাঙ্গালা দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রায় সম্পূর্ণভাবেই

বাঙ্গালীর হাতে ছিল। বড় বড় হৌসের মুচ্ছুদ্দি, বেনিয়ান, মহাজন, বাঙ্গালীই ছিল। কলিকাতার যত বড় বড় বর্দ্ধিষ্ণু ধনী পরিবারের নাম আমরা এখনও শুনিতে পাই, তাহাদের ভাগ্য-লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা ব্যবসায়বাণিজ্য দ্বারাই হইয়াছিল। কিন্তু ব্যবসায়ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা যখন নানা কারণে ক্রমে ক্রমে ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল, তখনও শিক্ষাক্ষেত্রে, রাজনীতিক্ষেত্রে, সংবাদপত্রক্ষেত্রে, মোটামুটি ভাবে সব intellectual ব্যাপারেই, বাঙ্গালী শীর্ষস্থানে রহিল।

অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা এখানে ছাড়িয়াই দিই—সংবাদ-পত্র বিষয়েই দেখা যাউক। সংবাদপত্র পরিচালনা একাধারে রাজনৈতিক এবং cultural প্রতিষ্ঠার একটা মস্ত উপায় এবং নিদর্শন। বাঙ্গালার রাষ্ট্রনৈতিক নেতৃগণ যেমন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমস্ত ভারতময় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তেম্নি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং সুন্দরভাবে তাহা পরিচালনা করিয়া সমস্ত সমাজের মধ্যে অসামান্য শক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন। আর শুধু বাঙ্গালা দেশেই যে বাঙ্গালীরা সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রিত করিতেন, তাহা নহে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে—পঞ্জাবে, আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে, আরও নানা স্থানে, বাঙ্গালী সম্পাদক ও বাঙ্গালী সংবাদপত্র-পরিচালক নিজেদের প্রতিভা ও কর্ম্মশক্তি-বলে বাঙ্গালার গৌরব বর্দ্ধিত করিতেন। আর আজ কলিকাতার বুকের উপরে একটির পর একটি করিয়া বাঙ্গালীর সংবাদপত্র তাহাদের হস্তচ্যুত হইয়া যাইতেছে। কি শোচনীয় অবস্থা!

শুধু যে এই সেদিন *Advance* কাগজখানি এইরূপ হস্তচ্যুত হইয়া গেল তাহা নহে, বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে কতগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কাগজ যে হস্তান্তরিত এবং তুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইয়াছে তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথের *Bengalee* ; তিনি রাজনীতিক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর হইতে সে কাগজ রক্ষা করিবার তেমন চেষ্টা আর কেহই করিল না, কিছুদিন অ-বাঙ্গালী বির্‌লা ও শর্ম্মার হাতে টিম্‌টিম্ করিয়া চলিয়া পরে একেবারেই উঠিয়া গেল। এখন আর তাহার চিহ্নমাত্র নাই ; তাহারই ভগ্নাবশেষের উপর এখন মুসলমানগণের *Star of India*-র নক্ষত্রভাতি শোভা পাইতেছে। অথচ বাঙ্গালী হিন্দুগণের মধ্যে ধনী গুণী জ্ঞানীর অভাব নাই। তারপরে উল্লেখযোগ্য পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের *Servant* সংবাদপত্র। কয়েক বৎসর, বিশেষতঃ অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে, খুব জোরের সঙ্গে চলিয়া ধীরে ধীরে বন্ধ হইয়া গেল। তারপর ৺চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের *Forward*— ইহার বিচিত্র কাহিনী ত সকলেরই মনে আছে। কত রকম-ফেরই যে ইহার হইল! *Forward* বন্ধ হইয়া হইল *New Forward*, তারপর *Liberty*, আবার *Forward*! কতবারই যে এই কোম্পানী গণেশ উল্টাইল তাহার ইয়ত্তা নাই, এখন কোনমতে কায়ক্লেশে সপ্তাহান্তে আত্মপ্রকাশ করিয়া দিন গুজরান করিতেছে।

তরুণিমা

কি দুঃখের বিষয় ! এখন মাত্র গুটি দুই তিন সংবাদপত্র বাঙ্গালীর পরিচালনায় সুশৃঙ্খলভাবে চলিতেছে। এপ্রকার ইতিহাসের পর ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি যে বাঙ্গালীকে কেহ আর আজকাল গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না ? কেন গ্রাহ্য করিবে ? বাঙ্গালার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সাংবাদিক প্রতিষ্ঠান, যাহাতে বাঙ্গালী এযাবৎ প্রভুত্ব করিয়া আসিয়াছে, সেই সব পর্য্যন্ত আজকাল অ-বাঙ্গালীর অর্থে পুষ্ট, প্রতিপালিত এবং তাহাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও শাসিত হয়, বাঙ্গালীর আর লজ্জা রাখিবার স্থান কোথায় ?

বাঙ্গালার সাময়িক সাহিত্যের আর একটা দিকের কথাও মাঝে মাঝে মনে হয়—প্রসঙ্গতঃ এই স্থলেই তাহা বলিয়া ফেলি। কথাটা হইতেছে quality সম্বন্ধে। দৈনিক সংবাদ-পত্রের কথা এস্থলে বলিতেছি না, বলিতেছি সাপ্তাহিক, কি পাক্ষিক, কি মাসিক পত্রিকাদির কথা।

আজকাল যদি নবীন ফার্ম্মেসীর গাড়ীবারান্দার নীচে অথবা এস্‌প্লানেডের ট্রাম-শেডের ভিতরে দুই চারি মিনিট দাঁড়ান তাহা হইলেই দেখিতে পাইবেন কত বিচিত্র রকমের বিবিধ ঢংএর রং-বেরংএর সাময়িক পত্র রূপের পসরা লইয়া আপনার চক্ষু যেন ধাঁধাইয়া দিতেছে। আর সংখ্যাই বা তাহাদের কত ? রোজই যেন দুই একখানি নূতন নূতন পত্রিকার আবির্ভাব দেখা যায়। আবার হয়ত দুই চারি সপ্তাহ বা মাস যাইতে না যাইতেই ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিই অলক্ষ্যে তিরোহিত হয়। সে কথা

যাক, এত অজস্র ফুল ফুটিলে যে তাহার অধিকাংশই ঝরিয়া পড়িবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, এত যে অগুন্তি পত্র পুষ্পিত-পল্লবিত হইয়া আপাতদৃষ্টিতে বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের উর্ব্বরতার পরিচয় প্রদান করিতেছে, ইহার মধ্যে serious-বিষয়ক পত্র কয়টি ? একটিও আছে কিনা সন্দেহ। গল্প, উপন্যাস, নাটক ও চিত্রসংবলিত সাময়িক পত্রিকা ত থাকিবেই, এবং হয়ত অধিকাংশই এইরূপ হইবে—সব দেশেই হইয়া থাকে। কিন্তু গম্ভীর বিষয়ে চিন্তাপূর্ণ আলোচনার জন্য কি একখানি পত্রিকাও থাকিবে না ? এইরূপ serious পত্রিকার অভাব সমাজের মানসিক দৈন্যেরই পরিচায়ক। ইউরোপ ও আমেরিকায়, কত বিচিত্র রকমের তরল-সাহিত্য-সংবলিত পত্রিকার সঙ্গে সঙ্গে আবার কত serious ধরণের পত্রিকা রহিয়াছে, Nineteenth century and after, Fortnightly Review, North American Review, *Revue des deux mondes,* প্রভৃতি—যাহাতে গল্প, উপন্যাস, চিত্র একদম থাকে না। অথচ সেই সব কাগজ ক্রেতার অভাবে উঠিয়া যায় নাই ; বরঞ্চ বিশ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া সতেজে সেই সব কাগজ চলিতেছে।

যদি কেহ বলেন যে পাশ্চাত্যের কথা স্বতন্ত্র, সেখানে পাঠক-সমাজ অতিবিস্তৃত, অত পাঠক, অন্ততঃ গুরুগম্ভীর বিষয়ে অত পাঠক আমাদের দেশে নাই, সুতরাং আমাদের দেশে ওরকম কাগজ চলা সম্ভব নহে ; তাহা হইলে তদুত্তরে

কি দুঃখের বিষয় ! এখন মাত্র গুটি দুই তিন সংবাদপত্র বাঙ্গালীর পরিচালনায় সুশৃঙ্খলভাবে চলিতেছে। এপ্রকার ইতিহাসের পর ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি যে বাঙ্গালীকে কেহ আর আজকাল গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না ? কেন গ্রাহ্য করিবে ? বাঙ্গালার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সাংবাদিক প্রতিষ্ঠান, যাহাতে বাঙ্গালী এযাবৎ প্রভুত্ব করিয়া আসিয়াছে, সেই সব পর্য্যন্ত আজকাল অ-বাঙ্গালীর অর্থে পুষ্ট, প্রতিপালিত এবং তাহাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও শাসিত হয়, বাঙ্গালীর আর লজ্জা রাখিবার স্থান কোথায় ?

বাঙ্গালার সাময়িক সাহিত্যের আর একটা দিকের কথাও মাঝে মাঝে মনে হয়—প্রসঙ্গতঃ এই স্থলেই তাহা বলিয়া ফেলি। কথাটা হইতেছে quality সম্বন্ধে। দৈনিক সংবাদ-পত্রের কথা এস্থলে বলিতেছি না, বলিতেছি সাপ্তাহিক, কি পাক্ষিক, কি মাসিক পত্রিকাদির কথা।

আজকাল যদি নবীন ফার্ম্মেসীর গাড়ীবারান্দার নীচে অথবা এস্‌প্লানেডের ট্রাম-শেডের ভিতরে দুই চারি মিনিট দাঁড়ান তাহা হইলেই দেখিতে পাইবেন কত বিচিত্র রকমের বিবিধ ঢংএর রং-বেরংএর সাময়িক পত্র রূপের পসরা লইয়া আপনার চক্ষু যেন ধাঁধাইয়া দিতেছে। আর সংখ্যাই বা তাহাদের কত ? রোজই যেন দুই একখানি নূতন নূতন পত্রিকার আবির্ভাব দেখা যায়। আবার হয়ত দুই চারি সপ্তাহ বা মাস যাইতে না যাইতেই ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিই অলক্ষ্যে তিরোহিত হয়। সে কথা

যাক, এত অজস্র ফুল ফুটিলে যে তাহার অধিকাংশই ঝরিয়া পড়িবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, এত যে অগুন্তি পত্র পুষ্পিত-পল্লবিত হইয়া আপাতদৃষ্টিতে বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের উর্ব্বরতার পরিচয় প্রদান করিতেছে, ইহার মধ্যে serious-বিষয়ক পত্র কয়টি ? একটিও আছে কিনা সন্দেহ। গল্প, উপন্যাস, নাটক ও চিত্রসংবলিত সাময়িক পত্রিকা ত থাকিবেই, এবং হয়ত অধিকাংশই এইরূপ হইবে—সব দেশেই হইয়া থাকে। কিন্তু গম্ভীর বিষয়ে চিন্তাপূর্ণ আলোচনার জন্য কি একখানি পত্রিকাও থাকিবে না ? এইরূপ serious পত্রিকার অভাব সমাজের মানসিক দৈন্যেরই পরিচায়ক। ইউরোপ ও আমেরিকায়, কত বিচিত্র রকমের তরল-সাহিত্য-সংবলিত পত্রিকার সঙ্গে সঙ্গে আবার কত serious ধরণের পত্রিকা রহিয়াছে, Nineteenth century and after, Fortnightly Review, North American Review, *Revue des deux mondes*, প্রভৃতি—যাহাতে গল্প, উপন্যাস, চিত্র একদম থাকে না। অথচ সেই সব কাগজ ক্রেতার অভাবে উঠিয়া যায় নাই ; বরঞ্চ বিশ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া সতেজে সেই সব কাগজ চলিতেছে।

যদি কেহ বলেন যে পাশ্চাত্যের কথা স্বতন্ত্র, সেখানে পাঠক-সমাজ অতিবিস্তৃত, অত পাঠক, অন্ততঃ গুরুগম্ভীর বিষয়ে অত পাঠক আমাদের দেশে নাই, সুতরাং আমাদের দেশে ওরকম কাগজ চলা সম্ভব নহে ; তাহা হইলে তদুত্তরে

এইটুকু বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, গল্প-উপন্যাস-চিত্রবর্জ্জিত গম্ভীরবিষয়ক প্রবন্ধসংবলিত সাময়িক পত্র বাঙ্গালা দেশে চলা যে শুধু সম্ভব তাহা নহে, বস্তুতঃ বহু বৎসর পর্য্যন্ত সগৌরবে এই রকম পত্রিকা চলিয়াছিল। তবে তাহা আমাদের decadent প্রগতিযুগের বাঙ্গালাতে নহে, দুই এক পুরুষ পূর্ব্বের গৌরবমণ্ডিত serious-minded বাঙ্গালাতে চলিয়াছিল।

সুবিখ্যাত ৺দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয়ের "নব্যভারত" এই ধরণের একখানা খুব উচ্চাঙ্গের পত্রিকা ছিল। বোধ হয় পঁচিশ বৎসরেরও অধিক কাল আগাগোড়া cultural এবং serious প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালার চিন্তাশীল শিক্ষিত সমাজের ধ্যানের ও মনের খোরাক "নব্যভারত" যোগাইয়াছে। তাছাড়া, বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন", অক্ষয়চন্দ্রের "সাধারণী" ও "নবজীবন", ঠাকুরবাড়ীর "সাধনা" ও "ভারতী", সুরেশ সমাজপতির "সাহিত্য", নারীসমাজের জন্য "বামাবোধিনী" ও "অন্তঃপুর" প্রভৃতি পত্রিকা গল্প ও উপন্যাসের চাহিদা কিয়ৎপরিমাণে যোগাইলেও বিচিত্র প্রবন্ধ-সম্ভারে বঙ্গীয় সমাজে লোকশিক্ষা বিস্তার করিয়াছে। ঐ সব পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদি এখনও পড়িলে বিস্মিত হইতে হয় যে কত গভীর বিষয়ে কত সুনিপুণ আলোচনা তন্মধ্যে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

সেই সব পত্রিকা তাহাদের নিজ নিজ পাঠক-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিত ; শুধু বিকৃতরুচি গড্ডলিকা-প্রবাহের কল্পিত মনোরঞ্জন করিবার নিমিত্ত সেই সব পত্রিকা তাহাদের আদর্শচ্যুত হইত না।

বাঙ্গালীর পত্রিকা

আজকাল শুধুই শুনিতে পাই supply and demand-এর বুলি—লোকের চাহিদা অনুসারে মালের যোগান দিতে হইবে। কাজেই ব্যাপারও দাঁড়াইয়াছে একেবারে "বাজারিয়া" অথবা mercenary ; এমন সম্পাদক বা পত্র-পরিচালক পাওয়া দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে যিনি বিকৃত রুচি বা ইতর মনোবৃত্তির প্রতি পৌরুষের সহিত তীব্র কশাঘাত করিতে সাহস পান—যেমন পাইতেন বঙ্কিমচন্দ্র, সুরেশচন্দ্র, দেবীপ্রসন্ন। সেই মেরুদণ্ডেরই যেন একান্ত অভাব ঘটিয়াছে। কাজেই সকলেই যেন একই স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে। সুতরাং সাময়িক সাহিত্যও একঘেয়ে অন্তঃসারশূন্য বৈচিত্র্যহীন আদর্শ-বিবর্জ্জিত হইয়া চলিয়াছে। বাঙ্গালী সমাজের cultural অবনতির ইহা আর একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন।

তাই এই প্রশ্নই শুধু মনে আসে, এই যে সর্ব্বাঙ্গীণ decadence বা অধোগতির স্রোত—যাহার কতক পরিচয় বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের এই অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রদত্ত হইল—এই স্রোতের গতিরোধ করিবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা কি বাঙ্গালী করিবে না? না করিলে বাস্তবিকই বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ ভয়াবহ ও নিবিড়-নৈরাশ্যপূর্ণ।

আশ্বিন, ১৩৪২।

বঙ্গসাহিত্যে অর্ব্বাচীন যুগ

বঙ্গসাহিত্যে অর্বাচীন যুগ

[রাঁচি বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ]

আজ রাঁচির বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে আপনারা যে আমাকে সভাপতিপদে বৃত করিয়াছেন তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আপনাদিগের এই নির্ব্বাচনে আমি নিজেকে সাতিশয় গৌরবান্বিত বোধ করিতেছি সন্দেহ নাই; কিন্তু একথাও সত্যের খাতিরে বলা আবশ্যক যে এই সম্মান গ্রহণ করিতে আমি অত্যন্ত সঙ্কোচ অনুভব করিতেছি।

এই সঙ্কোচের অনেক কারণ আছে। প্রধান কারণ এই যে যদিও কারণে ও অকারণে, সময়ে ও অসময়ে, আমার লিখন্-কণ্ডূতি জাগিয়া উঠে, এবং তাই মাঝে মাঝে লিখিয়াও ফেলি,

কিন্তু তাই বলিয়া যে আমি একেবারে সাহিত্যিকের পদবীতে উন্নীত হইয়া গিয়াছি একথা আমি নিজে অন্ততঃ মনে করি না। আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, আজ এই নগরে এবং এই সভাতে আমার অপেক্ষা সুপরিচিত, বয়োবৃদ্ধ এবং জ্ঞানবৃদ্ধ বহু ব্যক্তি উপস্থিত আছেন, সভাপতির গুরুভার তাঁহাদের কাহারও উপর ন্যস্ত হইলেই সর্ব্বতোভাবে শোভন হইত।

সে যাহাই হউক, আমার মত অব্যবসায়ী ব্যক্তিকে যে আপনারা সাহিত্যসভার পুরোহিত রূপে বরণ করিলেন, ইহাতে আমি স্থানমাহাত্ম্যই প্রকট দেখিতেছি ; কারণ আপনারা জানেন —আশা করি উপস্থিত বন্ধুগণ আমার এই কথাতে মনঃক্ষুণ্ণ হইবেন না—যে রাঁচি সহরের একটি বিশেষ খ্যাতি আছে, এবং তদ্দরুণ এখানে যে প্রকৃতিস্থ ভাবে, sane ভাবে, কেহ কিছু করিবে এ রকম বড় কেহ একটা প্রত্যাশা করেন না। সুতরাং, অপরং কিং বা ভবিষ্যতি ?

কিন্তু রাঁচি শহরের লোকেরা—আমি বিশেষতঃ রাঁচি-প্রবাসী বাঙ্গালীদের কথাই বলিতেছি—sane-ই হউন বা তদ্বিপরীতই হউন, তাঁহাদের মধ্যে বন্ধুপ্রীতি, দেশপ্রীতি ও সৌহার্দ্দ্যবন্ধনের অভাব নাই। আমি এই যে অল্প কয়েকটি দিন রাঁচিতে কাটাইয়াছি, তাহাতেই এবিষয়ে আমার দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে। রাঁচিবাসী বাঙ্গালীকে প্রবাসী বাঙ্গালী বলিতে আমার মোটেই অভিরুচি হয় না, প্রত্যুত মনে বড়ই ব্যথা লাগে। বস্তুতঃ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও তাঁহারা প্রবাসী

বাঙ্গালী ছিলেন না, বাঙ্গালা মায়ের ঘরের ছেলেই ছিলেন ; বৃহত্তর বঙ্গের প্রত্যন্তদেশে তাঁহারা বাঙ্গালীর প্রতিভা, বাঙ্গালীর কর্ম্মশক্তি, বাঙ্গালীর সভ্যতার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেন, এবং যথেষ্ট সম্ভ্রম ও সম্মানের পাত্র ছিলেন। রাজশক্তির এক অভাবিত-পূর্ব্ব বিধানে অকস্মাৎ বঙ্গমাতার ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইয়া আজ এই স্থান *Bengala irredenta*-তে পরিণত হইয়াছে, স্বদেশী বাঙ্গালী প্রবাসী বাঙ্গালীতে পরিণত হইয়াছে। বাঙ্গালীর এই সমস্ত উপনিবেশ এখন আশ্রয়চ্যুত হইয়া যেন "ন ঘরকা ন ঘাটকা" অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা গভীর পরিতাপের বিষয়।

তবে কোন দুঃখ কোন কষ্টই জগতে অবিমিশ্র নহে ; তাহা হইলে এ সংসারে জীবন-যাপন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিত। স্বদেশ ও স্বজন হইতে বিচ্ছেদের এই গভীর মর্ম্মব্যথার মধ্য দিয়াও একটা বস্তু ধীরে ধীরে মহৎ কল্যাণরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে ; এবং সেই কল্যাণরূপটিই আমাকে এ কয় দিন মোহিত করিয়াছে। সে কল্যাণটি এই যে এই প্রবাসের অনুভূতি, এই বিচ্ছেদের বেদনা হইতেই বোধ করি আজ এই দেশে যে সমস্ত বাঙ্গালী রহিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে স্নেহের বন্ধন, প্রীতির যোগ, সহানুভূতি ও সমবেদনার সূত্র অতি আন্তরিক ও নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালীর সর্ব্ববিধ আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-পদ্ধতি, সংস্কার-সভ্যতা তাঁহারা এমন ভাবে আপনার করিয়া লইয়াছেন, এমন স্নেহের সহিত আঁকড়িয়া ধরিয়াছেন, যে বোধ করি

বাঙ্গালাতে থাকিলে এতটা হইত না। এই সেদিন শারদীয়া ৺দুর্গাপূজা সমাপনান্তে বিজয়া-দশমীর জ্যোৎস্নাপুলকিত সন্ধ্যায় বাপীতটে প্রতিমা-বিসর্জ্জনের সময়ে প্রবাসী বাঙ্গালীর আবাল-বৃদ্ধবনিতার যে সপুলক সমাবেশ, যে উৎসবমুখর কোলাহল দেখিয়াছি, তাহাতে এই কথাটাই আমার মনে বারংবার উদিত হইয়াছে। বাঙ্গালার গৌরবময় স্বদেশী আন্দোলনের যুগের সন্ধিক্ষণে কবি রবীন্দ্রনাথ যে আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন:

"বাঙ্গালীর প্রাণ, বাঙ্গালীর মন,
বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাই বোন,
এক হউক, এক হউক, এক হউক,
হে ভগবান্!"

সেই পুণ্য আশীর্ব্বাদ এবং একান্ত প্রার্থনা আজ যে বর্ত্তমান বাঙ্গালার বাহিরেও এমনভাবে পূর্ণ ও সফল হইয়াছে, ইহা সন্দর্শন করিয়া কত আনন্দে যে আমার হৃদয় ভ'রিয়া উঠিয়াছে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা দুষ্কর। আমি কেবল এই প্রার্থনা করি, এই দৃশ্য চিরন্তন হউক, এই চিত্র অক্ষয় হউক, এই স্নেহের বন্ধন অটুট হউক।

আজ সাহিত্য-সম্মেলনে আমরা উপস্থিত। আজ এখানকার প্রবাসী বাঙ্গালীগণ স্বতঃই স্বদেশের সাহিত্য-সন্দেশের কিঞ্চিৎ স্বাদ পাইবার জন্য সমুৎসুক। তাঁহারা নিজেরা বিদেশে পড়িয়া রহিয়াছেন, নানা কর্ম্মকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, জীবিকানির্ব্বাহ-প্রচেষ্টায় অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্যে তাঁহারা অল্পই সময় পান

সাহিত্যের খবর লইতে, হয়ত বিরল অবকাশে সামান্য ছিটা-ফোঁটা মাত্র আহরণ করিবার ফুরসৎ পান—আমি অবশ্য মোটা-মুটি কর্ম্মক্লান্ত চাকুরীজীবী অথবা ব্যবসায়রত বাঙ্গালীর কথাই বলিতেছি, অবসরসম্পন্ন অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ সাহিত্যরসিক প্রবীণ, জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের কথা বলিতেছি না। বোধ করি সেই জন্যই, যখন ৺পূজাবকাশে বাঙ্গালা দেশ হইতে অনেক গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তি ভ্রমণোপলক্ষ্যে রাঁচিতে সমাগত হন, এবং ইঁহারাও সারা বছরের হাড়ভাঙ্গা খাটুনী হইতে একটু ছুটি পান, তখন ইঁহাদের মনে এই ইচ্ছাই জাগিয়া উঠে, পাঁচ জন বাহিরের লোককে লইয়া একটু সাহিত্যালোচনা করিলে, একটু বাঙ্গালা দেশের খবর লইলে, বাঙ্গালা মায়ের স্নেহনিবিড় ক্রোড়খানির একটু স্পর্শ আবার পাইতে পারিলে মন্দ কি? সময়টা বড় আনন্দে কাটান যায়, উপকারও হয় প্রচুর। আমার মনে হয়, প্রবাসী হৃদয়ের এই আকাঙ্ক্ষা হইতেই আপনাদের বার্ষিক সাহিত্য-সম্মেলনের উদ্ভব, এবং এই আকাঙ্ক্ষা অতি স্বাভাবিক ও অতি সুন্দর।

সুতরাং কলিকাতা হইতে আগত একজন বন্ধুর মুখে দেশের চিন্তাধারার একটু পরিচয়, বাঙ্গালা সাহিত্য এখন কি ভাবে কোন্ মুখে চলিতেছে সেই বিষয়ে একটু বিবৃতি, ইহা পাইবার জন্য আপনারা স্বভাবতঃই উৎসুক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমা-অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তিকে পাকড়াইলে সে পরিচয় ও বিবৃতিটুকু আরও পূর্ণতর ও সুন্দরতর ভাবে আপনারা পাইতেন। তবে

আপনাদের কৃতকর্ম্মের ফল আপনাদিগকে নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে। "মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ" নীতি অনুসারে আমার নিকট হইতেই যাহা হউক কিছু আপনাদিগকে শুনিতে হইবে। আমিও সংক্ষেপেই এবিষয়ে দুই একটি কথা আপনাদের কাছে বলিতে চেষ্টা করিব। আশা করি আপনাদিগের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইব না।

প্রথমেই আমার কিন্তু একটু দ্বিধায় পড়িতে হইতেছে। লোকে সু-খবর শুনিবার জন্যই ব্যগ্র হইয়া থাকে, এবং সু-খবর দিতেই লোকে পঞ্চমুখ হইয়া থাকে ; কিন্তু খবর যদি ভাল না হইয়া মন্দ হয়, তবে সে প্রকার সন্দেশ বিতরণ করা বড় লোভনীয় মনে হয় না। তাই আমার কিঞ্চিৎ দ্বিধা বোধ হইতেছে। দ্বিধার কারণ এই যে আমি বাঙ্গালা সাহিত্যের যেটুকু সংবাদ রাখি—এবং সংবাদ কিছু কিছু যে রাখি তাহাও ঠিক—তাহাতে আমার ধারণা এই যে, সংবাদ অশুভ। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালার সাহিত্যিক প্রচেষ্টা যে দিকে ক্রমশঃ চলিতেছে, সাহিত্য-রচনার ধারা যে খাতে প্রবাহিত হইতেছে এবং ইদানীং কিছু দ্রুত গতিতেই প্রবাহিত হইতেছে, আমার ধারণা যে তাহা দেশের ও জাতির কল্যাণের দিকে নহে, পরন্তু দারুণ দুর্গতি ও অধঃপতনের দিকে লইয়া যাইতেছে।

কথাটা অত্যন্ত রূঢ় ও কঠোর শুনাইতেছে সন্দেহ নাই; কিন্তু আমার বিশ্বাস যে ইহা অতি রূঢ় ও কঠোর সত্য। এক এক সময় মনে হয়, এবং রাঁচিস্থ দুই একটি বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে

বঙ্গসাহিত্যে অর্ব্বাচীন যুগ

কথা-প্রসঙ্গে বোধ হয় এভাব আমি ব্যক্তও করিয়াছি যে, যে পঙ্কিল আবর্ত্তের মধ্যে আজ বাঙ্গালা সাহিত্য হাবুডুবু খাইতেছে, কলুষ-কালিমা অঙ্গের ভূষণ করিয়া যে বীভৎস উলঙ্গ নৃত্য বঙ্গসরস্বতীর উপবনে আরম্ভ হইয়াছে, সে পঙ্কিলতা ও সে বীভৎসতার সংস্পর্শে আপনাদের যে বিশেষ আসিতে হয় নাই, ইহা আপনাদের পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে ত সংস্পর্শ বাঁচাইয়া চলা দুষ্কর; যেখানটায় হাত পড়ে, সেইখানটাই দেখি কালি-মাখান পচা পর্য্যুষিত ন্যক্কারজনক। সত্য কথা বলিতে, বাঙ্গালাদেশে, বঙ্গীয় সমাজে এ এক বিষম বিপদ্ উপস্থিত।

আপনারা হয়ত মনে করিতেছেন, কথাটা অতিরঞ্জিত, কিন্তু তাহা নহে। আমি সংক্ষেপেই বলিব, কিন্তু একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতে চেষ্টা করিব।

বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গালা সাহিত্য এক অতি গৌরবের সামগ্রী। আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা ও নানা বিড়ম্বনা সত্ত্বেও এই সাহিত্যের মধ্য দিয়া বিগত দেড় শতাব্দী ধরিয়া জাতীয় সাধনাকে, জাতীয় আদর্শকে, জাতীয় রসবোধকে প্রস্ফুটিত ও সংরক্ষিত করিবার চেষ্টা অব্যাহত ভাবে চলিয়া আসিতেছে; কত লোকশিক্ষার আয়োজন এই সাহিত্যের মধ্য দিয়াই হইয়াছে; আর এই সাহিত্যের মধ্যে বাঙ্গালীর বহুমুখী প্রতিভা কত বিচিত্র রকমে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। মধ্যযুগের বৈষ্ণব-গীতিমুখরিত বাঙ্গালা-সাহিত্যের কথা না-ই বলিলাম, আধুনিক ব্রিটিশ যুগের কথাই

বলি। রাজর্ষি রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজা রাজেন্দ্রলাল, পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, মধুসূদন, ভূদেব, প্যারীচাঁদ, রঙ্গলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, অক্ষয়চন্দ্র, রাজকৃষ্ণ, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, চন্দ্রনাথ, ইন্দ্রনাথ, কালীপ্রসন্ন, শশধর, কেশবচন্দ্র, রাজনারায়ণ, শিবনাথ, অশ্বিনীকুমার, স্বামী বিবেকানন্দের মধ্য দিয়া, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, সত্যেন্দ্রনাথ, দেবকুমার, প্রভাতকুমার, সুরেশচন্দ্র, প্রমথনাথ, অতুলপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত এই সাহিত্যের ধারা অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়া আসিতেছে।

এই সমস্ত প্রাতঃস্মরণীয় সাহিত্যস্রষ্টাদিগের সকলেরই রুচি যে একই প্রকার ছিল, প্রচেষ্টা যে একমুখী ছিল তাহা নহে, নানা বিভিন্ন দিকে, নানা বিভিন্ন রীতিতে ইঁহাদের বিচিত্র প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে। কেহ পদ্যে, কেহ গদ্যে, কেহ কাব্যে, কেহ নাট্যে, কেহ গানে, কেহ সমালোচনায়, কেহ প্রবন্ধে, কেহ উপন্যাসে, কেহ ছোট গল্পে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন; কাহারও রচনা ভাবগম্ভীর, কাহারও রচনা হাস্যচটুল; কেহ সনাতনপন্থী, কেহ পাশ্চাত্যপন্থী। এইরূপ নানা ভাবের, নানা রুচির, নানা রীতির সমাবেশেই বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিচিত্র রত্নসম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, এবং আজ জগতের সাহিত্য-সভায় স্থান পাইবার অধিকারী হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটি ঐক্যধারা অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার ন্যায় নিরন্তর প্রবাহিত হইয়াছে। সেই ঐক্যধারাটি এই যে,

এই সমুদয় সাহিত্যপ্রচেষ্টাই সমাজের ও দেশের কল্যাণ ও স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পেই নিয়োজিত ছিল। দুই একটি উদাহরণ দিই।

বাঙ্গালাদেশে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মনীষীরা দেখিলেন যে লোকশিক্ষাকল্পে বাঙ্গালা ভাষায় নানাবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা রচনা করা আবশ্যক ; তাই রাজা রাজেন্দ্রলালের "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলী পর্য্যন্ত কত শিক্ষা-গ্রন্থই রচিত হইল।

অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের আবশ্যকতা অনুভূত হইল, অমনি তৎসাহায্যকল্পে স্ত্রীপাঠ্য কত পত্রিকা প্রকাশিত হইল, "অন্তঃপুর," "বামাবোধিনী-পত্রিকা," "ভারত-মহিলা" প্রভৃতি —আজকালকার উদীয়মান তরুণ-সমাজে বোধ করি ইহাদের নামও অপরিচিত। কি সুন্দর ছিল ইহাদিগের প্রবন্ধাবলী! কত মহৎ আদর্শ, যাহা সমাজকে পরিবারকে কল্যাণশ্রী-মণ্ডিত করে, ইহাদিগের পত্রে পত্রে প্রতিফলিত হইত!

তারপর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সঙ্ঘাতে কত ধর্ম্মান্দোলন, কত সমাজসংস্কার-প্রচেষ্টা আরম্ভ হইল বাঙ্গালার বুকে। সেই সকল প্রচেষ্টা ও আন্দোলনই সাহিত্যে ছাপ রাখিয়া গিয়াছে, এবং তাহার ফলে সাহিত্য কত সমৃদ্ধ হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের "জীবন-বেদ" এবং প্রার্থনাবলী, আচার্য্য শিবনাথের বক্তৃতা ও কবিতাবলী, স্বামী বিবেকানন্দের অগ্ন্যুদ্গারী রচনাবলী, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুগম্ভীর সুযুক্তিপূর্ণ অথচ সুললিত

গ্রন্থাবলী, এই সমস্ত বাঙ্গালার মনীষাকে কত সংস্কৃত, কত মার্জ্জিত, কত পরিণত আকার দান করিয়াছে, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়।

তারপর আসিল রাজনৈতিক জাগরণের যুগ—কবি রঙ্গলাল তাঁহার "স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়" গীতিতে যে জাগরণের প্রথম উদ্বোধন করিয়াছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "আনন্দমঠ" ও "দেবী চৌধুরাণী"তে দেশভক্তি ও নিষ্কাম সাধনার উদাত্ত মন্ত্রে,—হেমচন্দ্র তাঁহার "বাজ্ রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে", "বারেক এখনও কিরে দেখিবি না চাহিয়া", প্রভৃতি চিত্তোন্মাদকারী গীতিকার তূর্য্যনিনাদে,—নবীনচন্দ্র "রৈবতক"-"কুরুক্ষেত্র"-"প্রভাস"-এ ধর্ম্মরাষ্ট্র-সংস্থাপনের বিরাট্ আদর্শে, "রঙ্গমতী"তে মহারাষ্ট্রসমরে বঙ্গীয় যুবক বীরেন্দ্রনাথের অলৌকিক বীরত্বগাথায়, "পলাশীর যুদ্ধ"-এ আম্রকাননে কামান-গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে,—রমেশচন্দ্র "রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা" ও "মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত"-এর অরুণরাগরঞ্জিত গৌরবোজ্জ্বল চিত্রোন্মেষ সহকারে—যে রাষ্ট্রীয় নবজাগরণের আবাহন করিয়াছিলেন—সেই জাতীয় জাগরণে সাহিত্যের দান কি কিছু কম ছিল? আজ ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়, বাঙ্গালী লেখকের কোন উপন্যাসের অন্তর্গত একটি সঙ্গীত আজ সমগ্র ভারতের জাতীয় সঙ্গীত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এই অমর সঙ্গীত "বন্দে মাতরম্"-এর ইতিহাস এক কথায় আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় সাহিত্যের দানের ইতিহাস বলিলেই হয়।

বঙ্গসাহিত্যে অর্ব্বাচীন যুগ

তারপর আসিল যুগান্তর-কারী স্বদেশীর যুগ। রবীন্দ্রনাথের

"সার্থক জনম মাগো জন্মেছি এই দেশে,
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালবেসে" ;

দ্বিজেন্দ্রলালের

"কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ,
বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ" ;

রজনীকান্তের

"আমরা নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাৎ ছোট,
তবু আছি সাত কোটি ভাই জেগে ওঠো" ;

অশ্বিনীকুমারের

"অগ্নিময়ী মাগো আজি, ডাকি সকলে মা" ;

আরও কত শত খ্যাতনামা ও অখ্যাতনামা কবি ও লেখকের কত লেখা, কত কবিতা, কত সঙ্গীত বাঙ্গালার বুককে উচ্ছ্বসিত, তরঙ্গিত করিয়া তুলিয়াছিল, আজ ত্রিশ বৎসর পরেও তাহার রেশ যেন থাকিয়া থাকিয়া বাজিয়া উঠিতেছে। নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি, সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেছি যে বাঙ্গালার স্বদেশী যুগের সেই গৌরবময় আদর্শের সহিত কিঞ্চিন্মাত্রও পরিচয় লাভের সুযোগ আমার ঘটিয়াছিল। সাহিত্য সমাজকে কি করিয়া তুলিতে পারে, জাতীয় আদর্শকে কি রকম উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারে, কত শুষ্ক তরু সাহিত্যের যাদুদণ্ড-স্পর্শে পত্রে পুষ্পে পল্লবে মুঞ্জরিত হয়, এবং সমাজ-সাধনা ও সামাজিক সাহিত্য পরস্পরের অভিঘাতে কি পরিমাণে সমৃদ্ধ ও শক্তি-

সম্পন্ন হইয়া উঠিতে পারে, বাঙ্গালার স্বদেশীযুগই তাহার নিদর্শন।

আমার বক্তব্য বোধ হয় কতকটা সুপরিস্ফুট হইয়াছে। বক্তব্য এই যে বঙ্গীয় প্রতিভা সাহিত্যকে সমাজের কল্যাণসাধনের উপকরণরূপে, সমাজের শক্তি, স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধিবর্দ্ধনের অস্ত্ররূপেই ব্যবহার করিয়াছে; শুধু একটা ব্যক্তিগত অসংযত খেয়াল বা উচ্ছৃঙ্খল লালসার প্রসাধনরূপে ব্যবহার করে নাই।

সাহিত্য ও সমাজের সম্পর্ক কি, ব্যষ্টি ও সমষ্টির হিত-প্রচেষ্টার মধ্যে সীমারেখা কোথায়, সাহিত্যে নীতি ও ধর্ম্মের কোন শাসন-বাঁধন মানা উচিত কিনা, এ সম্বন্ধে বহু গবেষণা করা যাইতে পারে, বহু গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। বস্তুতঃ নানা দেশে নানা সমাজে একদিকে আর্ট ও সাহিত্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, অপর দিকে ধর্ম্ম ও নীতি ও সমাজকল্যাণ, ইহাদের পরস্পরের সম্পর্ক বা সম্পর্কের অভাব সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে, বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। আজিকার এই সভায় বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এই অতি জটিল বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন দেখি না।

মোটামুটি এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে প্রচলিত নীতি ও সামাজিক ব্যবহার-সংস্কার সমাজ-হিতের প্রয়োজন হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। তাই সমাজের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন স্তরে নৈতিক আদর্শেরও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। বিশুদ্ধ বিবেকানুমোদিত intuition এবং অভ্রান্ত নৈতিক মাপকাঠি কিছু আছে কিনা

জানি না—ইহা Ethics-এর মস্ত বড় একটা প্রশ্ন—কিন্তু একথা ঠিক যে বহুকালব্যাপী অভিজ্ঞতাতে, বহু পিতৃপুরুষের প্রত্যক্ষ পরিচয়লব্ধ ব্যবহারে যে সমস্ত কর্ম্মপ্রণালী সমাজ-বিধ্বংসী, anti-social, বা সমাজের অকল্যাণকর বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহাকেই পাপ বা দুর্নীতি বা অপরাধ বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে। সুতরাং মানিতেই হইবে যে নীতিজ্ঞান ও ধর্ম্মজ্ঞান সাক্ষাৎ দেবলোক হইতে যদি আগত না-ও হইয়া থাকে, তবু পরম পবিত্র পিতৃলোক হইতে বংশপরম্পরায় প্রসৃত, বৰ্দ্ধিত, মাৰ্জ্জিত হইয়া আসিতেছে।

"যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ন রিষ্যতে॥"

ইহাই নীতিধর্ম্মের সনাতনতম ও আধুনিকতম ব্যাখ্যা। সমাজ-বিধ্বংসী যে নীতি তাহাই দুর্নীতি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন সমাজে, হয়ত একই কর্ম্মপদ্ধতি বিভিন্ন ফল প্রদান করে, তাই এক সমাজে এক সময়ে, যে নীতি অনুমোদিত হয়, অন্য সমাজে কিংবা অন্য সময়ে সেই সমাজেই সেই নীতি বৰ্জ্জিত হয়। বিবাহাদি সামাজিক সংস্কারে ইহার যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়—কোথাও একপত্নীত্বই প্রচলিত, কোথাও বা বহুপত্নীত্বও অনুমোদিত, কোথাও বা আবার বহুপতিত্বও প্রচলিত।

কিন্তু এমন অনেক নীতি অনেক প্রচেষ্টা আছে যাহা চিরকাল ধরিয়া সমাজের অহিতপ্রসূ বলিয়া দেখা গিয়াছে সকল সমাজে;

এবং শুধু যে সমষ্টিহিসাবেই সমাজের অহিতপ্রসূ তাহা নহে, ব্যষ্টি হিসাবেও অহিতপ্রসূ। অর্থাৎ সেই সমস্ত অভ্যাস, সেই সমস্ত চেষ্টা ব্যক্তিকেও পঙ্গু, নিস্তেজ, অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলে, সমাজকে ত করেই ; সুতরাং তাহা বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

এইরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ অকল্যাণকর ব্যাপারের একটি প্রধান হইতেছে যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতা। সেই জন্যই ঋষিগণ কামকে মানুষের উচ্চতর জীবনের প্রধান রিপু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ কাম—কিংবা ক্রোধ কিংবা লোভ—কোনটাই স্বরূপতঃ রিপু নহে, কিন্তু ইহাদিগের অসংযত ব্যবহার, যথেচ্ছ পরিচালনা, এক কথায় ইহাদিগের উচ্ছৃঙ্খল বিকারই মানুষের পরম রিপু। এইরূপ বিকারগ্রস্ত হওয়াতে কোনও বাহাদুরী নাই ; কোন বিদ্রোহাত্মক দম্ভ প্রকাশের অবকাশ ইহাতে নাই—ইহাতে বিদ্রোহের নামগন্ধও নাই, ইহা মানবের আদিম জৈব প্রবৃত্তির হস্তে আত্মসমর্পণ মাত্র। এই প্রকার আত্মসমর্পণের দ্বারা কি ব্যক্তি, কি সমাজ, কিছুই শক্তিমান্ ও তেজস্বী হইতে পারে না—নিস্তেজ নির্ব্বীর্য্য ক্লীবত্বেই ইহার পরিণতি।

আমার এবিষয়ে এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, বাঙ্গালা সাহিত্যে আজকাল যে হাওয়া বহিতেছে, যে ধারা প্রবাহিত হইতেছে, তাহা মোটামুটি এক কথায় বলিতে গেলে এই যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতার ধারা ; এবং এই কয়েক বৎসরের মধ্যে এই ধারার পঙ্কিলতা ও ক্লেদ অতি ঘৃণাকারজনক ভাব ধারণ করিয়াছে। ভাল

রচনা, ভাল কবিতা কি গল্প যে একেবারে বাহির হয় না তাহা নহে, কিন্তু সে সব এতই কোণঠাসা হইয়া পড়িয়াছে এই পূতি-গন্ধময় আবর্জ্জনার চাপে, যে তাহা বড় একটা চোখে পড়ে না ; এবং সর্ব্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় এই যে, নূতন যে সব লেখক লেখনী ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, যাঁহাদের নিকট হইতে বাঙ্গালা সাহিত্য অনেক কিছু আশা করিতে পারিত, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই এই যৌনবিকারগ্রস্ত।

এক একবার মনে হয়, অতি কুক্ষণেই কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সবুজের অভিযানে তরুণকে ডাক দিয়া বলিয়াছিলেন,

"ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা !
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।"

এখন সেই কাঁচা সবুজের পুচ্ছোত্তলনকারী নৃত্য একেবারে সলোম (Salome) নৃত্যে পরিণত হইয়াছে ! এই সব নর্ত্তক-নর্ত্তকীদিগের কাহারও কাহারও ছন্দের মনোহারিত্ব আছে, তাহার কুফল এই যে যৌন-বিকার আরও চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠে, সামাজিক হিসাবে ইহারাই বেশী অনিষ্টকারী , কিন্তু অধিকাংশেরই ছন্দ-তান-লয়ের সহিত কোনও সম্পর্ক নাই। অর্থাৎ এই জাতীয় অধিকাংশ তরুণ লেখকেরই রচনাকৌশল কিছুই নাই, ষত্বণত্ব-জ্ঞানেরও অভাব, তবে ইহারা জানে যে খুব মোটা যৌন তারে ঘা দিলে তাহা বাজিবে বেশ এবং বিকাইবে বেশ, সুতরাং তাহারা এই প্রকার সহজিয়া-পন্থীই হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই সেদিন ৺পূজার কয়েকদিন পূর্ব্বে আমি এক দোকানে বসিয়া আজকালকার ফ্যাশান-মাফিক কয়েকখানি পত্রিকার পূজা-সংখ্যা দেখিতেছিলাম। ইহার মধ্যে কয়েকখানি নাকি আবার Communism বা Marxism বা সাম্যবাদের মুখপত্র। ইহাদের প্রচ্ছদপটের দিকে নজর পড়িতেই সাম্যবাদের এক বিচিত্র প্রতিকৃতি চোখে পড়িল—নগ্ন নারীমূর্ত্তি। তখন মনে হইল, তা হইবেও বা, কারণ শুনা যায় যে সাম্যবাদের এক প্রধান মন্ত্রই হইতেছে Nationalization of women, অর্থাৎ নারীদিগকে সাধারণ-ভোগ্যা করিয়া তোলা। আরও পাতা উল্টাইলাম, শেষ পর্য্যন্ত দেখিলাম; দেখিলাম যে আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত একেবারে নগ্ন-চিত্রে ভরপূর (এবং বোধ করি নগ্ন-গল্পেও, তবে পড়িবার মত অবকাশ ছিল না, তাই ঠিক বলিতে পারি না)—সাম্যবাদ বটে!

এইরূপ একখানি পত্রিকাতে শুনিতে পাই যে সাহিত্য-অভিজাত ঠাকুর পরিবারের কোন কুলাবতংস অশুভ গ্রহের ন্যায় আবির্ভূত হইয়াছেন। সেই সাম্যবাদী পত্রিকাখানিতে গত বর্ষাকালে একটি "প্রেমসংখ্যা" বাহির হইয়াছিল। ইহা কালধর্ম্ম বটে, কারণ "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" প্রেমের সঞ্চার হওয়া কবিজনানুমোদিত। সেই সংখ্যাতে প্রথম প্রবন্ধই ছিল প্রেমের বিচিত্র ধারা সম্বন্ধে—তাহাতে কবি বায়রণ কি প্রকারে তাঁহার এক ভগিনীর সহিত যৌন-সম্পর্কান্বিত হইয়াছিলেন, ডি. এইচ. লরেন্সকে কেমন করিয়া তদীয়া জননীদেবী

যৌন-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, ইত্যাদি বিচিত্র রসাল বার্ত্তা বর্ণিত ছিল। আর ছিল উক্ত ঠাকুর মহাশয় রচিত একটি "গবিতা" অর্থাৎ গদ্য-কবিতা ; তাহাতে বর্ণিত বিষয় ছিল এই যে, একটি অশান্ত ব্যাকুল তরুণ প্রেমের সন্ধানে পথে বাহির হইলেন, এবং নিদারুণ বর্ষাতে ঢাকুরিয়া লেকের প্রান্তদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বালিগঞ্জ, ভবানীপুর, চৌরঙ্গী ঘুরিয়া অবশেষে চিৎপুরস্থিত "সুবর্ণ-তরু" অঞ্চলে প্রেমের সন্ধান পাইয়া পরিতৃপ্ত হইলেন; এই "গবিতা"-টির সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রেম-পরিতৃপ্তির পরিপূর্ণ চিত্র নগ্ন-ছবি যোগে প্রস্ফুটিত করা হইয়াছিল।

পূজা-সংখ্যা পত্রিকার কথা বলিতেছিলাম ; কেবল যে এই একটি দুইটি পত্রিকা এইরূপ তাহা নহে, অধিকাংশই অশ্লীল ছবি, কবিতা ও গল্পে ভরপূর। ইতঃপূর্ব্বেও দুই চারিটি tentative প্রচেষ্টা যে না দেখিয়াছি nudism-এর দিকে বাঙ্গালা পত্রিকায়, এমন নহে ; কিন্তু এতটা খোলাখুলি ও নির্লজ্জ ও ব্যাপকভাবে পূর্ব্বে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

বলা যাইতে পারে যে, এই জাতীয় অশ্লীল চিত্র-সাহিত্যাদি সব দেশেই অল্পাধিক আছে। কিন্তু তাহার উত্তর এই যে, তাহা থাকিতে পারে, কিন্তু অল্প ও অধিকে যথেষ্ট তফাৎ ; এই সমস্ত ইতর চিত্র ও পত্রিকা তথায় ইতর বলিয়াই গৃহীত হয়, লুকাইয়া ইহার বিক্রয় হয়, ধরা পড়িলে ইহার ব্যবসায়ীরা রাজদ্বারে দণ্ডিত হয়, ভদ্রসমাজে সদম্ভে ইহা আত্মপ্রকাশ করে না, প্রচ্ছন্ন লুক্কায়িত ভাবেই ইহাদের অস্তিত্ব কথঞ্চিৎ রক্ষিত হয়।

আবর্জ্জনাময় নর্দ্দমা যেমন নগরের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে আবশ্যক, হয়ত এইরূপ ক্লেদাক্ত আর্ট ও সাহিত্যেও সমাজশরীরের কোন প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে ; কিন্তু সেই নর্দ্দমা যত আবৃত হয়, সেই drainage যত underground হয়, ততই সমাজ-স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল। রাস্তাঘাট, বাড়ী-ঘর-দুয়ার, সবই যদি নর্দ্দমায় পরিণত হয়, তবে ত তদুত্থিত বিষবাষ্পে সমাজের অপঘাত-মৃত্যু অনিবার্য্য। নগরের পল্লীবিশেষে "সুবর্ণ-তরু"-র অবস্থিতি বর্ত্তমান মানবসমাজের অবস্থা এবং ব্যবস্থায় অবশ্যম্ভাবী হইতে পারে—"যত্র নানাদিগ্দেশাদাগত্য রাত্রৌ পক্ষিণো নিবসন্তি"—কিন্তু সেই তরুর শাখাপল্লব যদি সমস্ত নগরকে আবৃত করিয়া ফেলে, তবে তাহার আওতায় ত কিছুই বাড়িয়া উঠিতে পারে না।

কিন্তু বিপদ্ যেটা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, সেটা প্রকৃতপক্ষে তাহাই। এই যে পঙ্কিলতার, অশ্লীলতার ধারা, ইহা যে দুই একটি notorious পত্রিকাতেই আবদ্ধ তাহা নহে, পরন্তু অল্পাধিক পরিমাণে প্রায় সমস্ত সাময়িক সাহিত্যকেই আক্রমণ করিয়াছে—বোধ হয় দুই একটি ছাড়া এমন মাসিক বা সাপ্তাহিক নাই, যাহাতে অশ্লীল রচনা ও চিত্র আজকাল স্থান পায় না। ফল হইয়াছে এই যে বাঙ্গালা পত্রিকা গৃহ-পরিবারে প্রবেশ করিতে দেওয়াই বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অল্পে ও অধিকে অনেক তফাৎ। অল্পাংশ দুষ্ট হইলে তাহা সহজেই বর্জ্জন করা যায়, কিন্তু দুষ্টি

যদি অধিকাংশতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তবে ইহার সংস্পর্শ এড়ান অসম্ভব। আর এই উচ্ছৃঙ্খলতা দোষ শুধু যে সাময়িক সাহিত্যেই আবদ্ধ এমন নহে; অধিকাংশ উপন্যাস, বিশেষতঃ তরুণ লেখকদের, এই দোষে দুষ্ট। অশ্লীল গল্প, উপন্যাস ও কবিতা লেখা যেন একটা বাহাদুরীর মধ্যে দাঁড়াইয়াছে, ইহা যেন একটা বড় বীরত্বের কার্য্য। কিন্তু বস্তুতঃ এ কদর্য্যতার মধ্যে বীরত্ব নাই, আছে দুর্ব্বলতা; নূতনত্ব নাই, আছে আদিমতা; ইহা দম্ভের বিষয় নহে, লজ্জার বিষয়।

সর্ব্বাপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় এই যে, যাঁহারা আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবীণ, যাঁহারা ইচ্ছা করিলে সাহিত্যকে শাসন করিয়া সংযত রাখিতে পারেন, তাঁহারাও যেন কি রকম পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থায় রহিয়াছেন—প্রবল প্রতিবাদের শক্তিও যেন তাঁহারা হারাইয়া ফেলিয়াছেন। কেহ কেহ ত অপর দল ভারী দেখিয়া এবং তাহারাই আসর জমাইতেছে দেখিয়া একেবারে শিং ভাঙ্গিয়া বাছুরের দলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

প্রবীণ সাহিত্যিকদিগের মধ্যে শরৎ চাটুয্যে ও নরেশ সেন গুপ্ত মহাশয়ের কথা ত ছাড়িয়াই দিই, কারণ বর্ত্তমান বাঙ্গালায় উচ্ছৃঙ্খল সাহিত্যধারার প্রবর্ত্তনের তাঁহারা ত এক প্রকার নাটের গুরু বলিলেই হয়। শরৎ বাবুর রচনার আদর্শ সম্বন্ধে বাঙ্গালাদেশে ত standing joke-ই দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে —আমাদের দেশে রমণীর আদর্শ যে সাবিত্রী তাহা ঠিকই আছে,

তবে কিনা মহাভারতের সাবিত্রী নয়, ‘‘চরিত্রহীন’’-এর সাবিত্রী! কাজেই তাঁহাদিগকে এই সংযম ও শালীনতার প্রচেষ্টার আসরে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু আরও ত অনেক প্রবীণ সাহিত্যিক রহিয়াছেন—জলধর রহিয়াছেন, দীনেন্দ্রকুমার রহিয়াছেন, হেমেন্দ্রপ্রসাদ রহিয়াছেন, সৌরীন্দ্রমোহন রহিয়াছেন, প্রমথ চৌধুরী রহিয়াছেন, আরও কত জন রহিয়াছেন —সর্ব্বোপরি কবি রবীন্দ্রনাথ রহিয়াছেন। কিন্তু সাহিত্যের এই ক্লেদ নিবারণের যে একটা সজোর প্রচেষ্টা তাহা ত কই দেখিতে পাই না। প্রবীণ সম্পাদকও কত রহিয়াছেন, কই এ বিষয়ে প্রবল জনমত সংগঠনের প্রয়াস ত দেখিতে পাই না।

সমাজদেহে এই উচ্ছৃঙ্খলতা-বিষ যে অর্ব্বাচীন সাহিত্যের মারফতে দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধির ন্যায় প্রবেশ করিতেছে, তদ্বিষয়ে আমাদের সাহিত্যরথিগণ ও জননায়কগণ এক রকম উদাসীন বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু এবিষয়ে তাঁহাদের দায়িত্ব গুরুতর ; সমাজ তাকাইয়া আছে তাঁহাদের দিকে, তাঁহারা এ বিষয়ে কি বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তাহা দেখিবার জন্য। কিন্তু কি এক অস্বাভাবিক মেরুদণ্ডহীনতা এবং কাপুরুষতা যেন আজ সমাজপতিদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে!

আজ তাই মনে পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা—যে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘‘বঙ্গদর্শন’’-এর তীব্র কশাঘাতে সকল উচ্ছৃঙ্খলতা ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া দমন হইয়া যাইত, সাহিত্যিক আগাছা আমূল উৎপাটিত হইয়া যাইত। তাই কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়,

"Bankim ! thou should'st be living at this hour :
Bengal hath need of thee : She is a fen
Of stagnant waters."

আজ মনে পড়ে সম্পাদক হিসাবে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির কথা, দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর কথা, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের কথা—সত্য কথা বলিতে যাঁহারা ভয় পাইতেন না, আবশ্যক হইলে অপ্রিয়ভাষণেও যাঁহারা পরাঙ্মুখ হইতেন না, স্বর্ণ-গর্দ্দভ-পূজা যাঁহাদের ধাতে ছিল না, এবং কাঞ্চনকৌলীন্য যাঁহাদিগের নিকট কোনদিন কোন মর্য্যাদা লাভ করে নাই। সত্যই মনে হয়, তে হি নো দিবসা গতাঃ !

আপনারা কি মনে করেন, সে রকম তীব্র শাসন আজিকার দিনে অসম্ভব, সে রকম উদ্দীপ্ত জনমত গঠন অসম্ভব ? মোটেই নহে। আজ চক্ষের সমক্ষে আমেরিকায় কি ঘটিয়া গেল ? আমেরিকার চলচ্চিত্রজগতের কর্ত্তৃপক্ষগণ অর্থের লালসায় জঘন্য প্রবৃত্তি-উত্তেজক চলচ্চিত্রের আমদানী কিছুকাল হইতে উত্তরোত্তর অধিক মাত্রায় করিতেছিলেন—আদিম মানুষের কামিনী-কাঞ্চন-লিপ্সাতে ক্রমশঃই ঘৃতাহুতি প্রদান করিতে অগ্রসর হইয়া কুৎসিত ছবিতে দেশ ছাইয়া ফেলিতেছিলেন। এমন সময়ে জনকতক জননায়কের দৃষ্টি এই বীভৎসতার দিকে আকৃষ্ট হইল, League of Decency and Purity সঙ্ঘবদ্ধ হইল, এই সমস্ত জঘন্য চিত্রের বয়কট ঘোষণা করা হইল ; সুতরাং এই জাতীয় চিত্রে দর্শকের ভীড় আর জমিল না, লোকসান হইতে লাগিল।

কাজেই Almighty Dollar-এর রাজ্যে নগ্নচিত্রের কর্ত্তাদিগের টনক নড়িল, এবং বাধ্য হইয়া ভদ্রতর চিত্রে তাহাদের অর্থ ও সামর্থ্য নিয়োজিত করিতে হইল।

কিন্তু যদি সামাজিক পবিত্রতা রক্ষা করিবার চেষ্টা বাস্তবিক করিতে হয়, যদি সরস্বতীর কমলবনে এই পাশব বপ্রক্রীড়া সত্য সত্যই বন্ধ করিতে হয়, তবে চাই এবিষয়ে একাগ্রতা, চাই সাহস, সর্ব্বোপরি চাই মেরুদণ্ড। আমার মনে হয় বাঙ্গালা সাহিত্যে বর্ত্তমান অনাচার একদম বন্ধ করিয়া সমাজকে এই কলুষিত বাষ্পের কবল হইতে মুক্ত করিতে এই সবল মেরুদণ্ডেরই বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

জার্ম্মাণ ডিক্টেটর হিট্‌লার এক মূহূর্ত্তে এই যৌন-জঞ্জাল সাফ করিয়াছিলেন,—বার্লিন নগরে প্রকাশ্য ময়দানে যৌন-সাহিত্যের বহ্ন্যুৎসব বা bonfire করিয়া। আমাদের দেশে ত ডিক্টেটর হঠাৎ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, আমাদের জননায়ক ও সাহিত্যরথীদিগেরই এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। নচেৎ ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে বাঙ্গালীর শিক্ষিত পরিবারের সুকুমারমতি বালক-বালিকা এবং অ-কুমারমতি যুবক-যুবতী, উভয়েরই ভবিষ্যৎ ভয়াবহ।

আমাদের বাঙ্গালীজাতির সম্মুখে নানান্ দিকে নানান্ সমস্যা ত রহিয়াছেই—আমরা রাজনৈতিক হিসাবে পরাধীন ও অর্থনৈতিক হিসাবে দুর্ব্বল ও পঙ্গু—ইহার উপরে যদি নগ্ন চিত্র এবং অশ্লীল সাহিত্যের দৌলতে আমাদের সমাজবন্ধন,

আমাদের পারিবারিক পবিত্রতা, শুচিতা ও শালীনতা নষ্ট হইয়া গিয়া, বঙ্গ-সমাজ অবিমিশ্র promiscuous যৌন-চর্চ্চার সাধন-ক্ষেত্র হইয়া উঠে, তবে কি যে আমাদের ভবিষ্যৎ হইবে তাহা ভাবিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

মনের আবেগে বোধ করি অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম, হয়ত অনেক অপ্রীতিকর কথাও বলিয়া ফেলিলাম, আপনারা আমাকে তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। বাঙ্গালা সাহিত্য আমাদের সকলেরই অতি আদরের ধন, অতি গৌরবের সামগ্রী ; তাই এই সামগ্রী এরূপভাবে—উচ্ছৃঙ্খল লম্পটের ক্রীড়নক ভাবে—ব্যবহৃত হইতে দেখিলে মনে বড় কষ্ট হয়, তাই এত কথা বলিয়া ফেলিলাম।

বস্তুতঃ আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এই অশ্লীলতার বিষয় ছাড়াও, আরও অনেক লক্ষণ দেখা যাইতেছে ; তাহাও মোটেই আশাপ্রদ নহে। বাঙ্গালা সাহিত্যের আসর হইতে সুগভীর চিন্তা ও স্বাধীন মনীষার পরিচয় ক্রমশঃই লুপ্ত হইতেছে। সাহিত্যে শুধু এক রকম লেখাই থাকে না ; গদ্য, পদ্য, কাব্য, নাটক, গান, প্রবন্ধ, সমালোচনা, ইতিহাস, ইত্যাদি নানা বিষয়ের নানা রীতির পাঁচমিশালীতেই সাহিত্য গঠিত। আমাদের বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে শুধু যা একটু গল্প কবিতা নাটক উপন্যাসেরই আবির্ভাব আমরা দেখিতে পাই ; এবং ইহাদের মধ্যেও serious ধরণের বড় বেশী কিছু দেখি না।

আমাদের সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থাবিষয়ক, দেশের সমস্যাবিষয়ক, চিন্তার খোরাক যোগাইতে পারে এমন উপন্যাস

আজকালকার অর্ব্বাচীন যুগের সাহিত্যে বড় একটা বাহির হয় না। ঐতিহাসিক উপন্যাস ত লোপই পাইয়াছে; অথচ ঐতিহাসিক উপন্যাস কত শিক্ষাপ্রদ, ইহা জাতীয় জীবনকে কত পরিপুষ্ট করে—বঙ্কিমচন্দ্রের ও রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসে গোটা বাঙ্গালী জাতিকে গড়িয়া তুলিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না—সেই ঐতিহাসিক উপন্যাস বস্তুটিই আজ উঠিয়া যাইতে বসিয়াছে। ইহারও কারণ আমাদের লেখক-দিগের শ্রমবিমুখতা ও লঘুচিত্ততা—ওরকম একখানি উপন্যাস লিখিতে হইলে শুধু ঔপন্যাসিক প্রতিভা ছাড়া আরও অনেক বিষয় চর্চ্চা করিতে হয়. অনেক অধ্যয়ন করিতে হয়, শুধু "কলমস্থ চোটাং" ওসব জিনিষ হয় না—সুতরাং ওবিষয়ে আমাদের আধুনিক-আধুনিকাদের অভিরুচি নাই। তৎপরিবর্ত্তে মামুলী প্রেমের বা অবৈধ প্রণয়ের চটুল গল্প লেখা অনেক সহজ। সম্প্রতি আবার আর এক প্রকার ঔপন্যাসিক সাহিত্যের রেওয়াজ হইয়াছে; ইহাতে তথাকথিত শ্রমজীবি-সমাজের কাহিনী পাশ্চাত্য লেখকদিগের অনুকরণে লিপিবদ্ধ করিবার প্রচেষ্টা দেখা যায়, কিন্তু রচনা অতি প্রাণহীন এবং চিত্র একেবারেই অবাস্তব—ইহাকে বলা যাইতে পারে বস্তি-সাহিত্য।

প্রবন্ধ কিংবা সমালোচনা সাহিত্যেও কাহারও বিশেষ মনোযোগ দেখিতে পাই না। পড়িবার মত প্রবন্ধ পড়িতে হইলে সেই প্রাচীন ভূদেব বাবু, বঙ্কিম বাবু, চন্দ্রনাথ বাবু, ত্রিবেদী মহাশয়ের রচনাই পড়িতে হয়, না হয় রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য

প্রবন্ধগুলি পড়িতে হয়,—তা তিনিও ত, শত নারীনৃত্য ও ঋতুরঙ্গ ও তরুণ সাহিত্যিকদিগকে অজস্র প্রশংসাপত্র দান সত্ত্বেও, একজন প্রাচীনই, অর্থাৎ সেই ভিক্টোরীয় যুগেরই অন্যতম পুরাতন স্তম্ভ। সেই সব প্রবন্ধ যখন পড়ি, তখন তাহাদের রচনার পারিপাট্য, যুক্তির সারবত্তা, এবং চিন্তার গভীরতা ও মৌলিকতা আমাদিগকে মুগ্ধ করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে এই আক্ষেপও জন্মায় যে এ ধরণের লেখা—এ ধরণের কেন, ইহার কাছাকাছি ধরণেরও গভীর আলোচনা—আজকাল বড় একটা চোখে পড়ে না।

সমালোচনা এক প্রকার আজ কাল খুব রপ্ত হইয়াছে বটে ; সে সমালোচনার অর্থ হয় নিছক্ মুখ-খিস্তি, নয় নিছক্ স্তবস্তুতি ; এই সব লেখাকে যুক্তিপূর্ণ নিরপেক্ষ সাহিত্যিক সমালোচনা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। বস্তুতঃ যাহা দেখিতেছি তাহাতে একদিকে এই খিস্তি-সাহিত্য, অপরদিকে ঐ বস্তি-সাহিত্য, এই উভয়ে মিলিয়া প্রকৃত সাহিত্যকে উদ্বাস্তু করিয়া তুলিয়াছে।

জীবনচরিত লেখা ত উঠিয়াই গিয়াছে ; যে কয়েকখানি জীবনী বাঙ্গলা সাহিত্যের গৌরব, যেমন মাইকেলের জীবনী, বিদ্যাসাগরের জীবনী, রামতনু লাহিড়ীর জীবনী, মহর্ষির জীবনী প্রভৃতি, তাহাদের লেখকগণ ত আর মর-জগতে নাই।

সহজ সরল অনাড়ম্বর বর্ণনা, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রাকৃত কাহিনী, এই সব narrative বিষয়েও লেখা বড় একটা দেখি না। যতীন্দ্রমোহনের "উড়িষ্যার চিত্র"-এর

ন্যায় বই, কিংবা দীনেন্দ্রকুমারের "পল্লীচিত্র" ও "পল্লী-বৈচিত্র্য"-এর ন্যায় বই, কিংবা জলধর বাবুর "হিমালয় ভ্রমণ"-এর ন্যায় বই আর ত কই বাহির হইল না। এই সব বইয়ের সুন্দর ঝর্‌ঝরে লেখা মনকে যেন আবিষ্ট করিয়া তুলে। এই ধরণের গ্রন্থে গ্রন্থকার নিজেকে যতটা প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারেন, ততই জিনিষটি উপভোগ্য ও artistic হইয়া উঠে। ইদানীং দুই একখানি ভ্রমণবৃত্তান্ত যাহা বাহির হইয়াছে, তাহাতে গ্রন্থকারের এই যে অত্যাবশ্যক সংযম তাহারই অভাব, পরন্তু উত্তম পুরুষকে জাহির করিবার প্রচেষ্টা তাহাতে এত প্রকট যে পাঠকের রীতিমত বিরক্তি উৎপাদন করে।

এক কথায় বলিতে গেলে বলা যায় যে, এই অর্ব্বাচীন যুগের সাহিত্যের লক্ষণই হইতেছে কোন রকম কষ্টস্বীকারে অনিচ্ছা, সযত্নসাধনায় বিমুখতা, দাম্ভিক আড়ম্বরপ্রিয়তা, একটা patronizing attitude—একখানি বই লিখিবার শ্রম স্বীকার করিয়া তাঁহারা যেন পাঠকের মস্তকটি ক্রয় করিয়া রাখিয়াছেন, এমনই একটা ভাবের অভিব্যক্তি—সর্ব্বোপরি পরমতের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ, পাশ্চাত্ত্যের বস্তাপচা মালের পুনরুদ্গিরণ, অক্ষম অনুচিকীর্ষা, এবং এই সমস্ত লক্ষণের অন্তরালে একটি আদিম জৈবিক যৌন বুভুক্ষা এবং একটি অন্তঃসারশূন্য নিষ্ক্রিয় মস্তিষ্ক।

এই প্রকার অবস্থার সমাবেশে যাহা হওয়া অবশ্যম্ভাবী, তাহাই এই অর্ব্বাচীন সাহিত্যে ঘটিয়াছে। অথচ আমরা আধুনিকতা ও culture-এর চটকে এতই মুগ্ধ ও গর্ব্বস্ফীত হইয়া

পড়িয়াছি যে আমাদের পিতৃপিতামহকে সব back-number-এর কোঠায় ফেলিয়া রাখিয়াছি—we think our fathers fools, so wise we grow! অথচ আমাদের পিতৃপিতামহের মেরুদণ্ড, মনীষা ও তেজস্বিতার শতাংশের একাংশেরও যদি আমরা অধিকারী হইতাম, তবে আমাদের নিজেদের জীবন, আমাদের সমাজের জীবন অন্য আকার ধারণ করিত।

সাহিত্যের বর্ত্তমান ধারার বিষয়ে ত কিছু আলোচনা করা গেল, কিন্তু এখন আবার আর এক উৎপাত দাঁড়াইয়াছে, সে উৎপাত ভাষার উপরে।

শত শত বর্ষ ধরিয়া নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া, নানা বিচিত্র ঐতিহাসিক ঘটনার ভিতর দিয়া বঙ্গভাষা আজ যে আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা আমাদের আধুনিকদের পছন্দ হইতেছে না। তাঁহারা ভাষা-জননীর পুরাতন রূপে আর সন্তুষ্ট নহেন; তাঁহাকে ঘষিয়া মাজিয়া নবীনারূপে না সাজাইতে পারিলে আর তাঁহাদের মন উঠিতেছে না। তাই আজ বিরাট্ উদ্যমে ভাষা-সংস্কার, বর্ণমালা-সংস্কার, বাণান-সংস্কার, ইত্যাকার নানাবিধ সংস্কারের দাপটে বঙ্গ-সরস্বতীর জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে।

কোন পণ্ডিত বলেন, অ আ ক খ প্রভৃতি ভারতীয় বর্ণমালা বর্জ্জন করিতে হইবে—অর্থাৎ যে বর্ণমালা মানব-সভ্যতার আদি যুগ হইতে বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্তের মধ্য দিয়া, সংস্কৃত-প্রাকৃত-পালি-শৌরসেনী-মাহারাষ্ট্রী-মাগধী-অর্দ্ধমাগধীর মধ্য

দিয়া আর্য্য-মঙ্গল-দ্রাবিড়ের মধ্যে বিছার সভ্যতার ও সংস্কৃতির বিস্তার করিয়াছে—যে বর্ণমালা ধ্বনিবিচারের দিক্ হইতে দেখিলে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুসম্বদ্ধ এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুবিন্যস্ত বর্ণমালা—সে বর্ণমালা দ্বারা আর চলিবে না; তৎপরিবর্ত্তে Roman Script অর্থাৎ রোমক বর্ণমালার a, b, c, d, e, বা হ, য, ব, র, ল আমদানী না করিতে পারিলে, আর সভ্যসমাজে মুখ দেখান যায় না।

কোন পণ্ডিত বলেন, বাঙ্গালা গণিত চিহ্নগুলি—অর্থাৎ ১, ২, ৩, প্রভৃতি—এগুলিকে নির্ব্বাসনে পাঠাইয়া তৎপরিবর্ত্তে 1, 2, 3, প্রভৃতি ইংরাজী চিহ্নগুলি না প্রবর্ত্তন করিলে আর ভদ্রতা রক্ষা হয় না।

সম্প্রতি কয়েকটি বিশ্ব-পণ্ডিত (অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়-চিহ্নিত পণ্ডিত, সমাস—মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয়) স্থির করিয়াছেন যে বঙ্গ-সরস্বতী বর্ণ-দ্বিত্বের চাপে, বিসর্গের দাপটে এবং দীর্ঘ ঈ-এর উৎপাতে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন; সুতরাং "কার্য্য' কে "কার্য", "পর্য্যন্ত" কে "পর্যন্ত", "পুনঃপুনঃ", কে "পুনঃপুন", "ধর্ম্ম" কে "ধর্ম", "রাণী" কে "রানি", "পাখী" কে "পাখি", ইত্যাদি লিখিয়া তাঁহাকে মুক্তিদান করিতে হইবে। আমাদের মাসী-পিসী-মামী প্রভৃতি এত কাল স্ত্রীত্বসূচক ঈ-কারের অবগুণ্ঠনের আওতায় তাঁহাদের ব্যক্তিত্বকে অভিব্যক্ত করিতে পারেন নাই—এতকাল পরে ঈ-এর অপসারণে পর্দ্দা ফাঁক হওয়াতে তাঁহারা মুক্তবায়ুর আস্বাদন পাইলেন—feminism-এর জয়জয়কার!

ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে এই যে, বাঙ্গালা ভাষাটা যেন এক তাল কাদা, ইহাকে লইয়া ইহা হইতে শিব হইতে বানর পর্য্যন্ত যাহা কিছু গড়িয়া তুলিবার পরোয়ানা যেন ইহাঁদিগের প্রত্যেককেই দেওয়া হইয়াছে।

ভাষার একটা ইতিহাস আছে, ইহা একটা organic growth, ইহার বর্ত্তমান রূপ একটা আকস্মিক ব্যাপার নহে, প্রত্যেকটি শব্দের বর্ত্তমান রূপের পশ্চাতে বিচিত্র কাহিনী রহিয়াছে। ইংরাজী ভাষা সম্পর্কে আপনারা অনেকেই Trench's Study of Words বইয়ের কথা জানেন—ভাষার রূপের মধ্যে কত যে ইতিহাস কত যে পুরাতত্ত্ব কত যে উপন্যাস লুক্কায়িত থাকে, অতি সুনিপুণ তুলিকায় সেই চিত্র তিনি দেখাইয়াছেন। কিন্তু এসব আমাদিগের অর্ব্বাচীন যুগের সংস্কারকদিগের চিন্তার পরিধির মধ্যেই আসে না—কারণ তাঁহারা যে নেহাৎই সংস্কারক, কোন সম্ভ্রম বা দরদ বা সঙ্কোচের বাধা ত তাঁহাদের থাকিবার কথা নহে। খুব বেশী ভাবিবার বিষয় হইলে হয়ত ভাবিতে পারেন যে লাইনো-টাইপে ছাপিতে হইলে কি রকম বাণান হইলে সুবিধা—কারণ তাঁহাদের মতে ভাষার জন্য টাইপ নহে, টাইপের জন্য ভাষা—এমন না হইলে সংস্কারক ?

বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করা হঠাৎ অত্যন্ত দুরূহ প্রতিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া এই সব পণ্ডিতগণের নিকট কোন শিশু-ডেপুটেশন প্রেরিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই, অথবা

"আর্য্য" জাতির টিকি কাটিতে, কিংবা "ধর্ম্ম" "কর্ম্ম"-এর ভিত্তিমূল শিথিল করিতে কেহ তাঁহাদিগকে আম্‌মোক্তারনামা দিয়াছে বলিয়াও শুনা যায় নাই, কিন্তু সেজন্য ত এই সব সংস্কারকগণ তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত কর্ত্তব্য হইতে বিরত থাকিতে পারেন না ; সুতরাং শাণিত-কুঠার হস্তে ধারণ করিয়া এই নবীন পরশুরাম-গণ, এবার আর পিতৃ-আজ্ঞায় নহে, স্বয়ংসিদ্ধ হইয়াই ভাষা-জননীর বধসাধনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন।

আমি এই অভিভাষণের গোড়াতে আপনাদিগকে রাঁচির অধিবাসী বলিয়া কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গ করিয়াছিলাম ; কিন্তু এখন দেখিতেছি যে সে ব্যঙ্গ দ্বারা আপনাদের প্রতি আমি অবিচারই করিয়াছি। বস্তুতঃ রাঁচির অধিকার সুদূর-প্রসারিত, অন্ততঃ অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-সমতটে রাঁচির অধিকার যে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্রং নাস্তি।

কথায় কথা বাড়িয়া গেল। খুব সম্ভব ইতিমধ্যেই আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়া থাকিবে। আমার আজিকার দিনে যাহা বলিবার ইচ্ছা ছিল তাহাও প্রায় সবই বলা হইয়া গিয়াছে। এখন উপসংহার করাই শোভন হইবে।

আপনারা দেখিয়াছেন যে রিরংসা ও কামোদ্দীপক সাহিত্যের কথা বাদ দিলেও বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা স্বাস্থ্যের পরিচায়ক নহে, পরন্তু ইহার চারিদিকে এবং সব বিভাগেই যেন একটা *fin-de-siècle* decadence-এর ভাব—স্বাধীন চিন্তার অভাব, একাগ্র সাধনার অভাব, সর্ব্বোপরি পৌরুষের ও দার্ঢ্যের

অভাব। গল্পে উপন্যাসে শুধু কামায়ন, কাব্যে শুধু ফাগুন মাসের দখিণ হাওয়া, গানে শুধু পীরিতি আর ভাটিয়ালী, চিত্রে শুধু নগ্ননারী—এই উপজীব্যে ত কোন সজীব সমাজ কোন সতেজ জাতি গড়িয়া উঠিতে পারে না।

L'art pour l'art—অথবা আর্টের জন্যই আর্টের সার্থকতা—আর্ট ও সাহিত্য অহেতুক ও অনুদ্দিষ্ট—এই সব বুকনী আমরা অনেক শুনিয়াছি। কিন্তু এই প্রবচনের অর্থ যদি এই হয় যে যাহা সমাজবিদ্রোহী তাহাই প্রকৃত আর্ট, যাহা দুর্নীতি-মূলক তাহাই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য, এবং আমাদের রুচির উচ্চতা ও দৃষ্টির সূক্ষ্মতার প্রতিপাদনকল্পে তাহাতেই আমাদের বাহবা দিতে হইবে, তবে আমি স্পষ্টই বলিতেছি যে ঐ প্রবচন মানি না। যে আর্ট ও সাহিত্য মানুষকে দুর্ব্বল করে, নিস্তেজ করে, enervate করে, যাহা এক কথায় মানুষকে অমানুষ করে, সে আর্ট ও সাহিত্যের উচ্চতা মানি না। কারণ,

"সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই।"

সমগ্র মানব-সমাজের পক্ষেই ইহা সত্য; আমাদের বাঙ্গালার মাজের পক্ষে ইহা আরও গুরুতর সত্য। দুর্ব্বলতা, তামসিকতা, ক্লীবতার চর্চ্চা আমরা যথেষ্ট করিয়াছি—"মধুরে বহিবে বায়ু, ভেসে যাব রঙ্গে"—এই *dolce-far-niente*-এর হাওয়া বাঙ্গালীকে বহুকাল জড় বিবশ মৃতপ্রায় করিয়া রাখিয়াছে। আজ যদি ঘটনাচক্রে বাঙ্গালী তাহার দীর্ঘ সুষুপ্তি

হইতে জাগরণের সাড়া দিতেছে, প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিতেছে, আজ আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে বাঙ্গালার সুষুপ্তিপ্রিয় যুব-সমাজকে দখিণ হাওয়ার দোদুল-দোলায় দোল দিয়া আবার ঘুম পাড়াইবেন না। আবার ঘুম পাড়াইলে জাতীয় অপঘাত অনিবার্য্য।

আজ জাতির পক্ষে সমাজের পক্ষে চাই পৌরুষের মন্ত্র, চাই বীরত্বের দীক্ষা, চাই তেজস্বিতার সাধনা :

"দাও আমাদের অভয়-মন্ত্র,
অশোক-মন্ত্র তব,
দাও আমাদের অমৃত-মন্ত্র,
দাও গো জীবন নব।"

এই পৌরুষের সাধনে, এই তেজস্বিতার আবাহনে, এই বীর্য্যের আমন্ত্রণে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা, আমাদের সমস্ত সঙ্কল্প, আমাদের সমস্ত সাহিত্য উৎসৃষ্ট হউক।

"অবনত ভারত চাহে তোমারে.
এস সুদর্শনধারী মুরারি,
সম্মান-শৌর্য্যে পৌরুষ-বীর্য্যে
কর পূরিত নিপীড়িত ভারত তোমারই।"

আজ বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের এই সঙ্কট-মুহূর্ত্তে সুদর্শন-ধারী মুরারি আমাদের সকলের সমবেত সাধনায় সহায় হউন।

বন্দে মাতরম্।

কার্ত্তিক, ১৩৪৩।

বঙ্কিমচন্দ্র
ও
বাঙ্গালার নবযুগ

বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙ্গালার নবযুগ

[মেদিনীপুর বঙ্কিমচন্দ্র-শতবার্ষিক উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ]

আজ মেদিনীপুরবাসীর পক্ষ হইতে বঙ্কিমচন্দ্র-শতবার্ষিক-উৎসবের যে অনুষ্ঠানের আয়োজন আপনারা করিয়াছেন, তাহাতে আমাকে সভাপতিরূপে যোগদান করিতে আহ্বান করিয়া আপনারা আমাকে সত্যই গৌরবান্বিত করিয়াছেন। দিন কয়েক পূর্ব্বে আপনাদের প্রতিনিধি-স্বরূপে কতিপয় শ্রদ্ধেয় বন্ধু যখন আমার ভবনে শুভাগমন করিয়া আমার নিকটে আপনাদের এই আহ্বানবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন তখন বাস্তবিকই আমি চমকিত হইয়াছিলাম, কারণ বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্রে আমি একজন অতি অকিঞ্চন পথচারী পদাতিক মাত্র, এবং সামান্য পদাতিককে হঠাৎ উচ্চপদে আরূঢ় করিলে তাহার অপদস্থ হইয়া পড়িবারই সমূহ

সম্ভাবনা। তাই আপনাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে আমি যথেষ্ট সঙ্কোচ বোধ করিয়াছিলাম।

কিন্তু আপনাদের প্রতিনিধিগণ ছাড়িলেন না। আমার প্রতীতি হইল যে, কেন জানি না, আমার প্রতি এক অহেতুক স্নেহ আপনাদের হৃদয়কে অধিকার করিয়া থাকিবে ; এবং স্নেহ যুক্তির শাসন মানে না। তাই আপনাদের সেই স্নেহের আহ্বান আমি অমান্য করিতে পারিলাম না ; এবং সেই স্নেহের উপর নির্ভর করিয়াই আজ আমি আপনাদের গৃহ-প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইতে সাহসী হইয়াছি। আমার সকল দোষত্রুটি আপনারা নিজেদের স্নেহগুণে মার্জ্জনা করিয়া লইবেন, ইহাই আমার ভরসা। আর আজিকার এই পুণ্য অনুষ্ঠানে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিপূজার মন্দিরে এই সামান্য পূজারীকে যে আপনারা তাহার সামান্য অর্ঘ্য প্রদান করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র যে বৎসর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন হইতে আজ শতবর্ষ অতীত হইয়াছে। তাই আজ তাঁহার অমর স্মৃতি উপলক্ষ্য করিয়া শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান। বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই এই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হইতেছে ; বাঙ্গালার বাহিরেও, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, নানাস্থানে, এই উৎসব সম্পন্ন হইতেছে। হইবারই কথা ; কারণ বাঙ্গালার তথা ভারতের নব-জাগরণের অন্যতম অগ্রদূত বঙ্কিমচন্দ্র।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উপর মেদিনীপুরের, অথবা মেদিনীপুরের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের, আরও দাবী আছে এবং বিশেষ ঘনিষ্ঠ দাবীই আছে; কারণ আপনারা বোধ করি অনেকেই জানেন যে বঙ্কিমচন্দ্রের শৈশব-জীবনে শিক্ষার প্রথম উন্মেষ এই মেদিনীপুরেই হইয়াছিল। তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন মেদিনীপুরে ডেপুটি কলেক্টর। মেদিনীপুরে একটি হাই-স্কুল ছিল, তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র পড়িতেন। দাদার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রও মাঝে মাঝে ঐ স্কুলে যাইতেন। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমের কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণচন্দ্র বেশ কৌতুকের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র এক দিনে বাঙ্গালা বর্ণমালা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। টিড্ নামে একজন বিলাতী সাহেব মেদিনীপুর হাই-স্কুলের হেড-মাষ্টার ছিলেন। একদিন ঐ সাহেব ক্লাস পরিদর্শনে আসিয়া বঙ্কিমের পরিচয় লইলেন। সঞ্জীবচন্দ্র অনুজের কথা বলিবার সময়ে তাঁহার যে এক বেলার মধ্যে বর্ণ-পরিচয় হইয়াছিল, সে কথার উল্লেখ করেন। টিড্ সাহেব শুনিয়া প্রীত হইলেন, এবং পরে তাঁহারই অনুরোধে অতি শৈশবে ইংরাজী শিক্ষার জন্য পিতৃদেব বঙ্কিমচন্দ্রকে ঐ স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন।" এগার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র এই মেদিনীপুর স্কুলেই পাঠাভ্যাস করেন। যে অলৌকিক প্রতিভা উত্তর-জীবনে সমগ্র বাঙ্গালাকে উদ্ভাসিত ও চমৎকৃত করিয়াছিল, তাহার প্রথম শৈশবের স্ফুরণ এই মেদিনীপুরেই

হইয়াছিল, ইহা মেদিনীপুরের কম গৌরবের কথা নহে ; এবং বঙ্কিমের উপরে এই নিবিড় স্নেহবন্ধনের দাবী হইতে কেহই মেদিনীপুরকে বঞ্চিত করিতে পারে না। তাই বলিতেছিলাম, আজ যে মেদিনীপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের শতবার্ষিকী-উপলক্ষ্যে উৎসব-অনুষ্ঠান হইতেছে, ইহা শুধু গুণমুগ্ধ দেশবাসীর বিস্ময়াপ্লুত শ্রদ্ধার নিবেদন নহে, ইহা সন্তানের গৌরবে উচ্ছ্বসিত মাতৃ-হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দের আকৃতি। মেদিনীপুরের এই আনন্দ-অনুষ্ঠান সার্থক হউক।

বঙ্কিম যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বাঙ্গালার ইতিহাসে তখন এক নবযুগের সূচনা। বঙ্কিমের জীবনের বিচিত্র অভি-ব্যক্তির ভিতরে নিগূঢ় ধারাটি আবিষ্কার করিতে হইলে, সেই যুগের লক্ষণের সহিত কিঞ্চিৎ পরিচয় আবশ্যক। আর সে পরিচয় যদি আমরা পাই, তাহা হইলে শুধু বঙ্কিম কেন, সে যুগের বহু মনীষীর, আমাদের জননী মাতৃভূমির বহু সুসন্তানের, জীবন-ইতিহাসই সুস্পষ্ট সুসঙ্গত হইয়া উঠে। আর সেই যুগে কত গুণী জ্ঞানীই যে আমাদের এই বঙ্গমাতার ক্রোড় আলোকিত করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ শুধু একটি কথা বলিলেই বোধ করি যথেষ্ট হইবে। এই ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে, যখন বঙ্কিম জন্মগ্রহণ করিয়ায়াছিলেন, সেই বৎসরেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, এবং বিখ্যাত বাগ্মী ও দেশহিতৈষী কৃষ্ণদাস পাল। এক একজন এক এক দিকে দিক্‌পাল বলিলেই হয়। আর বঙ্কিমের

জন্মের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ও কয়েক বৎসর পরে আবির্ভূত ব্যক্তিগণের নাম যদি উল্লেখ করা যায়, তবে ত মনে হইবে যেন ত্রিদিব-লোক হইতে একটা জ্যোতিষ্কপুঞ্জ আসিয়া বাঙ্গালার আকাশকে ঝলসিত করিয়া তুলিয়াছে। সে যুগ সত্য সত্যই বাঙ্গালার একটা অতি গৌরবময় যুগ, অতি বিস্ময়কর যুগ।

ইংরাজের ভারতাগমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘর্ষে যে বিপুল ভাববিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল—রামমোহন হইতে ডিরোজিও পর্য্যন্ত যে আলোড়ন চলিয়াছিল—ততদিনে সে আলোড়ন কতকটা প্রশমিত হইয়া আসিয়াছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহময় আবেশ বঙ্গীয় সমাজে যে উদ্বেলতা আনয়ন করিয়াছিল, সে উদ্বেলতার ফেনিল উচ্ছ্বাস কতকটা পরিমাণে স্তিমিত হইয়া আসিয়াছিল। তখন পাশ্চাত্য ভাবধারার ফেনিলতা বহুলপরিমাণে লুপ্ত হইয়া গভীরতাতে রূপান্তরিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের মদমত্ত তাণ্ডবের মধ্যে অট্টারাবে নির্ঘোষিত সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী যেমন উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সমাজে ও রাষ্ট্রীয় সংস্থানে ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হইয়া গভীর পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিয়াছিল বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসেও অনেকটা অনুরূপ প্রণালীতেই পাশ্চাত্য ভাব-প্রবাহ ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন সংসাধন করিয়াছিল ; এবং আদর্শের অনুপ্রেরণাও উভয়ক্ষেত্রেই ছিল একই প্রকার।

এই যুগে বাঙ্গালার সমাজে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই যুগের যুগধর্ম্ম এড়াইতে পারেন নাই। তাঁহাদের

অধিকাংশেরই জীবনে অল্পাধিক পরিমাণে এই আদর্শ-নিষ্ঠাই পরিলক্ষিত হয়। সকলের আদর্শই যে একবিধ ছিল তাহা নহে; বস্তুতঃ আদর্শ-সঙ্ঘাতের দিনে তাহা হওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু আদর্শ যাঁহার যে প্রকারই থাকুক না কেন, সেই আদর্শে অচলা নিষ্ঠা সে যুগের প্রধান লক্ষণ ছিল।

শিক্ষিত সমাজে যাঁহারা অগ্রণীস্বরূপ ছিলেন, তাঁহাদের চিত্তে এই আকাঙ্ক্ষাই সদা জাগরূক থাকিত—আমরা যে জ্ঞানের আলোক পাইয়াছি তাহা দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিকীর্ণ করিয়া দিতে হইবে; আমরা যে আদর্শের সন্ধান পাইয়াছি সেই আদর্শের অনুসরণে দেশকে সমাজকে জাতিকে গড়িয়া তুলিতে হইবে; আমাদের শুধু নিজের জ্ঞানটুকু নিজের পুঁজিটুকু লইয়া এক কোণে স্বার্থপরের মত নিজের আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিলেই চলিবে না; আমাদের জ্ঞানের আমাদের শিক্ষার দায়িত্ব আছে, যেটুকু আমরা ভাগ্যবশে লাভ করিয়াছি তাহার উপর সমগ্র সমাজের দাবী আছে অধিকার আছে, সে দাবী সে অধিকার আমাদের উপেক্ষা করিলে চলিবে না; আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনা মত দেশকে উন্নত করিতে হইবে, জাতিকে জীবন্ত জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে, সমাজকে সতেজ সবল করিয়া গড়িতে হইবে। এই প্রকার ভাবের প্রেরণায়, এই প্রকার অস্থিরতার তাড়নায়, নানা জনে নানা দিকে বাহির হইয়া পড়িলেন।

যিনি বৈজ্ঞানিক, তিনি নানা দেশবিদেশ হইতে বিজ্ঞানের বার্ত্তা আহরণ করিয়া সরল ভাষাতে সেই সব সন্দেশ দেশবাসীকে

পরিবেশন করিতে লাগিলেন ; যিনি ঐতিহাসিক, তিনি পুরাণ-ইতিহাসের ভিতর দিয়া প্রত্নতত্ত্বের ভিতর দিয়া আমাদের দেশের বিচিত্র ইতিবৃত্তের ভাণ্ডারদ্বার খুলিয়া দিয়া দেশের প্রনষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করিয়া আমাদের জাতির আত্মপ্রত্যয়লাভের নূতন উৎস উন্মুক্ত করিলেন; যিনি সাহিত্যিক, তিনি নানা ভাষার নানা দেশের সাহিত্য-সম্ভার হইতে নানা রত্ন আহরণ করিয়া বঙ্গভাষা-ভাষীকে সেই রত্নমালা উপহার দিতে লাগিলেন ; যিনি কবি, তিনি দেশের প্রাচীন গৌরব-গাথা গাহিয়া দেশাত্মবোধ উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন ; যিনি ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারক, তিনি আমাদের প্রাচীন জরাজীর্ণ সমাজের যাহা কিছু দুর্ব্বলতা যাহা কিছু কুসংস্কার তাহা বর্জ্জন করিয়া, কতকটা পাশ্চাত্যের নূতন রঞ্জন-রশ্মিতে, কতকটা প্রাচ্যেরই বেদ-উপনিষদের অরুণালোকসম্পাতে তাহাকে নবরূপ নবজীবন দান করিবার প্রচেষ্টা করিতে লাগিলেন।

জাতির সমস্ত বিভাগেই যেন একটা নব-চেতনার সাড়া পড়িয়া গেল। ঘুমাইয়া থাকিবার সময় নাই, আলস্যে কাটাইবার সময় নাই, নষ্ট করিবার সময় নাই—অবিলম্বে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে, সমাজকে জাগাইতে হইবে,—জগতের উন্নতিশীল জাতিগণের সঙ্গে সঙ্গে সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে হইবে।

“আগে চল্ আগে চল্ ভাই,
প'ড়ে থাকা পিছে ম'রে থাকা মিছে,
বেঁচে ম'রে কিবা ফল ভাই ?”

—জাতির জীবনে ইহাই মূলমন্ত্র হইয়া উঠিল। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ ধর্ম্মপ্লাবন আনিলেন; বিদ্যাসাগর সমাজবিপ্লব আনিলেন, আবার সংস্কৃত-সাহিত্যসাগর মন্থন করিয়া বঙ্গভাষাকে নানা রত্নরাজিতে বিভূষিত করিলেন; অক্ষয়-কুমারও তৎপথানুবর্ত্তী হইয়া বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধ করিতে লাগিলেন; রাজেন্দ্রলাল "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" ও নানা সন্দর্ভে দেশের অতীত গৌরব-কাহিনী উদ্ঘাটিত করিতে লাগিলেন; রামদাস সেন তাঁহার সহকর্ম্মী হইলেন; কাব্য-সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত, মাইকেল, রঙ্গলাল, দীনবন্ধু, প্রভৃতি নানা দিক্ দিয়া নূতন জীবনের সঞ্চার করিলেন। বাঙ্গালার ইতিহাসে সে কি যুগই গিয়াছে!

বঙ্কিমচন্দ্রও সেই যুগেরই লোক; সুতরাং তাঁহার জীবন-নাট্যে সেই যুগের উদাত্ত সুরই নিয়ত ধ্বনিত হইয়াছে। লেখাপড়া শিখিয়া তিনি সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন; রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, নিপুণতার সহিত তাঁহার সরকারী কার্য্য পরিচালনা করিলেন, কার্য্যসমাপনান্তে সরকার কর্ত্তৃক নানাবিধ উপাধিতে মণ্ডিত হইলেন, নিতান্ত সংসারিক হিসাবেও লোকসমাজে যথেষ্ট সম্মান অর্জ্জন করিলেন—এ সবই ঠিক; কিন্তু তাঁহার জীবনের ইতিহাসে এই সবের স্থান কতটুকু! একটা বিষয় অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, সে সময়কার অনেক বিখ্যাত লোকই, বিশেষতঃ বহু সাহিত্যসেবীই, দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, এবং সেই গুরুতর কাজের ও দায়িত্বের ফাঁকে ফাঁকে যেটুকু স্বল্প অবসর মিলিত তাহাতেই তাঁহারা তাঁহাদের জীবনের

সাধনা সফল করিয়া গিয়াছেন। রঙ্গলাল, বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, রমেশচন্দ্র ম্যাজিষ্ট্রেট, দীনবন্ধু পোষ্টাল সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট, ভূদেব স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর, হেমচন্দ্র গভর্ণমেণ্ট প্লীডার, ইত্যাদি। শুধু অলস বিলাসে লালিত পালিত হইয়া সুমধুর কাব্যচর্চ্চায় সুপ্রচুর অবসর-বিনোদনের অবকাশ ইঁহাদের কাহারওই হয় নাই। কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। কোন একটা কিছু উপার্জ্জন-পন্থা অবলম্বন করিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিতে হইবে, তাই ইঁহাদিগের এই সমস্ত কাজ করা; কিন্তু এইটুকুতে ত তাঁহাদের চিত্তের পরি-তৃপ্তি ছিল না; তাঁহাদের মনে তখন অফুরন্ত আকাঙ্ক্ষা, অতৃপ্ত পিপাসা—দেশকে জাগাইতে হইবে, জাতিকে উন্নত করিতে হইবে: সুতরাং তাঁহাদের চিত্তবৃত্তির সমস্ত শক্তিই সেই সাধনায় তাঁহারা প্রয়োগ করিলেন, এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে যশস্বী হইয়া দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া জীবন সার্থক করিলেন।

কৈশোর বয়স হইতেই বঙ্কিমের সাহিত্যরচনার দিকে ঝোঁক ছিল: পনের ষোল বৎসর বয়সেই তিনি "ললিতা ও মানস" রচনা করিয়াছিলেন: কুড়ি বৎসরের সময়ে তাঁহার এক ইংরাজী উপন্যাস "*Rajmohan's Wife*" নামে প্রকাশিত হইতেছিল। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পরেই তিনি রীতিমত সাহিত্য চর্চ্চাতে মনোনিবেশ করিলেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসের দিকেই স্বভাবতঃ তাঁহার মন প্রথমে ঝুঁকিল; কারণ জাতীয় চেতনাকে জাগাইতে, জাতীয় গৌরব-বোধকে উদ্দীপিত করিতে, চিত্তাকর্ষক

ভাবে জাতির অতীত ইতিহাসকে মানসপটে ফুটাইয়া তুলিতে ঐতিহাসিক উপন্যাসের ন্যায় বোধ করি আর দ্বিতীয় অস্ত্র নাই ; জাতীয়তার পূজারী বঙ্কিমচন্দ্র তাই বাঙ্গালার ইতিহাসের নানান্ স্তর তন্নতন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন—জাতীয় গৌরবের কি কি অধ্যায় তিনি উদ্ঘাটিত করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে।

মাত্র যখন তাঁহার সাতাইশ বৎসর বয়স, তখন বঙ্কিমের "দুর্গেশনন্দিনী" প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমের এই প্রথম উপন্যাসেই বঙ্গীয় সমাজ চমৎকৃত হইল, সমগ্র জাতির মধ্যে যেন এক বিষম চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া গেল। রমেশচন্দ্র লিখিয়াছেন, "যখন 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হইল তখন যেন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সহসা একটি নূতন আলোকের বিকাশ হইল।" তারপর এক বৎসর দুই বৎসর অন্তর অন্তরই বঙ্কিমের এক একখানি প্রাণোন্মাদকর উপন্যাস বাহির হইতে লাগিল, আর বাঙ্গালার অতীত ইতিহাসের এক একখানি উজ্জ্বল পৃষ্ঠা লোকচক্ষের সমক্ষে প্রতিভাত হইতে লাগিল। "কপালকুণ্ডলা" বাহির হইল, "মৃণালিনী" বাহির হইল, কিছু দীর্ঘ অবকাশের পরে "চন্দ্রশেখর" বাহির হইল ; আরও পরিণত বয়সে "রাজসিংহ", "আনন্দমঠ", "দেবীচৌধুরাণী", "সীতারাম" প্রকাশিত হইল।

বাঙ্গালার রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে এই ঐতিহাসিক উপন্যাস-পরম্পরা এক অভিনব বিপ্লব আনয়ন করিল। বঙ্কিমের এই রচনাগুলি সাহিত্য হিসাবে উপন্যাস হিসাবেও অনবদ্য সন্দেহ নাই ; কিন্তু বাঙ্গালার জাতীয় ইতিহাসে শুধু সাহিত্যিক রচনা

হিসাবে, শুধু রূপদক্ষ শিল্পীর কারুকৌশলের নিদর্শনরূপে ইহাদের স্থান নহে, ইহাদের স্থান তাহার অনেক উর্দ্ধে, একটা পরাধীন পরাসক্ত মুমূর্ষু আত্ম-বিস্মৃত জাতির সঞ্জীবন-মন্ত্রের আধারভূত কুলকুণ্ডলিনী শক্তির উৎস হিসাবে ইহাদের স্থান। এই শক্তির একাগ্র সাধনার পুণ্যফলেই এই একনিষ্ঠ সাধক মাতৃপূজার চরম মন্ত্র লাভ করিয়া বিস্মিত চমকিত দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া উচ্চারণ করিলেন—"বন্দে মাতরম্"; আর সেই নবীন মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই সনাতনী মাতৃভূমিতে এক নব-জীবনের সঞ্চার হইল।

কিন্তু বঙ্কিমের প্রতিভা ছিল নব-নবোন্মেষশালিনী—শুধু এক দিকেই ইহা আবদ্ধ ছিল না। মনীষা ছিল তীক্ষ্ণ, চিত্ত ছিল পৌরুষপূর্ণ, মেরুদণ্ড ছিল দৃঢ়। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন বিভাগে, চিন্তারাজ্যের বিভিন্ন দিকে তাই স্বতঃই তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইত। পাশ্চাত্য জগতের নব নব ভাবধারা তিনি আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিতেন, আবার ভারতীয় চিন্তার ও ধর্ম্মতত্ত্বের গহনরাজ্যেও তিনি বিচরণ করিতে ভয় পাইতেন না; কিন্তু কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য, সমস্ত তত্ত্ব সমস্ত যুক্তিই তিনি তাঁহার নিজের চিত্তের, নিজের বিচার-বিবেচনার কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া লইতেন।

আধুনিকতার মোহ যে আজই কেবল আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে তাহা নহে; সেকালেও আধুনিকতা ছিল এবং তাহার মোহ কিছুমাত্র কম ছিল না; বিশেষতঃ পাশ্চাত্যের অগ্রগতি

তখন পর্য্যন্ত ছিল অপ্রতিহত, প্রাচ্যে তখনও নূতন জাগরণ বিশেষ দেখা দেয় নাই; সুতরাং পাশ্চাত্য আধুনিকতার মোহ তখন অতিমাত্রাতেই প্রবল। কিন্তু এই মোহগ্রস্ততার আবর্ত্তে বঙ্কিম কোন সময়েই তলাইয়া যান নাই, তাঁহার বলিষ্ঠ মস্তিষ্কের সমগ্র শক্তির সহিত সত্যাবধারণে সচেষ্ট হইয়াছেন। ইংরাজ মনীষী-দিগের সহিত সমানে সমানে লড়িয়াছেন, প্রতিবাদ করিয়াছেন, সমালোচনা করিয়াছেন; inferiority-complex তাঁহার ধাতে ছিল না; তাই তাঁহার তৎকালীন নানাবিষয়িণী আলোচনা আজও পাঠ করিলে যেন একটা শক্তির একটা পুলকের সঞ্চার হয়। আলোচনা-সমালোচনায় তর্ক-বিতর্কে বাদ-প্রতিবাদে বঙ্কিমের মধ্যে "তৃণাদপি সুনীচেন" গোছ বৈষ্ণব ভাব মোটেই দেখা যাইত না; এবিষয়ে তিনি ছিলেন একেবারে পুরাপুরি শাক্ত। বঙ্কিমের ভিতরে এই যে শক্তি, এবং শক্তি সম্বন্ধে তাঁহার নিজের সম্পূর্ণ সচেতনতা, ইহাই তৎকালীন সমাজে ও সাহিত্যে বঙ্কিমকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী আসনে উন্নীত করিয়াছিল, একচ্ছত্র সম্রাট্ বা ডিক্টেটর করিয়া তুলিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই যে বহুমুখী প্রতিভা, ইহা প্রথম প্রকটিত হইল "বঙ্গদর্শন"-এ। "বঙ্গদর্শন" পত্র যখন বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তাঁহার বয়স কত? চৌত্রিশ বৎসর মাত্র। ভাবিতে গেলে আশ্চর্য্য বোধ হয় যে এই বয়সেই বাঙ্গালী জাতি বঙ্কিম-চন্দ্রকে চন্তা ও ভাবের জগতে অন্যতম নেতা বলিয়া বরণ করিয়া

লইয়াছিল। প্রতিভার শক্তি বাস্তবিকই অদ্ভুত। এই "বঙ্গদর্শন" পত্র বঙ্কিমচন্দ্র মাত্র চারি বৎসর কাল সম্পাদন করিয়াছিলেন ; কিন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই এই পত্রিকা তাহার বিচিত্র প্রবন্ধ-সম্ভারে, তাহার সমালোচনার নিপুণতা ও অকুতোভয়তায়, তাহার সাহিত্যিক গৌরবে, বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ও যে ছাপ রাখিয়া গিয়াছিল,তাহা বোধ হয় অন্য কোন এবংবিধ সাময়িক পত্রিকার ভাগ্যে ঘটে নাই। মাসিক পত্রের রাজ্যে উহা যেন একটা যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। বঙ্কিম নিজে ত বহু প্রবন্ধ, উপন্যাস, সমালোচনাদি উহাতে লিখিতেনই ; আর তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব ছিল নূতন নূতন শক্তিধর লেখকদিগকে উৎসাহ দান করিয়া তাঁহাদের সাহিত্যিক প্রতিভা স্ফুরিত করিতে। কত নবীন লেখক বঙ্কিমের আহ্বানে "বঙ্গদর্শন"-এ লিখিয়া হাত পাকাইয়াছেন এবং উত্তরজীবনে যশস্বী সাহিত্যিক হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। আর শুধু "বঙ্গদর্শন"-এ লিখিবার জন্যই যে তিনি উৎসাহ দিতেন তাহা নহে ; শিক্ষিত শক্তিশালী লোক তাঁহার নিকটে গেলেই তিনি তাঁহাকে বাঙ্গালাতে লিখিতে বলিতেন—লোকশিক্ষার জন্য, দেশের জনসাধারণের উপকারের জন্য।

রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় নিজে গল্প করিয়াছেন—তিনি একদিন বঙ্কিমের সঙ্গে দেখা করিতে গেলে, বঙ্কিম তাঁহাকে অনুযোগ করিয়া বলেন,"আপনি কেন বাঙ্গালাতে লেখেন না?" রমেশবাবু বিনীতভাবে বলেন,"বাঙ্গালা ভাল করিয়া জানিই না;

আমার দ্বারা কি বাঙ্গালাতে ভাল কিছু লেখা সম্ভব?" বঙ্কিম তাহাতে বলিলেন, "বলেন কি? আপনি একজন উচ্চশিক্ষিত প্রতিভাবান্ যুবক; আপনি বাঙ্গালা লিখিতে পারিবেন না? আপনার মত লোক যে বাঙ্গালা লিখিবে তাহাই ত ভাল বাঙ্গালা হইয়া উঠিবে।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই উৎসাহবাণী ও প্রেরণার ফলেই রমেশচন্দ্রের বঙ্গসাহিত্যে প্রবেশ; আর উপযুক্ত গুরুর যে উপযুক্ত শিষ্য হইয়াছিল, তাহা রমেশচন্দ্রের শতবর্ষের উপন্যাস-চতুষ্টয় "বঙ্গবিজেতা", "মাধবীকঙ্কণ", "জীবন-প্রভাত" ও "জীবন-সন্ধ্যা"-তেই সুপ্রকাশ।

উদীয়মান লেখকদিগকে এই ভাবে বঙ্কিম উৎসাহ প্রদান করিতেন সত্য, কিন্তু অযথা পিঠ চাপড়াইতেন না। ইহার কারণ এই যে সমাজ-কল্যাণের প্রতি সাহিত্যিকের ও লেখকের গুরুতর দায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁহার চিত্ত সদাই সজাগ ছিল। যা তা লেখা এবং তাহাই তৎক্ষণাৎ ছাপাইতে দেওয়া—ইহা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। একটা গল্প বঙ্কিমের সম্বন্ধে শুনিয়াছি—সত্য কিনা জানি না, তবে সত্য হওয়া খুবই সম্ভব—Se ncn e` vero e` ben trovato—গল্পটি এই যে, একদা একটি যুবক সাহিত্য রচনা সম্বন্ধে বঙ্কিমের সহিত আলোচনা করিতে গিয়াছিলেন; তাঁহাকে নাকি বঙ্কিম বলিয়াছিলেন, "দেখ, কোন বিষয়ে কিছু লিখিতে আরম্ভ করিবার সময়ে একটু ভাবিয়া দেখিবে যে তোমার বাস্তবিকই সে বিষয়ে কিছু বলিবার আছে কিনা; যদি থাকে, তবে অতি সহজ সরাসরি ভাবে তাহা লিখিয়া

ফেলিবে, ভাষার চটক লাগাইবার প্রয়াস করিবে না। আর একটা মোটা উপদেশ তোমাকে দিই। লিখিবামাত্রই উহা প্রকাশ করিবার জন্য ব্যাকুল হইবে না—দেরাজের ভিতর লেখাটা এক বৎসর ফেলিয়া রাখিও—বৎসরান্তে দেরাজ খুলিয়া পুনরায় লেখাটি পড়িয়া যদি প্রকাশযোগ্য মনে কর, তবেই প্রকাশ করিও, নচেৎ নহে।" জানি না আজকালকার তরলবীর্য্য "তরুণ"-রোগাক্রান্ত সাহিত্যের আসরে প্রবীণ চিকিৎসকের এই স্তম্ভনের উপদেশ মনঃপূত হইবে কি না।

কিন্তু বঙ্কিমের এই উপদেশ বঙ্কিমেরই উপযুক্ত; কারণ লেখকের দায়িত্ব তিনি কখনও বিস্মৃত হন নাই। তাই সাহিত্যিক আগাছাকে তিনি আগাছাই মনে করিতেন, এবং সাহিত্যের উদ্যান হইতে সেই সমস্ত আগাছা উৎপাটন করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতেও তিনি কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ হইতেন না। শিং ভাঙ্গিয়া বাছুরের দলে প্রবেশ করিয়া হাততালি কুড়াইবার যে দুর্নিবার মোহ, তাহা কোন দিন বঙ্কিমের সবল চিত্তকে আচ্ছন্ন করে নাই। সুতরাং স্থানে অস্থানে অসাধারণ প্রতিভার আবিষ্কারপূর্ব্বক যত্র-তত্র প্রশংসাপত্র বিতরণের যে বিষম বাতিক বর্ত্তমান সাহিত্যরথীদিগের মধ্যে প্রায়শঃই দেখা যাইতেছে, সে বাতিক বঙ্কিমকে পাইয়া বসে নাই। এবং এই জনপ্রিয়তার মোহ ও বাহবার বাতিক হইতে বঙ্কিমচন্দ্র বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত ছিলেন বলিয়াই, তিনি ভালকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বলিতে পারিতেন এবং মন্দকেও অতি সুস্পষ্টভাবে মন্দ বলিয়াই

নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন। এই জন্যই বঙ্কিমের সমালোচনার এতটা প্রতাপ ছিল, প্রতিষ্ঠা ছিল; আজকালকার ন্যায়, "বঙ্গদর্শন"-এর যুগে সমালোচনা একটা বাজারিয়া ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের নানা বিভাগেই লেখনী চালনা করিতে লাগিলেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক উপন্যাস "বিষবৃক্ষ", "কৃষ্ণকান্তের উইল", "ইন্দিরা", প্রভৃতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন; "বঙ্গদর্শন"-পত্রে যুগপৎ সাহিত্য-সৃষ্টি ও সাহিত্য - সমালোচনা করিতে লাগিলেন; কত বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখিতে লাগিলেন—ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক; রস-রচনাই বা কত লিখিলেন, তাঁহার "ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গূল", তাঁহার "ফুটন্ত সুন্দরীকে পালিশ করা"-র ব্যবস্থা ইত্যাদি পাঠক-সমাজে হাস্যের তরঙ্গ তুলিল, আবার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার খোরাকও যোগাইল কিছু কম নহে; সর্ব্বোপরি, তাঁহার অপূর্ব্ব সৃষ্টি "কমলাকান্তের দপ্তর" দেশবাসীকে উপহার দিলেন।

সম্ভবতঃ, ঔপন্যাসিক ও কথা-শিল্পী হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের খ্যাতি সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে তাঁহার দানকে কিয়ৎপরিমাণে নিষ্প্রভ করিয়াছে, কিন্তু আমার ত মনে হয় প্রবন্ধকার হিসাবে বঙ্কিমের স্থান অতি উচ্চে। "বাঙ্গালীর বাহুবল", "ভারত-কলঙ্ক", "বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার", "বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা", "সাম্য", "বঙ্গদেশের কৃষক", প্রভৃতি প্রবন্ধ

রচনার সরসতায়, ভাবের গাম্ভীর্য্যে, যুক্তির স্বচ্ছতায় এবং ভাষার স্পষ্টতায় অপূর্ব্ব উপভোগ্য সামগ্রী; এবং সমস্ত লেখার ভিতরেই মাঝে মাঝে কৌতুক-রসের সমাবেশ তাঁহার এই সকল গম্ভীর রচনাকেও অতীব উপাদেয় করিয়া তুলে।

একটা কথা মাঝে মাঝে আজকাল কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তির মুখে শুনিতে পাই যে বঙ্কিমের রচনার মধ্যে নাকি হেঁয়ালী, এবং চিন্তাধারার মধ্যে নাকি বহুৎ গোঁজামিল আছে। এই কথাটা আমি সত্যই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। হেঁয়ালী ও গোঁজামিল থাকা সাহিত্যের দোষ কিংবা গুণ সে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে ভরসা করি না, কারণ আধুনিক মতে ধোঁয়াটে সাহিত্যই নাকি উঁচু-দরের সাহিত্য, এবং যে রচনা "বুঝ্‌বার জন্যে নয়, শুধু বাজ্‌বার জন্যে" তাহাই নাকি উচ্চাঙ্গের রচনা; কিন্তু সে যাহাই হউক না কেন, যদি কাহারও রচনা হেঁয়ালী গোঁজামিলের ত্রিসীমানার ধার দিয়াও না গিয়া থাকে তবে তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা—কারণ বঙ্কিমের রচনার প্রধান গুণই যুক্তির স্বচ্ছতা, ভাষার প্রাঞ্জলতা ও বক্তব্যের স্পষ্টতা, যাহাকে ইংরাজীতে বলে forthrightness; তাঁহার সুস্পষ্ট রচনাভঙ্গী তাঁহার বলিষ্ঠ চিত্তের পৌরুষেরই প্রতিচ্ছবি।

মতের পরিবর্ত্তন বঙ্কিমের হইয়াছিল। কাহারই বা না হয়? কিন্তু যখন যে মত তিনি পোষণ করিতেন, অনেক বিচারের পরই তিনি সে মতে উপনীত হইতেন, এবং সে মত সুযুক্তি-সহকারে সুদৃঢ়ভাবে ও সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ

করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। মনীষার এই প্রগাঢ়তা, প্রকাশের এই বলিষ্ঠতা, ভাষার এই প্রাঞ্জলতা থাকার দরুণই আজ অর্দ্ধ-শতাব্দীর অধিক পুরাতন হইলেও বঙ্কিমের রচনাগুলি পাঠকের চিত্তকে অভিভূত করিয়া ফেলে।

মতের পরিবর্ত্তনের কথা বলিতেছিলাম্। বঙ্কিমেরও পরিণত বয়সে নানা বিষয়ে মতের ক্রমিক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। বিশেষতঃ, সমাজ-ব্যবস্থা ও ধর্ম্মানুশীলন বিষয়ে ক্রমশঃ ভারতীয় ধারার দিকেই তিনি বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। কোন সময়েই যে তিনি বি-জাতীয় বা অতিমাত্রায় পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ছিলেন, তাহা নহে ; সে দুর্ভাগ্য হইতে তাঁহার গভীর দেশভক্তি ও আত্ম-মর্য্যাদাবোধই তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু তথাপি জীবন-মধ্যাহ্নে পাশ্চাত্যের ভাবধারা তাঁহার উপরে যতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, জীবনের সায়াহ্নে তাহার অনেকটাই বিলুপ্ত হইয়াছিল, এবং প্রাচ্য আদর্শ ও ভাবধারার প্রতি শ্রদ্ধা তুল্যানুপাতেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এক সময়ে তিনি তাঁহার বন্ধু আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের ন্যায় মিল-বেন্থামের হিত-বাদ (Utilitarianism), এবং তৎপরে ওগুস্ত কোঁত্ (Auguste Comte)-এর Positivism and Religion of Humanity দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু শেষ জীবনে তাঁহার চিত্তের উপর উক্ত মতবাদের প্রভাব ততটা ছিল না।

কিন্তু যাহাকে গোঁড়া হিন্দুধর্ম্ম বলা যায়, যে হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের একটা প্রকাশ শশধর-শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের আন্দোলনের

মধ্য দিয়া হইয়াছিল, তাহার সঙ্গেও বঙ্কিমের ঠিক মত-সামঞ্জস্য ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ জীবনের যে প্রধান কীর্ত্তি, তাঁহার "ধর্ম্মতত্ত্ব" "কৃষ্ণচরিত্র" ও "গীতা"-ব্যাখ্যা, তাহা ঠিক প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত ছিল না। অধিক বলিতে কি, "কৃষ্ণচরিত্র'-এ বঙ্কিম মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ মানবরূপে চিত্রিত করিবার যে প্রয়াস করিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্বের অপহ্নব হইয়াছে মনে করিয়া হিন্দুসমাজ যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। শুনিয়াছি, সুরসিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নাকি বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সকল উপন্যাসের মধ্যে সেরা উপন্যাস তাঁহার "কৃষ্ণচরিত্র"! বস্তুতঃ ধর্ম্ম ও সমাজ-ব্যবস্থাবিষয়ক এই সমস্ত বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ বয়সের রচনা হিন্দুধর্ম্মের ও সমাজ-তত্ত্বের একটা যুক্তিমূলক (rationalistic) ব্যাখ্যা এবং আকার দিবার প্রয়াস। এবং সে প্রয়াস ছিল একটা বিরাট্ প্রয়াস,—এই প্রয়াসে তিনি তাঁহার বিপুল ধীশক্তি এবং অসামান্য বিচার-নৈপুণ্য পরিপূর্ণ মাত্রায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহার তুলনা আছে কিনা সন্দেহ।

বঙ্কিমের অলোকসামান্য প্রতিভার এই সামান্য মাত্র একটু আলোচনা করা গেল। আজিকার এই সভায় খুব বেশী আলোচনার বোধ করি আবশ্যকতাও নাই। তাঁহার প্রতিভার অম্লান জ্যোতি স্বপ্রকাশ; ক্ষীণ বর্ত্তিকাহস্তে তাহা দেখাইতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। কত গুণী জ্ঞানী লোক বঙ্কিমের বহুমুখী প্রতিভার এক একটি মাত্র দিক্ অবলম্বনে কত আলোচনা

করিয়া গিয়াছেন—তবু আলোচনার শেষ পান নাই ; কারণ এই কাহিনী অফুরন্ত। আমাদের বঙ্গজননীর এই অমর সন্তানের অবদান-পরম্পরা এক অক্ষয় ভাণ্ডার। বাঙ্গালার বঙ্কিম যে মধুচক্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালার অপর এক অমর সন্তান মাইকেলের ভাষায়

"গৌড়জন তাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

বঙ্কিমের জন্ম সার্থক হউক ; বাঙ্গালার বরণীয় মনীষিগণের জন্ম সার্থক হউক ; আমাদিগের পূর্ব্বসূরিগণের জন্ম সার্থক হউক। তাঁহাদিগের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হউক, তাঁহাদিগের জীবনের সাধনা সফল হউক। তাঁহাদিগের আদর্শে, তাঁহাদিগের প্রেরণায়, তাঁহাদিগের পুণ্যে, এক নবীন বলিষ্ঠ জীবন্ত জাতি আমাদের এই সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা মাতৃ-ভূমিতে গড়িয়া উঠুক। বঙ্কিমচন্দ্রের অমর আত্মা তৃপ্ত হউক, আমাদের পিতৃপুরুষের তর্পণ সমাপিত হউক। গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা সমাপন হইয়া থাকে ; আজ বঙ্কিম-স্মৃতি পূজার এই পুণ্য-বাসরে বঙ্কিমেরই সাধনা-লব্ধ তর্পণ-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আমরা ধন্য হই—"বন্দে মাতরম্" !

ভাদ্র, ১৩৪৫।

বাঙ্গালায় লোকশিক্ষা

বাঙ্গালায় লোকশিক্ষা

[হাওড়া প্রাথমিক-শিক্ষক-সম্মিলনীতে সভাপতির অভিভাষণ]

আজ আপনাদের এই শিক্ষক-সম্মিলনীতে আপনারা যে আমাকে সভাপতির পদে বরণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে আমার ধন্যবাদ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আপনারা দেশে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের পুণ্য কার্য্যে ব্রতী, অথচ এবিষয়ে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে আমরা নিজের কোন অভিজ্ঞতাই নাই ; এমত অবস্থাতেও যে আপনারা আমাকে আপনাদিগের সহিত যোগদান করিতে আহ্বান করিয়াছেন, ইহা আমার প্রতি আপনাদের স্নেহেরই পরিচায়ক। ভরসা করি এই সম্মিলনীর কার্য্য পরিচালনা বিষয়েও আপনাদের সেই স্নেহে আমি বঞ্চিত হইব না।

তরুণিমা

প্রায় চব্বিশ বৎসর কাল ধরিয়া কলেজে উচ্চশিক্ষা দান-কার্য্যে আমি লিপ্ত আছি ; কিছুদিন হইল নানা সভাসমিতি উপলক্ষ্যে মাধ্যমিক-শিক্ষা-ব্রতী শিক্ষকগণের সহিতও কিঞ্চিৎ পরিচয় ঘটিবার অবসর আমার হইয়াছে ; কিন্তু আদত যাহাকে লোকশিক্ষা বা জনশিক্ষা বলা যায়, সেই প্রাথমিক শিক্ষায় ব্রতী শিক্ষকগণের সাহচর্য্য লাভের সৌভাগ্য এযাবৎ আমার হয় নাই। বিশেষতঃ এই জন্যও আমি আজ আপনাদের সান্নিধ্যে আসিবার সুযোগে নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান্ মনে করিতেছি।

বাস্তবিকই, যে কার্য্যে আপনারা লিপ্ত রহিয়াছেন, প্রাথমিক শিক্ষার যে ভার আপনাদের উপরে অর্পিত হইয়াছে, সেই কার্য্য অতীব মহৎ, সেই ভার অত্যন্ত গুরুতর ; কারণ এই প্রাথমিক শিক্ষাই একটা জাতিকে গড়িয়া তুলে। ইহার বনিয়াদ যদি পাকা হয়, তাহা হইলেই সেই ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত মাধ্যমিক শিক্ষা এবং উচ্চশিক্ষা সফল হয়, সার্থক হয় ; আর ইহার বনিয়াদ যদি কাঁচা হয়, তবে উপর দিকে শত চেষ্টা করিলেও দেশে সুরম্য সুদৃঢ় শিক্ষা-সৌধ নির্ম্মাণ করা সম্ভবপর হয় না। সুতরাং কি ভাবে, কোন্ দিকে, কি কি আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, লোকশিক্ষার প্রচার ও বিস্তার করিতে হইবে, সে বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা, আলোচনা ও সাবধানতা আবশ্যক ; কারণ এই ব্যাপারে ভুল পথে চলিলে শুধু যে অনর্থক সময় ও শক্তি-সামর্থ্যের অপচয় হয় তাহা নহে, শুধু যে "অর্থনাশং

মনস্তাপং" ভুগিতে হয় তাহা নহে, পরন্তু জাতির অপরিমেয় অনিষ্ট সংসাধিত হয়, উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করা হয়, জাতির ভবিষ্যৎ গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। তাই বলিতেছিলাম, লোকশিক্ষার প্রণালী ও আদর্শ সম্বন্ধে সাবধানে সতর্কভাবে আলোচনা আবশ্যক। এক্ষেত্রে সত্যসত্যই "অবিবেকঃ পরমাপদাং পদং"।

তাই আমি এবিষয়ে গোড়ার কথা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চাই। আমাদের দেশের, বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশের, একটা দুর্নাম আছে যে, ইহা অতি হুজুকপ্রিয় দেশ, ভাব-বাতিকগ্রস্ত দেশ। যখন যে কোন নূতন ভাবের বন্যা নামে, তাহাতেই আমরা তখন ভাসিয়া যাই ; যখন যে কোন নূতন মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তখনই আমরা তাহাতে অভিভূত হইয়া পড়ি। ফলে হয় এই যে, সেই ভাবের বন্যা সরিয়া গেলে, সেই মন্ত্র নিষ্ফল হইলে, আমরা পুনরায় অবসাদগ্রস্ত হইয়া নিজেদের ভাগ্যলিপিকে ধিক্কার দিতে থাকি। তাই শুধু মন্ত্র, শুধু বাগাড়ম্বর, শুধু catch-words, শুধু ভাবুকতা দ্বারা বিচলিত ও সঞ্চালিত না হইয়া আসল সমস্যাটির ভিতরে ধীরভাবে প্রবেশ করা আবশ্যক।

লোকশিক্ষা কাহাকে বলে ? প্রথমেই মনে রাখা উচিত যে শিক্ষা (বা education) এবং সাক্ষরতা (বা literacy) সমার্থক নহে। অক্ষর-পরিচয় না থাকিলেও শিক্ষিত হওয়া যায় ; আবার অক্ষর-পরিচয় থাকিলেই যে শিক্ষিত বলা যায়,

এমন নহে। জীবনে সমাজে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া নানা ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া মানুষ নানাভাবে জ্ঞান অর্জ্জন করে, শিক্ষা লাভ করে; পুস্তকস্থ বিদ্যা শিক্ষালাভের অন্যতর উপায় মাত্র। আমাদের দেশে, আর শুধু আমাদের দেশে কেন, সব দেশেই, বর্ত্তমান যুগের পূর্ব্বে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন বিশেষ ছিল না, সুতরাং মুদ্রিত পুস্তকের অভাব, অন্ততঃ দুর্লভতা ছিল। বই-খাতা-পত্র যোগাড় করা ব্যয়সাধ্য ও কষ্টসাধ্য ছিল, কাজেই অধিকাংশ শিক্ষাই মুখে মুখে দেওয়া হইত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বা পাঠশালাতে সামান্যই লেখাপড়া শিখান হইত; কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে কত কাহিনী, কত যাত্রা, কত কথকতা, কত পাঁচালী, কত রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণাদি-পাঠ প্রভৃতির ভিতর দিয়া শিশুদিগের কোমল মানসপটে ব্যক্তিগত জীবনের, পারিবারিক জীবনের, সামাজিক জীবনের, মহত্তম আদর্শগুলি দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইত; এবং এইরূপে সহজ সরল স্বাভাবিক ভাবে জাতীয় শিক্ষা গড়িয়া উঠিত। অথচ শুধু সাক্ষরতা বা literacy-র test ধরিলে হয়ত সেই প্রাচীন সমাজে শিক্ষিতের শতকরা হার কমই উঠিত।

কিন্তু আপনারা কি বলিতে চাহেন যে সে সমাজ আশিক্ষিত সমাজ ছিল? আমাদের মাতৃজাতি, আমাদের মা, মাসী, পিসী, ঠাকুরমা, ঠান্‌দিদিরা, যাঁহাদের ক্রোড়ে আমরা লালিত পালিত হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছি, যাঁহাদের মুখে মুখে রাম-লক্ষ্মণ কর্ণার্জ্জুনের বীরত্ব-কাহিনী, সীতা-সাবিত্রী বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের পুণ্য আখ্যানের

সরস কথা শুনিয়া শুনিয়া আমাদের মর্ম্মে গাঁথা হইয়া গিয়াছে, যাঁহারা দেশের বালকবালিকাদিগের জীবনপথে অমূল্য পাথেয় দান করিয়া গিয়াছেন,—সেই মাতৃ-জাতির অক্ষর-পরিচয় অতি সামান্যই ছিল, কিন্তু আপনারা কি সেই জন্য তাঁহাদিগকে অশিক্ষিত বলিয়া অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে চাহেন ? নিশ্চয়ই নহে। শিক্ষার পরিচয় যদি হয় ভদ্র-ব্যবহারে, শিক্ষার সার্থকতা যদি হয় চরিত্র-গঠনে, শিক্ষার পরিপূর্ণতা যদি হয় আদর্শ-জীবনে, তবে আমাদের প্রাচীন সমাজে যে লোকশিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তাহাতে অক্ষর-পরিচয় বিষয়ে কিঞ্চিৎ ত্রুটি থাকিলেও, সে শিক্ষা-পদ্ধতি সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছিল।

এ গেল একটা দিক্। আর একটা দিক্ হইতেছে এই যে, একবার একটু অক্ষর-পরিচয় করাইয়া দিলেই, একবার একটু লেখাপড়া শিখাইয়া দিলেই যে প্রাথমিক শিক্ষার কাজ ফুরাইয়া গেল, লোকে শিক্ষিত হইয়া উঠিল, তাহা নহে। শিশুর মধ্যে জানিবার জন্য শিখিবার জন্য প্রবৃত্তি ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, জিজ্ঞাসার উদ্রেক করিতে হইবে ; নচেৎ এই যে অক্ষর-পরিচয়ের উপর আজ এত অতিরিক্ত মাত্রায় ঝোঁক দেখিতেছি, এই অক্ষর-পরিচয়ও শিশুর মনে বেশী দিন টিঁকিয়া থাকিবে না ; অনভ্যাসে চর্চ্চার অভাবে দুদিন বাদেই শিশু আবার নিরক্ষরের কোঠায় গিয়া দাঁড়াইবে ; এবং কোন দিন যে সেই শিশু কিছুমাত্র লেখাপড়া শিখিয়াছিল তাহাও তাহার বয়সের কালে প্রতীত হইবে না। স্বল্প-শিক্ষিত শিশুর যে এই পুনর্নিরক্ষরতা

—যাহাকে বলে relapsing into illiteracy—প্রাথমিক শিক্ষাব্যাপারে ইহা একটা বিষম সমস্যা। তাই নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের Infant class-এর শিশু-সংখ্যাদ্বারা জনশিক্ষার পরিমাপ করার মত ভ্রান্ত প্রণালী আর কিছু হইতে পারে না। সুতরাং লোকশিক্ষা ব্যাপারে প্রথম বিবেচ্যই এই যে কি উপায়ে এই শিক্ষাটুকুকে স্থায়ী করা যায়, সুদৃঢ় করা যায়; কি রকমে শিক্ষার ছাপটি শিশুর মনে চিরতরে অঙ্কিত করিয়া দেওয়া যায়। এ সমস্যাটি বেশ গুরুতর।

আর বিদ্যানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর চরিত্র-গঠনে কি উপায়ে সাহায্য করা যায়, সেটি আর একটি গুরুতর সমস্যা। সকলেই আমাদের প্রচলিত প্রবাদটি জানেন, "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী।" সুতরাং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রদত্ত সেই অল্পবিদ্যা ক্রমশঃ অবিদ্যাতে পরিণত হইয়া একেবারে ভয়ঙ্করী হইয়া না দাঁড়ায়, এবিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার। এই ভয় একেবারে অমূলক নহে; পাশ্চাত্য বহু দেশে অল্পবিদ্যাজনিত এই দুর্নীতি ও উচ্ছৃঙ্খলতার সমস্যা খুবই উৎকটভাবে দেখা দিয়াছে। সুতরাং যদ্দ্বারা ব্যক্তির কল্যাণ সমাজের মঙ্গল সমস্তই বিধৃত থাকে, সেই নীতির বন্ধন ও সংযমের শাসন শিথিল করিয়া ব্যাহত করিয়া দেশে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার উন্মত্ত তাণ্ডব যাহাতে না দেখা দিতে পারে, তজ্জন্য পূর্ব্বাহ্নেই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। খ্যাতনামা ইংরাজ মনীষী রাস্কিনের সাবধান-বাণী,

"Even illiteracy is better than a literacy that turns literature to lust and arithmetic to cunning"—অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

লোকশিক্ষার আদর্শ বিষয়ে গোড়ার কথা লইয়া সামান্য একটু আলোচনা করা গেল। এখন একটু ব্যাবহারিক জগতে আসা যাউক। পূর্ব্ব-যুগের অবস্থা যাহাই হউক না কেন, বর্ত্তমান যুগে, বিশেষতঃ এই গণতন্ত্রের যুগে—অর্থাৎ যখন ভোট-রাজ প্রচলিত হইয়াছে—তখন অক্ষর-পরিচয়মূলক জনশিক্ষা বাস্তবিকই খুব দরকার হইয়া পড়িয়াছে। তাই এখনকার রাষ্ট্রনৈতিক নেতৃগণের মূলমন্ত্রই হইয়াছে, "We have to educate our masters now,"—অর্থাৎ জনসাধারণই যখন ভোটের জোরে প্রকৃতপক্ষে আজকাল দণ্ড-মুণ্ডের মালিক হইয়া উঠিতেছে, তখন সেই গণ-দেবতা যাহাতে শিক্ষার অভাবে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হইয়া অপ-দেবতাতে পরিণত না হইতে পারে, সেজন্য ত আপ্রাণ চেষ্টা করা আবশ্যক। তাই, মোটামুটিভাবে যাহাতে দেশের জনসাধারণ দেশের বিষয় জানিতে পারে বুঝিতে পারে, সভা-সমিতি ব্যবস্থা-পরিষদ্ প্রভৃতির কার্য্যকারিতা উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, অন্ততঃ খবরের কাগজগুলি পড়িয়া সংবাদাদি সংগ্রহ করিতে পারে, পুস্তিকাদি ও সরকার-কর্ত্তৃক প্রচারিত সহজ প্রবন্ধ ও ইস্তাহারাদি পড়িয়া নিজেদের কৃষিকার্য্যে শিল্পকার্য্যে উন্নতি-সাধন করিতে পারে, পল্লী-জীবনের দৈনন্দিন লোকব্যবহারে, জমিদার মহাজন উকীল মোক্তার প্রভৃতির সহিত

কারবারে, দেনা-পাওনা বিষয়কর্ম্মাদিতে নিজেদের হিসাবটুকু ঠিক রাখিতে পারে, স্বার্থটুকু বজায় রাখিতে পারে, প্রতারিত প্রবঞ্চিত উৎপীড়িত না হয়, অন্ততঃ এতটুকু পরিমাণ বিদ্যা-প্রচারের আবশ্যকতা আজ প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মতই হইয়াছে। সুতরাং এই উদ্দেশ্য কি প্রকারে সংসাধিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে এখন খুবই চিন্তার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রধানতঃ পল্লীশিক্ষা বলিলে অন্যায় হইবে না ; কারণ আমাদের জনসাধারণ সাধারণতঃ পল্লীবাসী। পৌরজন বা নাগরিকদের সংখ্যা খুবই কম—গোটা বাঙ্গালাদেশে কলিকাতা হাওড়া ও ঢাকা বাদ দিলে মফঃস্বলে আর যে সমস্ত সহর আছে তাহাও প্রায় সবই পল্লী-ভাবাপন্ন, এবং সেই সমস্ত সহরের লোক-সংখ্যা যোগ দিলেও সংখ্যা অতি সামান্যই হইবে। সুতরাং আমাদের দেশে লোক-শিক্ষা প্রধানতঃ পল্লী-শিক্ষা (বা rural education)। তাছাড়া, সহরে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান থাকিলেও তথায় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার দিকে ঝোঁক বেশী ; এবং সহরেও সমাজের যে স্তর হইতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র বেশী পরিমাণে আমদানী হয় অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণী এবং দরিদ্র শ্রমজীবী সম্প্রদায়, সেই স্তরের সমস্যাও প্রায় পল্লীজীবনের সমস্যারই অনুরূপ ; কারণ সমাজের উচ্চতর শ্রেণীর শিশুগণ প্রায়ই মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানের দিকেই গোড়া হইতে ঝুঁকিয়া থাকে, তাহারা কদাচিৎ সহরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয়। কাজেই পৌর-শিক্ষা (urban education)-

ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষার স্থান অনেকটা অপ্রধান। এই কারণেই বাঙ্গালার লোকশিক্ষা-বিষয়ে আলোচনা পল্লীজীবনের সমস্যা ও অবস্থা-সমাবেশের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করিলেই সঙ্গত ও সুফলপ্রদ হয়।

বঙ্গে পল্লীর অধিবাসিবৃন্দকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়; এক ভাগ তথাকথিক উচ্চশ্রেণী বা ভদ্রলোক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থাদি, যাহাদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চ্চা বহুকালাবধি চলিয়া আসিতেছে, এবং অপর ভাগ তথাকথিত নিম্নশ্রেণী, অর্থাৎ কামার, কুমার, তাঁতী, জোলা, তেলী, জেলে, নাপিত, ছুতার, চাষাভূষা প্রভৃতি, যাহারা হাতের কাজ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে লেখাপড়ার চর্চ্চা পূর্ব্বে বড় একটা প্রচলিত ছিল না, এখন আধুনিক সময়ে ক্রমশঃ প্রসারিত হইতেছে। উচ্চশ্রেণীর শিশুগণ প্রায়ই শুধু প্রাথমিক শিক্ষাতে সন্তুষ্ট থাকে না, মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষার দিকে ঝুঁকিয়া চাকুরী, ওকালতী, ডাক্তারী প্রভৃতি "ভদ্রলোকী" পেশায় নিযুক্ত হইবার চেষ্টা করে। সুতরং বাঙ্গালার প্রাথমিক শিক্ষা প্রধানতঃ পল্লীস্থ নিম্নশ্রেণীর শিশুগণের প্রয়োজনানুসারেই পরিকল্পিত হওয়া উচিত; অর্থাৎ যাহারা খুব সম্ভবতঃ উচ্চতর শিক্ষার দিকে যাইবে না, তাহারা এই প্রাথমিক শিক্ষা পাইয়াই যাহাতে মোটামুটি শিক্ষিত ও কর্ম্মপটু হইয়া উঠিতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।

এই দিকে দৃষ্টি রাখিলে প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা অনেকটা সহজ হইয়া উঠে। সহজেই বুঝা যায় যে, শিশুগণ পল্লীতে তাহাদের নিজেদের ঘরে বসিয়া যে সব বিষয় সহজে এবং অনায়াসে বুঝিতে পারে, শিখিতে পারে, বিদ্যালয়ে সে সব বিষয়ের চর্চ্চাতে সময় ও অর্থ ব্যয় করা অনাবশ্যক। আজকাল Vocational Education বা শিল্পমূলক শিক্ষার খুব একটা রব উঠিয়াছে; এদিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে পল্লীর প্রাথমিক শিক্ষালয়গুলিতে তাহার আবশ্যকতা খুবই সামান্য, এমন কি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কামারের ছেলে বাড়ীতেই হাতুড়ি পিটিতে শিখে, কুমারের ছেলে বাড়ীতেই চাক ঘুরাইতে শিখে, তাঁতী-জোলার ছেলে বাড়ীতেই চরকা তাঁত চালাইতে শিখে, তজ্জন্য ইস্কুলে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নষ্ট করা তাহাদের পক্ষে মোটেই আবশ্যক নহে। ইস্কুলে বসিয়া তাহাদের আবশ্যক সেই সব বিষয় শিক্ষা করা, যে সব বিষয় বাড়ীতে শিখাইবার কেহই নাই, অর্থাৎ প্রধানতঃ যাহাকে "লেখাপড়া" বলা হয়, অর্থাৎ কিছু ভাষা, কিছু অঙ্ক, কিছু ইতিহাস-ভূগোল, ইত্যাদি। উন্নতভাবে বিশেষ-শিল্প শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা আছে সত্য, কিন্তু সেজন্য বিশেষ-শিক্ষালয় (specialized institution) স্থাপন করিতে হইবে, সাধারণের জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষার বিদ্যালয়গুলি তাহার উপযুক্ত ক্ষেত্র নহে।

তারপর "লেখাপড়া" যেটুকু শিক্ষা দিতে হইবে, সে সম্বন্ধেও বক্তব্য এই যে পল্লীজীবনে সুষ্ঠুভাবে জীবন-যাপনের জন্য ও

মোটামুটি দেশ-বিদেশ সম্বন্ধে সজাগ হইবার জন্য যেটুকু বিদ্যা আবশ্যক, প্রাথমিক স্তরে সেইটুকু শিক্ষা দেওয়াই সমীচীন, এবং সেইটুকুই এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া, যে শিক্ষার্থী উত্তর-জীবনে তাহা একেবারে ভুলিয়া না যায়—ইহাও খুব কম কাজ বা সামান্য ব্যাপার নহে। নিতান্ত অনাবশ্যক বিদ্যার বোঝা আমাদের নিরীহ পল্লীবাসীর দুর্ব্বল স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে, জীবে দয়ার পরিচায়ক ত নহেই। সেই দিক্ দিয়া মনে হয় যে বর্ত্তমানে নিম্ন ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে যে সমস্ত পাঠ্য-তালিকা আছে, তাহা মোটামুটি ভাবে যথেষ্টই; সামান্য কিছু অদল-বদল করিলেই বোধ করি উহাকেই পল্লীজীবনের পক্ষে উপযোগী করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে দুই একটি কথা আমার মনে হয়। পাঠ্য-বিষয়গুলি এমন ভাবে নির্ব্বাচন করা উচিত যে পল্লীজীবনে সেগুলি একেবারে foreign বা অপরিচিত না হয়, গ্রামের বাস্তব আবেষ্টনীর ভিতরে যাহাতে তাহার অনুরূপ বিষয় থাকে। এসম্বন্ধে সামান্য কিছু আলোচনা করা যাউক।

ধারাপাত-শুভঙ্করীর মধ্য দিয়া অঙ্ক শিখান আধুনিক প্রণালী অপেক্ষা বেশী উপযোগী মনে হয়। বিঘাকালি, কাঠাকালি, নৌকাকালি ও পুকুরকালি, সুদকষা, মাসমাহিনা, বৎসরমাহিনা প্রভৃতির আর্য্যা এত সহজে গ্রাম্য-জীবনের গণিত-সমস্যাগুলির সমাধান করে যে ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়—আধুনিক প্রণালীতে করিতে গেলে বহু সময় ব্যয় করিয়া অনেক কাঠখড়

পোড়াইতে হয়, অনেক ভগ্নাংশ, দশমিক, ত্রৈরাশিক, বহুরাশিক প্রভৃতির অবতারণা করিতে হয়।

কৃষিপ্রধান গ্রামে সহজেই উদ্ভিদ্-তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া যায়, নানাপ্রকার শস্যের সঙ্গে বৃক্ষাদির সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেওয়া যায়, পশুপক্ষীর সহিত সাধারণ পরিচয়ও অতি চিত্তাকর্ষক ভাবে করান যায়—পাঠ্যবিষয়ের বিভীষিকা দূর হইয়া তৎস্থলে স্বতঃই সরসতা আসিয়া পড়ে।

গ্রামে প্রচলিত ছড়া, প্রবাদ, কাহিনী, পুরাতত্ত্ব, পূজাপার্ব্বণ, রীতিনীতি,মেলা-উৎসবাদির আলোচনা ও তথ্যসংগ্রহে মনোযোগ দিলে শিক্ষার সঙ্গে কত আনন্দ লাভ হয়, এবং দেশের ইতিবৃত্ত-সংগ্রহের দিক্ দিয়াও কত উপকার হয়।

প্রজা-জমিদার খাতক-মহাজন সম্পর্ক ও ইহাদের মধ্যে আদান-প্রদান ত পল্লীজীবনের প্রাণ বলিলেই হয়; এই সব বিষয়-সম্পর্কীয় বিদ্যা, মহাজনী হিসাব, খত তমঃস্থক দাখিলা পাট্টা কবুলিয়ত দলিল দস্তাবেজ প্রভৃতি বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান শিক্ষার্থীকে দিতে পারিলে তাহার খুবই উপকারে লাগে।

ইংরাজীও কিছু শিখান ভাল মনে হয়, কারণ দেশের রাষ্ট্রভাষা ইংরাজী; চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম, ষ্টেশন, রাস্তার নির্দ্দেশ, প্রভৃতি পড়িতেও ইংরাজী জানা দরকার হয়, এবং পরে উচ্চতর শিক্ষার দিকে গেলে ত দরকার হয়ই। সুতরাং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কিয়ৎপরিমাণে ইংরাজী শিখাইলে পল্লীবাসীর উপকারই হয়।

বাঙ্গালায় লোকশিক্ষা

ইতিহাস সম্বন্ধে আমার মনে হয় যে বাঙ্গালীর ছেলেমেয়েদের বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে যাহাতে একটু সুস্পষ্ট জ্ঞান জন্মে সে বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত। একথা আমার মনে হইল এই জন্য যে, যেটুকু ইতিহাস পড়ান হয় প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে, তাহার সবটুকুই ভারতবর্ষের ইতিহাস। গোটা ভারতবর্ষের ইতিহাসের কাঠামটুকু জানা ভালই, কারণ সমস্ত ভারতবর্ষই একটা রাষ্ট্র। কিন্তু বাঙ্গালীর নিকট বাঙ্গালা দেশের একটা বিশেষ দাবী আছে, একটা আকর্ষণ ত আছেই। সুদূর পাটলীপুত্র বা দিল্লী হইতে দূরবীণ লাগাইয়া ভারতের ইতিহাসে বাঙ্গালার যে চিত্র মাঝে মাঝে দেখা যায়, তাহাই বাঙ্গালার প্রকৃত চিত্র নহে, পরিপূর্ণ চিত্র ত নহেই। বস্তুতঃ বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের বঙ্গেতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞতা ভয়াবহ। বাঙ্গালার সুদীর্ঘ বিচিত্র ইতিবৃত্তের অন্ধ-তমিস্রার মধ্য হইতে দুই একটা মহনীয় নামের জ্যোতি—আদিশূর, কি বল্লাল সেন, কি হুসেন শাহ, কি শ্রীচৈতন্য—আমাদের শিশুগণের মানস-নয়নে প্রতিফলিত হয় বটে; কিন্তু ইহাদের পৌর্ব্বাপর্য্য ও সন্নিবেশ সম্বন্ধে অজ্ঞানতা একান্তই নিবিড়। বাঙ্গালার সভ্যতার বৈশিষ্ট্য, বাঙ্গালার ইতিহাসের বৈচিত্র্য ও ঘটনা-পরম্পরা সম্বন্ধে, শুধু শিশুগণের বলি কেন, বাঙ্গালী যুবকগণেরও সুস্পষ্ট জ্ঞান অতি সামান্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ভূগোল সম্বন্ধেও সেই কথাই প্রযোজ্য। বাঙ্গালার ভৌগোলিক সংস্থান সম্বন্ধে বাঙ্গালীর ছেলেমেয়েদের একটু

পরিষ্কার জ্ঞান থাকা উচিত। নদীর কথাই ধরুন। যদি নদীমাতৃক দেশ কোথাও থাকিয়া থাকে তবে তাহা এই বাঙ্গালা দেশ—নদীর কল্যাণেই বঙ্গমাতা সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা—অথচ বাঙ্গালার ভাগীরথী-পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র-সমাশ্রিত যে নদী-সংস্থান তৎসম্বন্ধে কয়জন শিক্ষিত বাঙ্গালীর সুস্পষ্ট ধারণা আছে বলিতে পারি না।

এই বিষয়ে আর বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের দেশের শিক্ষা, বিশেষতঃ প্রাথমিক শিক্ষা, দেশের বাস্তব-জীবনের সহিত, পল্লীর প্রয়োজনের সহিত, বর্ত্তমান অবস্থার সহিত, সুসঙ্গত ও সুসমঞ্জস হওয়া আবশ্যক; এবং যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে এবং অল্প ব্যয়ে ইহার প্রচার ও প্রসারও তুল্যরূপে আবশ্যক।

এই সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী পরিকল্পিত একটি প্রাথমিক শিক্ষা-পদ্ধতি—যাহা ওয়ার্দ্ধা শিক্ষাপদ্ধতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে—তদ্বিষয়ে দুই একটা বলা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় অসামান্য প্রভাবসম্পন্ন ও আদর্শনিষ্ঠ ব্যক্তি পরিকল্পনা করিয়াছেন বলিয়াই এই পদ্ধতিটি সম্বন্ধে বর্ত্তমানে বহু আলোচনা হইতেছে।

এই শিক্ষাপদ্ধতিটির প্রধান বিশেষত্ব এই যে কোন একটি শিল্পকে কেন্দ্রস্বরূপ (basic craft) ধরিয়া লইয়া সমস্ত শিক্ষাই তাহার মধ্য দিয়া দিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ, সেই শিল্পজাত দ্রব্য-সামগ্রী বিক্রয় করিয়া তল্লব্ধ অর্থদ্বারা শিক্ষার ব্যয় বহুল-পরিমাণে নির্ব্বাহিত হইবে; আর তৃতীয়তঃ, সঙ্গে সঙ্গে ফল হইবে

এই যে শিল্পেতে শিক্ষিত হইবার দরুণ ছাত্রগণ উত্তর-জীবনে উপার্জ্জন করিয়া খাইতে পারিবে। কিন্তু আমার মনে হয় এই তিনটি আশার কোনটিরই সফল হইবার সম্ভাবনা নাই।

উত্তর-জীবনে অর্থোপার্জ্জনের কথাই প্রথমে ধরা যাউক। বিদেশের ও স্বদেশের যন্ত্র-শিল্পের প্রতিযোগিতার দরুণ, দেশে যে সমস্ত কামার কুমার তাঁতী শিল্পী রহিয়াছে তাহারাই খাইতে পায় না, ইহার উপর আবার এই সব ওয়ার্দ্ধা-শিক্ষিত হাজার হাজার বালক বা যুবক যদি আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে ত একেবারে "গণ্ডস্যোপরি পিণ্ডঃ সংবৃত্তঃ" হইয়া দাঁড়াইবে। খাটিয়া আর কাহারও খাইতে হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ, ছাত্রদিগের স্বহস্তের শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে, সুতরাং সরকার হইতে বিশেষ কোন সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না, ইহা ত একেবারে অকেজো কথা। ছাত্রদিগের কাঁচা হাতের তৈয়ারী দ্রব্য বাজারে অমনি হু-হু করিয়া কাটিয়া যাইবে, ইহা কেহ কল্পনা করিতে পারে? লাভের মধ্যে হইবে এই যে শিক্ষকদিগের নজরই থাকিবে যাহাতে নধর-কচি দুগ্ধপোষ্য ছেলেগুলি অবিশ্রাম খাটিয়া পয়সা রোজগার করিয়া তাহাদের বেতনের যোগাড় করিতে পারে। এতদপেক্ষা ভয়াবহ অবস্থার কল্পনা করা দুঃসাধ্য। তাহাড়া, যদি এই প্রকার ব্যবস্থা সম্ভবও হইত, তাহা হইলেই বা আমরা সরকারকে রেহাই দিব কেন? জনশিক্ষার প্রচলন করা ত সভ্যজগতে সরকারের অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য

বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, এবং সে কর্ত্তব্য হইতে তাহাকে রেহাই দিতে আমরা প্রস্তুত নহি।

তৃতীয়তঃ, কোন একটি শিল্পের মধ্য দিয়া সমস্ত বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া অতি কৃত্রিম প্রণালী—ইহাতে কখনও স্বাভাবিক ভাবে শিক্ষা হয় না। একটা উদাহরণই ধরুন। ওয়ার্দ্ধা-পরিকল্পনায় চরকায় সূতা কাটাকেই কেন্দ্রীয় শিল্পে পরিণত করিতে বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইতেছে। ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে; কারণ সকলেই জানেন যে মহাত্মাজী চরকা-পাগল। যাক্, মোটামুটি চরকা-মূলক শিক্ষার রকমটা এই। ধরুন, চরকায় সূতাকাটার মধ্য দিয়া ভূগোল শিক্ষা দিতে হইবে—কি প্রকারে? তূলা কোথায় জন্মে? পঞ্জাবে, মিশরে, আমেরিকাতে। বস্ত্র কোথায় প্রস্তুত হয়? বোম্বাইতে, বাঙ্গালাতে, ইংলণ্ডে। অতএব এই সব দেশের বিষয় কিছু জানা উচিত—হইল ভূগোল শিক্ষা। তারপর ইতিহাস। বস্ত্রশিল্প কতদিনের? কোন্ কোন্ জাতি ইহাকে উন্নত করিয়াছে? সে সব জাতির ইতিহাস একটু জানা গেল। তারপর চরকা যন্ত্রটির ঘূর্ণনের তত্ত্ব কি? বলবিজ্ঞান (Mechanics) শিক্ষা হইল। আট ঘণ্টা চরকা ঘুরাইয়া যদি দুই আনার সূতা প্রস্তুত হয়, তবে একমাসে একটি বালক কত আয় করিতে পারিবে? ত্রৈরাশিক শিক্ষা হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে গোটা গণিত-শাস্ত্রই আয়ত্ত হইল। কোন্ গাছের কাঠে ভাল চরকা হয়? ইহা জানিবার চেষ্টায় উদ্ভিদ্-তত্ত্ব শিক্ষা হইল। ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ সূত্র-চক্রের

উর্ণনাভ-জালে গোটা জাগতিক ব্যাপারই ধরা পড়িয়া গেল। যাহাকে ইংরাজীতে বলে, The microcosm reflects the macrocosm—একেবারে তাহাই। শিক্ষা-ব্যাপারে এইরূপ *reductio ad absurdum* যে কিরূপে কল্পিত হইল তাহাই ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়।

তারপর, এতৎসম্বন্ধে ডাঃ জাকির হোসেন প্রমুখ কয়েক ব্যক্তির স্বাক্ষরিত যে একটি বিবৃতি বাহির হইয়াছে তাহাতে এবম্প্রকারে শিক্ষণীয় বিষয়ের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ত একেবারে আক্কেল গুড়ুম! সংক্ষেপে তালিকাটি এই: মাতৃভাষা এবং হিন্দী (ইংরাজী নহে); ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রতত্ত্ব (Civics and Politics), ধর্ম্মতত্ত্ব (Study of Religions), সমাজতত্ত্ব, দেশবিদেশের গল্প ও কাহিনী; প্রকৃতি-পরিচয়, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, শারীরতত্ত্ব, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ, অঙ্কন, গীত-বাদ্য। এত সব বিবিধ বিষয় চৌদ্দবৎসর বয়সের মধ্যেই শিশুকে শিখাইতে হইবে; এবং এই সব যে বিদ্যালয়ে পঠিত হইবে, তাহার ক্লাসের সময়-নির্দ্দেশ (বা routine) হইয়াছে এইরূপ: মোট ৫½ ঘণ্টা ক্লাস বসিবে, তন্মধ্যে ৩ ঘণ্টা ২০ মিনিটই চরকা কাটা হইবে, ছুটি থাকিবে ১০ মিনিট, বাকী যে ২ ঘণ্টা, তন্মধ্যে গীত-বাদ্য, অঙ্কন ও গণিতে মোট ৪০ মিনিট, ভাষা-শিক্ষায় ৪০ মিনিট, সমাজ-বিজ্ঞান (ইতিহাস প্রভৃতি) ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানে মোট ৩০ মিনিট, আর বাকী ১০ মিনিট ব্যায়ামে।

অর্থাৎ শাদা কথায় বলিতে গেলে, ইস্কুলগুলি হইবে চরকা-ইস্কুল, এবং সেই চরকারই ফাঁকে ফাঁকে বিশ্বের যাবতীয় বিদ্যা সুযোগমত নিরীহ শিশুগণের কোমল মস্তিষ্কে ঢুকাইয়া দিতে হইবে। ইত্থম্ভূত যে শিক্ষা তাহাই প্রাথমিক শিক্ষা বলিয়া পরিচিত হইবে, এবং তাহাই নাকি বাধ্যতা-মূলক করা হইবে—অবস্থা কিছু গুরুতরই বোধ হইতেছে। ছেলেবেলায় ছড়ায় পড়িয়াছিলাম,

"এক পো দুধ কিনেছি, কি হবে তা বল না ?
ক্ষীর হবে, সর হবে, ছানা হবে, মাখন হবে—
ও বৌমা, আর কি হবে বল না ?"

আমাদের এই অতি-বিজ্ঞাপিত ওয়ার্দ্ধা-শিক্ষার পরিকল্পনা যে ইহাকেও ছাড়াইয়া গেল !

এতদুপরি আবার এই মাত্র সেদিন মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন যে পাটীগণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রভৃতি অহিংসভাবে পড়াইতে হইবে—"Our arithmetic, our science, our history will have a non-violent approach, and the problems in these subjects will be coloured by non-violence" ! কবিবর রবীন্দ্রনাথ একদা বলিয়াছিলেন, আমাদের বিদ্যালয়-সমূহে আজকাল বেতের চাষ উঠিয়া গিয়াছে, তৎস্থলে ইক্ষুর আবাদ করিতে হইবে। সে কবি-কথা তবু বুঝা যায় ; কিন্তু অহিংস পাটীগণিত কি প্রকার, তাহা বহু পাটীগণিত-পুস্তকের প্রণেতা হওয়া সত্ত্বেও কিছুতেই আমি মালুম করিতে পারিতেছি না।

তারপর হিন্দী। বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে কস্মিন্-কালেও হিন্দী জানার আবশ্যকতা না থাকা সত্ত্বেও, প্রতিটি ছাত্রকে হিন্দী শিখিতে বাধ্য করা হইবে ; অথচ যে ইংরাজী সর্ব্বদাই দরকার হয়, তাহার ত্রিসীমানায়ও কেহ যাইতে পারিবে না চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত।

সত্য কথা বলিতে, এরকম অকেজো এবং আজগুবি প্রস্তাব কেহ যে গম্ভীরভাবে দেশের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে পারে, এবং সেই প্রস্তাব আবার কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা চলিতে পারে, ইহাই ধারণার অতীত। মহাত্মা গান্ধী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি এবংবিধ প্রস্তাব উত্থাপন করিলে লোকে হাসিয়াই উড়াইয়া দিত।

আমার মনে হয় কি জানেন ? মহাত্মাজীর চির-পরিচিত যে কয়েকটি স্বরাজের অব্যর্থ দাওয়াই আছে, চরকা, হিন্দী ও অহিংসা—সেই ত্রিফলার রসায়নটি দেশের বাত-পিত্ত-কফের প্রশমনের নিমিত্ত তিনি এই ওয়ার্দ্ধাতে প্রস্তুত শিক্ষা-বটিকারূপে ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহার অতিরিক্ত ইহা আর কিছুই নহে। তবে আমাদের বাঙ্গালী বুদ্ধিতে এই অবধৌতিক মুষ্টিযোগটি একেবারে ত্র্যহস্পর্শযোগ বলিয়াই প্রতীত হইতেছে।

লোকশিক্ষার আদর্শ ও পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা গেল। কিন্তু সে যাহাই হউক, শিক্ষার আদর্শ, শিক্ষার পদ্ধতি, শিক্ষণীয় বিষয়াদি সম্বন্ধে যে মতই অবলম্বিত হউক না কেন—এবং এবিষয়ে নানান্ মুনির নানান্ মত হওয়া মোটেই

বিচিত্র নহে—কিন্তু একটা বিষয়ে আশা করি সকলেই একমত হইবেন যে শিক্ষা যাঁহারা দান করিবেন, শিক্ষাব্রত যাঁহারা গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা যাহাতে জীবনধারণ করিতে পারেন—আমাদের প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক্ সাহেবের ভাষায়, অন্ততঃ "ডাল-ভাত"-এর সংস্থান যাহাতে তাঁহাদের হয়—তাহার ত একটা ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। নচেৎ কোন আদর্শ, কোন প্রণালী, কোন পদ্ধতিই টিঁকিবে না। এই বিষয়ে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক—তা যতই কেন না অপ্রিয় হউক।

বাঙ্গালাতে প্রাথমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থা ও শিক্ষকদিগের দুর্ভোগ সম্বন্ধে আমি নিজে কোন কথা না বলিয়া বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের সরকারী বিবরণ হইতেই সামান্য কিছু উদ্ধৃত করিতে চাই।

"বাঙ্গালার ছাত্রদত্ত বেতন হইতেই প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ের অধিকাংশ নির্ব্বাহিত হয়। অনেক দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক; কিন্তু বাঙ্গালায় প্রত্যেক ছাত্র গড়ে বেতন হিসাবে প্রায় ১৷৷০ টাকা দেয়; এবং অভিভাবকেরা যত টাকা দেন, সরকার তত টাকা দেন না। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গালার অবস্থা শোচনীয়। বাঙ্গালায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় অন্যান্য সকল প্রদেশের ব্যয় অপেক্ষা শতকরা অল্প। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য জিলাবোর্ড প্রভৃতির ব্যয়ও অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অল্প, বাঙ্গালার লোক প্রতি ব্যয় সর্ব্বাপেক্ষা অল্প, কেবল বাঙ্গালার ছাত্রদত্ত বেতনের হার অন্য সকল প্রদেশ অপেক্ষা

অধিক। উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে বুঝা যায়, বাঙ্গালার অবস্থা শোচনীয়। অত্যন্ত হীন আদর্শের বিদ্যালয়, শিক্ষকগণের বেতনের অল্পতা, উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকদিগের অভাব, উপযুক্তরূপে বিদ্যালয় পরিচালনের ত্রুটি ও পরিদর্শন-ব্যবস্থার অভাব—এইসকলই বাঙ্গালার প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যা।"

এই বর্ণনার উপর আর টীকা নিষ্প্রয়োজন। ঐ বিবরণের অন্যত্র লিখিত আছে যে, জিলাবোর্ড প্রভৃতি দ্বারা সাক্ষাৎ ভাবে পরিচালিত বিদ্যালয়ে শিক্ষকের গড়ে মাসিক বেতন টা. ১৫৵০ ; ও অন্যান্য বিদ্যালয়ে গড়ে টা. ৬।০ মাত্র, অর্থাৎ গৃহস্থের বাড়ীতে ভৃত্যের বেতনের অপেক্ষাও ন্যূন। এই ভয়াবহ অবস্থার নিরাকরণ যদি না করা যায়, তবে বড় বড় উদ্দেশ্য আদর্শ ও পরিকল্পনার জল্পনা করা নিছক্ পণ্ডশ্রম মাত্র।

নীরস statistics দিয়া আমি আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে চাহি না, কিন্তু ভারতবর্ষেরই কয়েকটি প্রদেশের সঙ্গে বাঙ্গালাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যয়ের পরিমাণ একটু তুলনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, জনসংখ্যা বঙ্গদেশে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইলেও প্রাথমিক শিক্ষাতে ব্যয় বঙ্গদেশেই সর্ব্বাপেক্ষা কম—শুধু কম বলিলে ঠিক বলা হয় না, আত্যন্তিকরূপে কম। মান্দ্রাজে যেখানে বৎসরে প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয় হয়, বাঙ্গালায় হয় সেখানে মোটে ত্রিশ লক্ষ টাকা ; এবং এই ত্রিশ লক্ষেরও প্রায় অধিকাংশই Inspecting staff-এর বেতনাদি ও যানবাহনের ব্যবস্থাতেই ব্যয়িত হয়।

সুতরাং সুদূর পল্লীগ্রামে যে শিক্ষক মহাশয় কোনক্রমে কয়েকটি অপোগণ্ড শিশু যোগাড় করিয়া কথঞ্চিৎ কায়ক্লেশে একটি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় চালাইতেছেন, তিনি কার্য্যতঃ সরকার হইতে কিছুই পান না বলিলেই হয়—কোন মতে ছেলেদের অভিভাবকদের খোসামুদী করিয়া দিনান্তের অন্ন কয়টি যোগাড় করিবার প্রয়াস পান। জিলা-বোর্ডের যে সাহায্য, তাহার পরিমাণ গড়ে মাসিক ৩৲ টাকার অধিক নহে; তাহাও রীতিমত পাওয়া যায় না, অনেক চেষ্টা তদ্বিরের পর আদায় হয়।

তারপর গুরু-ট্রেণিং শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকদিগের কথা। তাঁহারা যখন ট্রেণিং পান তখন মাসিক ১০৲ টাকা ব্যয় করিয়া বৃত্তি পান; কিন্তু যখন ট্রেণিং পাস করিয়া শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হন, তখন তাঁহাদের ভাতার বরাদ্দ মাসিক ৬৲ টাকা মাত্র। এবং এখন ট্রেণিং-পাস শিক্ষকদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এই যে সেই ৬৲ টাকারও কোন নিশ্চয়তা নাই; কেহ আজ পাইলেন ত কাল পাইলেন না, এখানে পাইলেন ত ওখানে পাইলেন না।

এইরকম বায়ুভূত নিরাশ্রয় অবস্থায় বাস করিয়া, এইরূপ অনিশ্চিত অসহায় ভাবে দিন গুজরান করিয়া কেহ কি কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পারে? অথচ ইহাদিগেরই হস্তে জাতির ভবিষ্যতের আশাভরসা-স্থল শিশুগণের সমগ্র প্রাথমিক শিক্ষার ভার ন্যস্ত। এই দুর্ভাগ্য শিক্ষাব্রতীদিগের দোষ কি?

এমত অবস্থায় যতটুকু করা সম্ভব তাহা তাঁহারা করিতেছেন, বহুস্থলে সম্ভবের অতিরিক্তও করিতেছেন; কিন্তু জনগণের যাঁহারা প্রতিনিধি, জাতির যাঁহারা রাষ্ট্রনেতা, যাঁহাদের উপর আজ দেশের শাসনভার ন্যস্ত, তাঁহারা যদি এবিষয়ে অবহিত না হন, তাহা হইলে পরিত্রাণ কোথায়?

সরকারী খাতাপত্রে দৃষ্ট হয় যে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬১০০০ (৪৩০০০ বালকদিগের, ও ১৮০০০ বালিকা দিগের), ছাত্রসংখ্যা ২১০০০০০; বঙ্গদেশের আয়তন ও জনসংখ্যার অনুপাতে আশানুরূপ না হইলেও এই সংখ্যাগুলি শুনিতে মন্দ শুনায় না; কিন্তু শিক্ষকদিগের যে দুরবস্থা এবং তন্নিমিত্ত শিক্ষার যে দুর্দ্দশা, তাহা স্মরণ রাখিলে, বাস্তব শিক্ষার দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে এই সমস্ত বড় বড় সংখ্যা একেবারেই অলীক বলিয়া মনে হয়। বিদ্যালয়-সংখ্যা ইহার চারিভাগের একভাগ হইয়াও যদি শিক্ষকেরা ভাল ভাবে শিক্ষা-দানের সুযোগ পাইতেন, তবে দেশে প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার অনেক বেশী হইত।

যাহা হউক, এই দুঃখের কাহিনী বেশী বাড়াইয়া আর আপনাদের চিত্ত ভারাক্রান্ত করিতে চাহিনা। আমি কেবল ইহাই কামনা করি, শুধু ইহাই প্রার্থনা করি যে অতীতে যাহাই হইয়া থাকুক না কেন, বর্ত্তমানে আমাদের যতই দুর্গতি হউক না কেন, আজ যখন দেশের শাসনযন্ত্র আমাদেরই নির্ব্বাচিত মনোনীত প্রতিনিধিদিগের হস্তে ন্যস্ত, তখন যেন অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালার

এই কলঙ্ক দূর হয়। আমাদের কর্ত্তৃপক্ষগণ দেশের নেতৃগণ যেন ধনুর্ভঙ্গ পণ করেন যে, যে প্রকারেই হউক, যত কষ্ট স্বীকার করিয়াই হউক, তাঁহারা বাঙ্গালার পল্লীর ঘরে ঘরে সুশিক্ষার আলোক বিকিরণ করিবেন।

বাঙ্গালীর আর কিছু নাই থাকুক, তাঁহার মস্তিষ্ক আছে, প্রাণ আছে, উৎসাহ আছে। যদি সুশিক্ষাদ্বারা সেই মস্তিষ্ক সক্রিয় হয়, যদি সুব্যবস্থায় সেই প্রাণ সতেজ হয়, যদি সু-আদর্শে সেই উৎসাহ সন্দীপিত হয়, তবে বাঙ্গালা মায়ের যে ভুবন-ভুলান রূপে আত্মহারা হইয়া কবি গাহিয়াছিলেন,

"আমার সোণার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি,
চিরদিন তোমার আকাশ,. তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী",

সেই বাঙ্গালা মায়ের "পাখীডাকা ছায়ায় ঢাকা" পল্লীবাট আবার প্রাণবন্ত হইয়া উঠিবে—বাঙ্গালার হাটে মাঠে পল্লীতে নগরীতে আবার লক্ষ্মী-শ্রী সঞ্চারিত হইবে। "এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন, আসিবে সেদিন আসিবে।" বন্দে মাতরম্।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫।

রাষ্ট্রভাষা-সমস্যা

রাষ্ট্রভাষা-সমস্যা

[নিখিল-বঙ্গ অধ্যাপক-সমিতির দৌলতপুর অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতা]

ভারতবর্ষে রাষ্ট্রভাষা কি হওয়া উচিত এই সম্বন্ধে যে আন্দোলন চলিতেছে, এবং যে আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করিয়া হিন্দী, উর্দ্দু, হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষার রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত হইবার দাবী সম্বন্ধে বিভিন্ন সভাসমিতিতে নানারূপ আলোচনা ও বাগ্‌বিতণ্ডা হইতেছে, সেই রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে অনেকেরই কোন সুস্পষ্ট ধারণা আছে বলিয়া মনে হয় না। যাহোক একটা কিছু রাষ্ট্রভাষা খাড়া করিতেই হইবে, এটা যেন একেবারে স্বতঃসিদ্ধ কথা।

সমগ্র ভারতবর্ষে আপামর জনসাধারণকে একটা কোন ভাষা শিখিতেই হইবে, নহিলে ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্য অসম্ভব;

এবং এই প্রকার রাষ্ট্রভাষার প্রচলন হইলেই ঐক্য অতি সহজে অবলীলাক্রমে আসিয়া পড়িবে—এই প্রকার একটা ধারণা যেন আমাদিগের নেতাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। আমাদের দেশ রাম না হইতেই রামায়ণের দেশ; তাই স্বাধীনতার সঙ্গে দেখা নাই, অথচ "স্বাধীনতা-দিবস" বৎসর বৎসর পালিত হইতেছে; এবং স্বাধীন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র এখনও সুদূরপরাহত, অথচ রাষ্ট্রভাষা কি হইবে সে বিষয়ে ব্যাকুলতার অন্ত নাই।

সে কথা যাক্। কিন্তু এক সাধারণ রাষ্ট্রভাষার সহিত রাষ্ট্রীয় ঐক্যের সম্পর্ক কত দূর, এবং আদৌ কোন সম্পর্ক আছে কিনা, সেটা একটু পরখ করিয়া দেখা আবশ্যক। এ বিষয়ে প্রথম কথাই এই যে, ইতিহাস এই ঐক্যের দাবীর অনুকূলে বিশেষ সাক্ষ্য দেয় না। ইতিহাস বলে যে এক রাষ্ট্রভাষা, এমন কি এক মাতৃভাষাভাষী হইয়াও জাতির মধ্যে মোটেই রাষ্ট্রীয় ঐক্য না থাকিতে পারে; আবার বিভিন্নভাষাভাষীর মধ্যেও সুদৃঢ় সুদীর্ঘ রাষ্ট্রীয় ঐক্য সংঘটিত হইতে পারে। দুই একটা মোটা মোটা উদাহরণ দেওয়া যাউক।

প্রাচীন ভারতবর্ষে মোটামুটি সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল; ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এই ভাষাতেই ভাবের আদান-প্রদান চলিত; সংস্কৃত সাহিত্য সমস্ত ভারতের সাধারণ সম্পত্তি ছিল; কিন্তু ভারতবর্ষ এক অখণ্ড রাষ্ট্র ছিল না—কুরু, পঞ্চাল কোশল, মৎস্য, বিদর্ভ, মদ্র ইত্যাদি বহু রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল।

ইউরোপেও মধ্য যুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত জার্ম্মাণ-ভাষাভাষী জাতিসমূহ নানা বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল, এই সবে সেদিন হিট্‌লারের দাপটে অষ্ট্রিয়া ও সুদেতেন অঞ্চল জার্ম্মেণীর কুক্ষিগত হওয়ায় এখন অনেকটা এক রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। ইটালীরও সেই অবস্থা। সমস্ত মধ্যযুগে ইটালীয়-ভাষাভাষিগণ ছোট্ট বড় মাঝারী নানা প্রকারের রাষ্ট্রে শতধা বিচ্ছিন্ন ছিল। তারপর ধরুন মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা। মেক্সিকো হইতে আরম্ভ করিয়া চিলি আর্জ্জেন্টিনা পর্য্যন্ত (এক ব্রেজিল বাদে) সর্ব্বত্রই এক স্পানিশ ভাষার প্রচলন, তাহাতে লাটিন আমেরিকা ঐক্য রাষ্ট্রে পরিণত হয় নাই।

অপর পক্ষে ধরুন অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর কথা। ছয় শত বৎসরেরও উর্দ্ধকাল ধরিয়া হাপস্‌বুর্গ-রাজের শাসনে নানা বিভিন্নভাষাভাষী জাতি সুসংহত রাষ্ট্রীয় ঐক্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। তারপর ধরুন রুশ-সাম্রাজ্য। জারের আমল হইতে আরম্ভ করিয়া আজ ষ্টালিনের আমল পর্য্যন্ত রুশ-সাম্রাজ্যের মধ্যে নানা জাতি ও নানা ভাষাভাষীর সমাবেশ, তাহাতে রাষ্ট্রীয় ঐক্য কিছুমাত্র ব্যাহত হয় নাই।

সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ভাষাগত ঐক্যের সহিত রাষ্ট্রগত ঐক্যের সম্পর্ক অতি সামান্য—কোনই সম্পর্ক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাজেই ভারতে রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপন করিতে হইলে কোন একটা ভাষাকে সর্ব্বত্র চালু করিতেই হইবে, ইহা একবারেই অশ্রদ্ধেয় কথা।

রাষ্ট্রভাষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে এই বড় দাবীটাই যদি অগ্রাহ্য হইয়া যায়, তবে বাকী থাকে শুধু সুবিধা বা convenience-এর কথা। সে বিষয়ে একটু ধীরভাবে, একটু ঠাণ্ডাভাবে আলোচনা চলিতে পারে—বিশেষ উষ্ণতার আবশ্যক করে না। এ সম্বন্ধেও আমার মনে হয় রাষ্ট্রভাষার প্রবক্তারা কি চাহেন, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের নিজেদেরই কোন স্পষ্ট ধারণা নাই।

কোন একটা সর্ব্বজনবোধ্য ভাষার প্রচলন দ্বারা কি উদ্দেশ্যে সাধন করিতে হইবে? কি অর্থে ভাষাটা রাষ্ট্রভাষা-রূপে পরিগণিত হইবে? সমস্ত আফিস-আদালতে আইন-কানুনে ব্যবস্থা-পরিষদে সেই ভাষা ব্যবহৃত হইবে, ইহাই কি রাষ্ট্রভাষার পাণ্ডারা চান? ধরুন একটা উদাহরণ। হিন্দীই যেন রাষ্ট্রভাষা হইল। তৎক্ষণাৎ বাঙ্গালার, মান্দ্রাজের, মহারাষ্ট্রের, পঞ্জাবের সমস্ত আফিস-আদালতে নথিপত্র আর্জ্জি-বর্ণনা সওয়াল-জবাব হিন্দীতে চলিতে আরম্ভ করিবে? সমস্ত সরকারী আইন, নোটিস ইত্যাদি হিন্দীতে লেখা হইবে? ব্যবসায়ের কিংবা রাজস্ব বিভাগের হিসাব-কেতাব হিন্দীতে রক্ষিত হইবে? তাহা হইলে ত সমূহ বিপদ দেখিতেছি। এতদিন যে ইংরাজ-রাজত্ব চলিতেছে, তাহাতেও হাইকোর্ট ভিন্ন নিম্ন আদালতের কাজকর্ম্ম সব যে প্রদেশের যে ভাষা তাহাতেই চলে—কিন্তু কংগ্রেসী আমলে বোধ করি আর তাহা চলিবে না।

আর একটা কথা রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে শুনিতে পাই—সেটা এই যে হিন্দী শিখিলে ভারতের নানা প্রদেশে গমনাগমনের

সুবিধা হইতে পারে। যদি একথা ঠিকও ধরিয়া লওয়া যায়—যদিও সম্পূর্ণ ঠিক নহে, কারণ দক্ষিণ ভারতে হিন্দী জানিয়াও বিশেষ কিছুই সুবিধা হয় না—তাহা হইলে ভাবিতে হয় যে, সমাজের মধ্যে শতকরা কয় জন লোক বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ-ব্যপদেশে গমনাগমন করেন? হাজারের মধ্যে একজনও করেন কি না সন্দেহ। অথচ এই যে বিপুল জনসাধারণ, যাহারা চিরকাল তাহাদের স্ব স্ব প্রদেশেই বসবাস করিবে, কস্মিন্‌কালেও যাহাদের অন্য প্রদেশে যাইবার আবশ্যকতা হইবে না—এমন কি মাতৃভাষারই অক্ষর-পরিচয় যাহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই নাই—তাহাদের উপর কল্পিত সুবিধার অজুহাতে মাতৃভাষার উপরেও আবার আর একটি বিদেশী ভাষা অবশ্য-পঠিতব্য করিবার প্রয়াস হইতেছে; এবং এই প্রয়াসে কংগ্রেসী প্রধান প্রধান চাঁই—যথা স্বয়ং মহাত্মাজীর বৈবাহিক রাজগোপালাচারী মহাশয়—Criminal Law Amendment Act-এর বলে শত শত লোককে জেলে পাঠাইতেও দ্বিধা করিতেছেন না।

রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে এই দুইটি যুক্তিই যদি অবাস্তব এবং অনাবশ্যক বলিয়া প্রতীত হয়, তবে বাকী থাকে শুধু আর একটা যুক্তি। সেটা এই যে, সমাজের মধ্যে যাঁহারা সুশিক্ষিত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তাঁহারা যখন নিখিল-ভারতীয় সভা-সমিতি-কাউন্সিল প্রভৃতিতে যোগদান করেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য একটা সাধারণবোধ্য ভাষা থাকিলে কাজের সুবিধা হয়। কথাটা খুব বড় নয়। যে কোন দেশেই

আন্তর্জ্জাতিক সভা-সমিতির অধিবেশন হয়, তথায়ই এই অভাব এবং সাধারণবোধ্য ভাষার এই প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়; এবং নানাভাবে এই অভাবমিটান হয়। শুনিয়াছি জেনিভায় জাতিসঙ্ঘ (League of Nations)-এর অধিবেশনে, সমস্ত প্রতিনিধিই নিজের নিজের ভাষায় বক্তৃতা দেন। কিন্তু দোভাষীর বন্দোবস্ত থাকে, তাঁহারা সব বক্তৃতাই ইংরাজীতে ও ফরাসীতে অনুবাদ করিয়াদেন; কার্য্য চলিয়া যায়। যখন ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভের্সাই-সন্ধি সম্পর্কে বৈঠক বসে, তখনও এই পদ্ধতিই অবলম্বিত হইয়াছিল। এখনও শুনিতে পাই যে ইউরোপীয় কন্টিনেন্টে বিভিন্ন রাষ্ট্র—মনে করুন তুরস্ক ও রুশ—ইহাদের মধ্যে সন্ধি হইলে সন্ধিপত্র ফরাসীতে লেখা হইয়া থাকে। ইউরোপের বাহিরে ইংরাজীর বহুল প্রচলন হেতু ইংরাজীই বেশীর ভাগ আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এ সমস্তই কাজের সুবিধা-অসুবিধার কথা—practical convenience-এর কথা। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি practical জাতি; কাজের সুবিধার জন্য যেটুকু আবশ্যক সেইটুকুই করিয়া তাহারা সন্তুষ্ট থাকে, আমাদের মত খামখা চেঁচামেচি করিয়া আকাশ ফাটায় না। যেহেতু ইউরোপের আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে ফরাসীর প্রচলন আছে, তদ্ধেতু ইংলণ্ড, রুশ, জার্ম্মেণী, স্পেন, ইটালী ইত্যাদির আবালবৃদ্ধবনিতার যে ফরাসী শিখিতে হইবে, এই অদ্ভুত কল্পনা তাহাদের সমাজে স্থান পায় না। আমাদের দেশের রাষ্ট্রভাষাবিলাসী অত্যুৎসাহীদিগের উর্ব্বর মস্তিষ্কেই এই সব আজগুবি ধারণা গজায়।

বস্তুতঃ, এই হিসাবে রাষ্ট্রভাষা প্রচলনের importance খুব বেশী নহে। কাজেই শুধু এইটুকু প্রয়োজন সাধন করিবার জন্য এত অতিরিক্ত মাথাব্যথার কোন সঙ্গত কারণ দেখিতে পাই না, কারণ এখনও ইংরাজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এ যাবৎ নিখিল-ভারতীয় সভা-সমিতিতে আইন-কানুনে ইংরাজীই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে ; স্বাদেশিকতার খাতিরে এখনই যে তাহা উল্টাইয়া ফেলিতে হইবে, নহিলে মহাভারত অশুদ্ধ হইবে, এমন কোন কারণও দেখি না ; বিশেষতঃ এই ইংরাজী জানাতে যখন আরও উপকার হয়,—বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত হয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত ভাবের আদান-প্রদানের সুবিধা হয়। তাছাড়া, শতবর্ষেরও অধিককাল ধরিয়া ভারতের শিক্ষিত সমাজ ইংরাজী শিখিতেছে, ইংরাজী ব্যবহার করিতেছে—এই ঐতিহাসিক ঘটনা ত অস্বীকার করিবার নহে। নিখিল-ভারতীয় ব্যাপারে ইংরাজী তুলিয়া দিয়া আবার নূতন একটি ভাষা জোর করিয়া চালাইতে হইবে, এই প্রকার ধনুর্ভঙ্গ পণের কোন হেতু দেখি না। রাষ্ট্রভাষার পাণ্ডাদের কথা অনুসারে চলিলে ফল দাঁড়াইবে এই যে তিনটি ভাষা শিখিতে হইবে : প্রথম—মাতৃভাষা, দ্বিতীয়—ইংরাজী ভাষা, তৃতীয়—তথাকথিত রাষ্ট্রভাষা। এ যে একেবারে cruelty to animals !

আরও একটা মোটা কথা মনে রাখিতে হইবে। কমিটি করিয়া পরামর্শ করিয়া কোন ভাষা চালু করা যায় না।

ঐতিহাসিক কারণে, রাজ্য-বিস্তার বাণিজ্য-ব্যবসায়ের ফলেই এক একটা ভাষার পরিধি বিস্তৃত হয়। এই কারণেই ইউরোপের মধ্যযুগে ইটালিয়ান-ফরাসী-আরবী-মিশ্রিত এক-প্রকার খিচুড়ী বাজারিয়া ভাষা ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বাঞ্চলে লেভান্ট প্রদেশে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহারই নাম হইয়াছিল Lingua Franca—ফরাসী ভাষার নাম Lingua Franca নহে। ইংলণ্ডের বিপুল বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলেই পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই ইংরাজীর প্রচার হইয়াছে; শেক্‌স্‌পীয়রের কাব্য-কুশলতার জন্য নহে। স্পেন লাটিন-আমেরিকা আবিষ্কার ও অধিকার করিয়াছিল বলিয়াই তথায় স্পানিশ প্রচলিত, ডন্ কুইক্সটের বিচিত্র কার্য্যকলাপের জন্য নহে। পণ্ডিতদিগের রচিত Esperanto কুত্রাপি চালু হয় নাই। সুতরাং ভারতবর্ষেও যদি কালক্রমে কোন ভাষা রাষ্ট্রভাষা হইয়া দাঁড়ায়ই, তবে তাহা ঐতিহাসিক ঘটনা-সমাবেশের ফলেই হইবে—কমিটি করিয়া হইবে না।

শুনিতেছি যে হিন্দু-মুসলমান-ঐক্য সাধন করিবার জন্য এক বিচিত্র হিন্দুস্থানী-ভাষার সৃষ্টি হইতেছে, এবং তাহার অভিধান রচনার ভার কংগ্রেস-কর্ত্তৃক একটি পণ্ডিত-মৌলানা-সংবলিত কমিটির উপরে অর্পিত হইয়াছে। তাহাদের ধারণা মোটামুটি এইরূপঃ "International" কথাটির হিন্দুস্থানী করিতে হইবে; "Inter" হইল "অন্তঃ", "nation" "জাতি" হইলে চলিবে না, সেটা যে একেবারে হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া গেল। ওটা হইবে

"কৌম।" সুতরাং মোট দাঁড়াইল "আন্তঃকৌমিক"—কিন্তু "আন্তর্জ্জাতিক" অচল। এবংবিধ "আন্তঃকৌমিক" ভাষার সাহায্যেই নাকি ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্য গড়িয়া তুলিতে হইবে। আমাদের "পরিস্থিতি সত্যে সত্যই গুরুত্বপূর্ণ"!

তবে বলা যায় কি? কংগ্রেসের মধ্যে হিন্দী-ভাষীদের যেরূপ প্রতাপ, মহাত্মা গান্ধীর যে প্রকার দাপট, তাঁহারা যদি বিশুদ্ধ হিন্দী বক্তৃতা এবং soul-force-এর কল্যাণে দিল্লীর যুক্তরাষ্ট্রের রাজতক্তে গদীয়ান হইয়াই বসেন, তবে ত তাঁহারা জোর করিয়াই হিন্দী চালাইবেন। বাপুজীর বেয়াই মহাশয় ত পূর্ব্বেই পথ দেখাইয়াছেন। এখন আমাদের একমাত্র ভরসা জিন্না সাহেব। তিনি সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে ও সব হিন্দী-মিন্দী চলিবে না: চালাইতে হইবে উর্দ্দু। উহাই খাঁটি জাতীয় ভাষা—মোগল-আমলে হিন্দু-মুসলমানের সহযোগিতায় উহার উদ্ভব। আর আমাদের গান্ধী মহাত্মা—তিনি পৃথিবীর আর সব কিছুর বিরুদ্ধেই তাঁহার fast tactics চালাইতে পারেন, পারেন না শুধু জিন্না সাহেবের সঙ্গে। তাই রাজকোট-জয়পুর-ত্রিবাঙ্কুর সব টলমল; কিন্তু নিজামরাজ্য নিথর নিশ্চল। সুতরাং আমাদের অর্থাৎ "ভেতো বাঙ্গালী"-দের একটা মস্ত ভরসা আছে যে ঐক্যের ধান্দায় এখনই যা মারামারি লাগিয়া গিয়াছে, আমাদের আর বিশেষ কিছু করিতে হইবে না; হিন্দী-উর্দ্দুর এই সংঘর্ষে নব-বিরচিত "আন্তঃকৌমিক" ভাষা internal combustion-এই ভস্মসাৎ হইবে।

তবে নেহাৎ নিশ্চিন্ত থাকাও উচিত নয়। যদি হিন্দী উর্দ্দু প্রভৃতি একটা কিছু রাষ্ট্রভাষারূপে গজাইয়া উঠিবার উপক্রম করেই, তখন ত একটা কিছু বিহিত করিতে হইবে। কাজেই পূর্ব্বাহ্নেই সতর্ক থাকা প্রয়োজন। সংস্কৃতের দাবী যদি না-ও তোলা যায়—প্রাচীন ও অপ্রচলিত ভাষা বলিয়া আমাদের আধুনিকতাগ্রস্ত তরুণগণ নাসিকা কুঞ্চন করিতে পারেন—যদিও ভারতবর্ষের সংস্কৃতি সংস্কৃত ভাষার উপরই প্রতিষ্ঠিত—কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার দাবী ত আমাদের বড় গলায় জানাইতেই হইবে। যদি নানাপ্রদেশের মধ্যে সভা-সমিতিতে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য কোন একটা ভাষাকে বাহনরূপে ঠিক করিতেই হয়, সেই ভাষার উৎকর্ষ কতটা উচ্চাঙ্গের, সাহিত্যিক রাষ্ট্রনৈতিক ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা কতটা, এটাও ত দেখিতে হইবে। বাজার Patois দিয়া ত গুরুগম্ভীর বিষয়ে আলোচনা চলে না—সুতরাং বাজার-হিন্দী দ্বারাও চলিবে না। পূর্ণতর উন্নততর সমৃদ্ধতর ভাষার আবশ্যক ; এবং এদিক্ দিয়া দেখিলে বাঙ্গালা ভাষার দাবী ভারতীয় ভাষার মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য। এ বিষয়ে কোন দ্বিমত হইতে পারে না ; এবং বঙ্গভাষাভাষীদের সংখ্যাও কিছু নগণ্য নহে। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে প্রচলিত করিবার দাবীকে নেহাৎই বাঙ্গালী-জন-সুলভ প্রাদেশিকতা-দোষ-দুষ্ট বলিয়া মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

চৈত্র, ১৩৪৫।

বাঙ্গালা ভাষার রূপ

বাঙ্গালা ভাষার রূপ

[প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের জামশেদপুর অধিবেশনের সাহিত্য-শাখায় প্রদত্ত বক্তৃতা]

আজ এই সভায় বাঙ্গালা ভাষার রূপ-নিয়ন্ত্রণের আলোচনা উত্থাপন করিতে সম্মেলনের কর্তৃপক্ষগণ যে আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এই সুযোগে এ বিষয়ে দুই চারিটি কথা বলিতে আমি চেষ্টা করিব। তবে গোড়াতেই কিন্তু আমার একটু ভয়ের সঞ্চার হইতেছে। ভয়ের কারণ দ্বিবিধ।

প্রথমটি আমার নিজের সম্বন্ধে। শুনিলাম নাকি পাঁচ মিনিটের অতিরিক্ত সময় পাওয়া যাইবে না, বক্তব্য বলিবার জন্য। এতটুকু সময়ের মধ্যে কি রকমে যে আমার বক্তব্য গুছাইয়া বলিব তাহা ঠিক করিতে পারিতেছি না ; অপর পক্ষে সভাপতির আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া Civil Disobedience

আচরণ করিবার দুঃসাহসও হইতেছে না। বিশেষতঃ আমাদের অদ্যকার সভার সভাপতি মহাশয় শুধুই যে সভাপতি তাহা নহে, তিনি একজন হাকিম*, এবং সম্ভবতঃ জবরদস্ত হাকিমই হইবেন। এমন হাকিমের হুকুম অমান্য করিবার মত সাহস আমার নাই। শুনিয়াছি মহিষ-গল-ঘণ্টার নিনাদ নাকি অতীব ভয়াবহ, কারণ স্বভাবতঃই তদ্দ্বারা 'শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর' স্মরণ-পথে আনীত হয়; কিন্তু এক্ষণে আমার মালুম হইতেছে যে সভাপতি-বেল-ঘণ্টাও তদপেক্ষা কিছুমাত্র কম বিভীষণ নহে, কারণ সেই ঘণ্টা যখন নিনাদিত হইবে তখন আমার পেটে যতই বৈয়াকরণী বিদ্যা থাকুক না কেন, অমনি মনে পড়িবে যে 'প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্-করণে', এবং তৎক্ষণাৎ আমার বক্তৃ-লীলা সংবরণ করিতে হইবে। তাই আপনাদের নিকট অকপটে কবুল করিতেছি যে সেই ভয়ে আমার মুহুর্মুহুঃ হৃৎকম্প উপস্থিত হইতেছে। (সভাপতি মহাশয় বলিলেন ঃ আপনাকে পনের মিনিট সময় দেওয়া হইবে।) যাক্, সভাপতি মহাশয়ের আশ্বাস-বাক্যে আমার যেন ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। আমার নিজের ভয় বোধ করি অনেকটা কাটিয়া গেল।

এখন দ্বিতীয় ভয়ের কারণ বলিতেছি। সেটি আমার নিজের সম্বন্ধে নহে, আপনারা যাঁহারা শ্রোতা তাঁহাদের সম্বন্ধে। আজ সকালবেলা আমার পরমশ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু আপনাদের এখানকার চীফ্ টাউন এঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত মহাশয়ের

* সাহিত্য-শাখার সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়, আই. সি. এস্।

সমভিব্যাহারে সুবর্ণরেখার পরপারে দল্‌মা পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। শুনিয়াছি যে এই পার্ব্বত্য প্রদেশ অতিমাত্রায় শ্বাপদ-সঙ্কুল—ব্যাঘ্র-ভল্লূক-বন্যহস্তী দ্বারা অধ্যুষিত; আর সাক্ষাৎও হইয়াছে—অবশ্য বাঘ ভালুকের সঙ্গে নহে—তাহা হইলে আর আজ আপনাদের উপর আপতিত হইবার সুযোগ আমার হইত না—কিন্তু সাক্ষাৎ হইয়াছে, বন্যহস্তীর বিরাট্ বিপুল বিস্তৃত পদ-চিহ্নের সঙ্গে। সেই প্রকাণ্ড গোলাকৃতি হাতীর পায়ের পাড়া দেখিয়া আমার ত প্লীহা চম্‌কাইয়া গিয়াছিল। আমার সেই অভিজ্ঞতার পর আর কাহাকেও কোন প্রকার অরণ্যের ভিতর লইয়া যাইতে আমার প্রবৃত্তি নাই। কিন্তু যে আলোচনা উত্থাপনের ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছে—অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের আলোচনা—সেটিও অরণ্যবিশেষ। ভাষাতত্ত্বের সেই গহন বনে আপনাদিগকে প্রবেশ করাইতে আদৌ আমার মন সরিতেছে না। তাই মনঃস্থ করিয়াছি যে আপনাদের নিরাপত্তার জন্যই জটিল ভাষারণ্যের শ্বাপদ-সঙ্কুল পথ পরিহার করিয়া অপেক্ষাকৃত সহজ সরল পথেই বিচরণ করিব। যে সমস্যাটি আজ উপস্থিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে যথাসম্ভব সোজা কথাতেই সামান্য কিছু আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

ব্যাপারটা সংক্ষেপতঃ এই। আজ যে বাঙ্গালা ভাষার রূপ-নিয়ন্ত্রণের এই প্রসঙ্গটা প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষগণ বিশেষ আগ্রহ সহকারেই আলোচনা করিতে চাহেন, ইহার কারণ শুধুই তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা নহে; বস্তুতঃ চাহিদাটা

প্রধানতঃই ব্যাবহারিক—অর্থাৎ একেবারে দায়ে ঠেকিয়াই এ বিষয়ে একটা হেস্তনেস্ত করিবার প্রয়োজন ইঁহারা অনুভব করিতেছেন। ব্যাপারটা এই। সম্মেলনের কার্য্যতালিকা বা প্রোগ্রামের একটি বিশেষ অঙ্গ হইল বাঙ্গালা ভাষার প্রচার ও প্রসার—প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে এবং বিশেষ করিয়া অবাঙ্গালীদের মধ্যে। এই প্রচারকল্পে সম্মেলনের পক্ষ হইতে নানা কেন্দ্রে, বঙ্গে ও বঙ্গের বাহিরে, ইঁহারা একটা বার্ষিক পরীক্ষা লইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। দুই এক বৎসর পরীক্ষা লওয়াও হইয়াছে। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, শাস্ত্রগ্রন্থ, ইত্যাদি নানা বিষয়েই বাঙ্গালা ভাষায় পরীক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে। এই সমস্ত পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীরা কি রকম বাঙ্গালায় উত্তর লিখিবে? এই হইল প্রথম সমস্যা। কারণ আজকাল অনেক খ্যাত-নামা লেখক তাঁহাদের লেখায় ক্রমশঃই বেশী পরিমাণে নানাপ্রকার "চল্‌তি" ভাষার অবতারণা করা হেতু, বালক-বালিকাদের মধ্যেও সেই অভ্যাস সংক্রামিত হইতেছে; কাজেই নানাবিধ বাঙ্গালা রূপের আবির্ভাব পরীক্ষার্থীদিগের উত্তরে দেখা দিতেছে। এখন ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণীয়? এযাবৎ-প্রচলিত "সাধু" রূপ, না এই সব নয়া আমদানী "চল্‌তি" রূপ? এবিষয়ে একটা কিছু নির্দ্দেশ পাইলে সম্মেলন উপকৃত হন। দ্বিতীয়তঃ, অবাঙ্গালীদের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার প্রচার কল্পে ইঁহারা সহজ ব্যাকরণ ও শিক্ষাপুস্তকাদি রচনা করিতে চাহেন। কোন্ প্রকার বঙ্গভাষায় এই সব রচিত হইবে?

কোন্ প্রকার বঙ্গভাষার রূপ এই সব গ্রন্থে অবলম্বিত ও প্রদর্শিত হইবে? মোটামুটি "একরূপী" সাধু ভাষার, না "বহুরূপী" চল্‌তি ভাষার? এই নিমিত্তও একটা নির্দ্দেশ আবশ্যক। আপনাদের সমক্ষে সমস্যাটি সংক্ষেপে উপস্থিত করিলাম। এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্মেলনের পক্ষে একান্তভাবে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এখন এসম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা সংক্ষিপ্তভাবে আপনাদের নিকট নিবেদন করিব। প্রসঙ্গক্রমে, বর্ত্তমানে আবার বাণান-ঘটিত একটা বিভ্রাট ঘটাইবার যে অপচেষ্টা হইতেছে, সে বিষয়েও সামান্য কিছু বলিব।

আপনারা সকলেই জানেন যে প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া নানাবিধ খ্যাতনামা লেখকদিগের চেষ্টার ফলে "লিখিত" বাঙ্গালা ভাষার রূপের একটা কাঠাম একরূপ ঠিক হইয়া আসিয়াছিল—মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে, শিষ্টপ্রয়োগে ভাষার একটা রূপ "সাধু" বা সর্ব্বজনসম্মত রূপ বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছিল; এবং এই রূপগুলি প্রাচীন বাঙ্গালার নানা অঞ্চলে কথিত রূপের সমন্বয়ের ফলে ভাষা-বিবর্ত্তনের স্বাভাবিক ধারাক্রমেই আকার ধারণ করিয়াছিল। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন ক্রিয়াপদের রূপগুলি: করিয়া+আছি =করিয়াছি, করিতে+আছি=করিতেছি, ইত্যাদি। স্বভাবতঃই এই সব রূপ উৎপন্ন হইয়াছে, কৃত্রিমভাবে নহে; এবং এই প্রকার রূপগুলিই লিখিবার সময়ে বড় বড় লেখকগণ ব্যবহার করিবার ফলে বাঙ্গালাতে এমন একটি সুসংহত ভাষা-রূপ দাঁড়াইয়া

যায়, যাহা বাঙ্গালার সর্ব্বত্র—দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত, চট্টগ্রাম হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত—সর্ব্বত্রই ভাষার "সাধু" রূপ বা standard হিসাবে গণ্য হয়, এবং সকলেই ইহা বুঝিতে পারে। এবং লেখক যে কোন জিলার অধিবাসী হউন না কেন, তিনি মুখে যে ভাষা-রূপই ব্যবহার করুন না কেন, লিখিবার সময়ে এই আদর্শ "সাধু" ভাষা-রূপই ব্যবহার করিতে থাকেন। বাঙ্গালা ভাষায় যে সমস্ত রচনাকে classic বলা যায়, সে সমস্ত রচনাই—রামমোহন, মৃত্যুঞ্জয়, মাইকেল, বিদ্যাসাগর হইতে বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র, এমন কি প্রাক্-নোবেল প্রাইজ্ রবীন্দ্রনাথের পর্য্যন্ত—প্রায় সমুদায় রচনাই এই "সাধু" ভাষায় রচিত। ইহাতে কাহারও বুঝিবার পক্ষে কোন অসুবিধা হইয়াছে বলিয়া কখনও শুনা যায় নাই। এইরূপ একটা standard "লৈখিক" ভাষার বিবর্ত্তন—যাহা নানা জিলার বা উপবিভাগের "মৌখিক" উপভাষা বা dialect হইতে কতকটা পৃথক্—ইহা যে শুধু বাঙ্গালা ভাষাতেই দেখা যায় এমন নয়; অল্পবিস্তর সমস্ত জীবন্ত ভাষাতেই এইরূপ বিবর্ত্তন দেখা যায়—ইংরাজীতে, ফরাসীতে, জার্ম্মাণে, সর্ব্বত্রই এইরূপ হইয়াছে। বিশেষতঃ লেখাপড়ার বা literacy-র সমধিক প্রসারে, এবং মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে ছাপার বইএর অত্যধিক প্রচলনের ফলে "লৈখিক" ভাষার রূপের নিয়ন্ত্রণের দিকে লোকের বেশী নজর পড়ে। কাজেই নিয়ন্ত্রণও বহুল-পরিমাণে সংসাধিত হয়। "মৌখিক"

ভাষা ও "লৈখিক" ভাষার function-এর মধ্যেও যথেষ্ট তফাৎ আছে, এবং উপায়ের পার্থক্য ত আরও বেশী। "মৌখিক" ভাষা শুধু শ্রোতার অবগতির জন্য ; "মৌখিক" কথাবার্ত্তা শুধু ধ্বনির সাহায্যে শ্রোতার বোধগম্য হয়—একমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয়ই এ বিষয়ে কাজ করে। পরন্তু "লৈখিক" রচনা লেখার আকৃতি বা বর্ণমালার রূপের সাহায্যে পাঠকদের বোধগম্য হয়—এক্ষেত্রে দর্শনেন্দ্রিয়ই প্রধান। সুতরাং "লৈখিক" ভাষায় রূপের একত্ব বা uniformity নিতান্তই আবশ্যক, ধ্বনির তারতম্যে তেমন কিছু আসিয়া যায় না। যেমন ধরুন, ত-এ একার ল, "তেল" কথাটি ; আপনারা রাঢ় দেশের লোক "তেল"-ই উচ্চারণ করিবেন ; আমরা বঙ্গদেশীয়গণ বা বাঙ্গালগণ কিঞ্চিত বিবৃত উচ্চারণ করিয়া যাহা বলিব, তাহা আপনাদের বর্ণমালায় লিখিলে রূপ ধারণ করিবে "ত্যাল"। কিন্তু এই স্থানীয় উচ্চারণ বিভ্রাটে "লৈখিক" রূপের কিছু আসিয়া যায় না। "তেল" ঠিক খাঁটিই থাকুক—উচ্চারণের ভেজাল উহাতে দিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখি না। আজকাল কিন্তু "মৌখিক" উচ্চারণানুযায়ী বাণানের উৎকট প্রচেষ্টায় "মতো" দেখিতেছি, "যতো" দেখিতোছ, "ভালো" দেখিতেছি, "বিশেষতো" দেখিতেছি—এমন কি, রবীন্দ্রনাথের "বিশ্বপরিচয়" বইখানিতে আমাদের সাবেকী চল্লিশ সেরী মণের "মোন" রূপও দেখিতেছি—এই সব দেখিয়া শুনিয়া হাস্যরসের সঞ্চার হয় সন্দেহ নাই ; কিন্তু সময় সময় আবার "মোন"টা খারাপ হইয়া

যায় ; এবং এই দৌর্ম্মনস্যের ফলে মাঝে মাঝে "বোনে" যাইবার প্রবৃত্তিও যে জাগিয়া না উঠে এমন নহে।

যাক্, যা বলিতেছিলাম। গোটা উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া বঙ্গভাষার চর্চ্চা ও বিকাশের ফলে উহার একটা সুনির্দ্দিষ্ট সর্ব্বজনমান্য লিখিত "সাধু" রূপ গঠিত হইয়াছিল। দুই চারিখানা "মৌখিক" ভাষায় লিখিত গ্রন্থ—"আলালের ঘরে দুলাল" প্রভৃতির ন্যায়—রচিত হইয়াছিল সত্য ; এবং নাটক উপন্যাসাদিতে কথোপকথন প্রসঙ্গে কিছু কিছু "'মৌখিক" রূপ ব্যবহার হইত সত্য। কিন্তু মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে এইগুলি লঘু বা চটুল রচনা। পরন্তু গম্ভীর রচনায়, প্রবন্ধাদিতে, এমন কি উপন্যাস প্রভৃতিতেও কথোপকথন ভিন্ন অন্যস্থলে "সাধু" ভাষা ব্যবহৃত হইত। এই "সাধু" রীতির উপর প্রথম প্রবল আক্রমণ আরম্ভ হইল প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে—"বীরবল" নামে পরিচিত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সম্পাদিত "সবুজ পত্র" কাগজের মারফত্। রবীন্দ্রনাথ তখন সদ্য নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন। তিনিও সহসা "মৌখিক" চল্‌তি-ভাষা-ভাষীদিগের দলে ভিড়িয়া পড়িলেন ; রবি-দীপিত হইয়া "সবুজ পত্র" তর্ তর্ বেগে বাড়িয়া উঠিয়া দিকে দিকে কচি ও কাঁচা ডগার হরিৎ শোভা বিস্তার করিতে লাগিল ; এই শোভা বাঙ্গালার "তরুণ" সাহিত্যিকগণের উপর মায়ারও বিস্তার করিল নেহাৎ কম নয়। কিন্তু কয়েক বৎসর ধরিয়া শোভা ও মায়া বিস্তার করিবার পর, কালের অলঙ্ঘ্য বিধানে "সবুজ পত্র" ঝরিয়া পড়িল—"মৌখিক"

দাপট উহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিল না। কিন্তু ঘটিল একটা অঘটন। "পত্র" ঝরিয়া পড়িয়া লুপ্ত হইয়া গেল বটে ; কিন্তু "সবুজ"টি রহিয়া গেল। ঠিক যেন Alice in Wonderland-এর সেই অপূর্ব্ব চিত্র—Cheshire Cat-এর ব্যাপার। সেই মার্জ্জার-পুঙ্গবের এক অদ্ভুত উৎকট হাস্য ছিল—যাহাকে বলে grin ; এলিস্ খুকী সেই grin-সমন্বিত cat-এর দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে দেখিতে পাইল যে ধীরে ধীরে ছায়ামূর্ত্তির ন্যায় মার্জ্জারটি মিলাইয়া যাইতেছে, অবশেষে একেবারেই অদৃশ্য হইয়া গেল ; কিন্তু সেই হাসিটি লাগিয়া রহিল—There was the grin without the cat ! শুধু যে সবুজটি রহিয়া গেল তাহা নহে ; গঙ্গাতীর হইতে বুড়ীগঙ্গা-তট পর্য্যন্ত, দিকে দিকে অঙ্গে-বঙ্গে-কলিঙ্গে সর্ব্বত্র সেই "সবুজিমা" ছড়াইয়া পড়িল। এ যেন সেই মদন-ভস্মের কাহিনীর পুনরাবৃত্তি :

"পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে ক'রেছ একি সন্ন্যাসী
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে !"

"সবুজ পত্র"-এর আবির্ভাব ও তিরোভাবের ফলে ব্যাপার দাঁড়াইল এই যে, যে "গাঙ্গেয়" উপভাষা মোটামুটি রাঢ় অঞ্চলে প্রচলিত ছিল এবং কলিকাতা রাজধানী হওয়ায় স্বভাবতঃই যে ভাষার প্রভাবের কিঞ্চিৎ আতিশয্য হইয়াছিল, এবং তৎকারণে পশ্চিম বঙ্গের লেখকদিগের লেখাতে কতকটা বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ

করিয়াছিল—বিশেষতঃ প্রমথ বাবু রবি বাবু প্রভৃতি বড় বড় লেখকদিগের দৃষ্টান্তে—সেই "গাঙ্গেয়" ভাষার মোহ ক্রমশঃ প্রায় সারা বাঙ্গালারই তরুণ লেখকদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। রাজসাহী বিভাগ, ঢাকা বিভাগ, এমন কি পাণ্ডব-বর্জ্জিত চট্টগ্রাম বিভাগ পর্য্যন্ত এই ছোঁয়াচ হইতে রক্ষা পাইল না। এখন, আমাদের বাঙ্গালদের রকম সকম ত আপনাদের জানাই আছে। আমরা বাঙ্গালরা—চাটগাঁই বাঙ্গাল, ঢাকাই বাঙ্গাল, বাখরগঞ্জের বাঙ্গাল—আমি ত নিজে একজন বাখরগঞ্জের বাঙ্গাল, বাঙ্গালদের মধ্যে supreme বা সেরা বাঙ্গাল—আমরা বাঙ্গালরা যদি একবার কোন কিছু আঁকড়িয়া ধরি—তা কি terrorism, কি civil disobedience, কি কল্‌কাত্তাই ভাষা—কোন হুজুগে যদি একবার মাতিয়া যাই, তবে একেবারে শেষ না দেখিয়া ত ছাড়ি না। তাহা আমাদের কোষ্ঠীতে নাই। সুতরাং এই ভাষাক্ষেত্রেও তাহার কিছুমাত্র অন্যথা হইল না। খাস্ ক্যাল্‌কেশিয়ানের চাইতেও বেশী মাত্রায় বাঁকা বাঁকা পশ্চিমা কল্‌কাত্তাই ভাষা নবীন ঢাকাই, চাট্‌গাঁই, রঙ্গপুরী, ইত্যাদি লেখকেরা চালাইতে লাগিলেন। বস্তুতঃ এই রেঢ়ো "মৌখিক" ভাষা—যাহা বঙ্গজ বা বারেন্দ্র লেখকদের পক্ষে কোন পুরুষে "মৌখিক" নয়, "লৈখিক" ত নয়ই—সেই ভাষা চালান যেন সাহিত্যিক তরুণিমার একটা hall-mark হইয়া দাঁড়াইল। যে উৎসাহ ও উদ্যম এই বিষয়ে তরুণ উদীয়মান বাঙ্গালা-লেখকগণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আমাদের মূল সভাপতি

ব্রতচারী গুরুসদয় বাবু* মালকোঁচা মারিয়াও তদপেক্ষা বেশী কিছু করিতে পারেন কিনা সে বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। আমাদের বাঙ্গালদেশে একটা প্রবচন আছে—"বোষ্টম যদি পীর হয়, তবে গোস্ত খায় দুনা"। এই প্রবচনানুসারে বাঙ্গাল লেখকগণ দ্বিগুণিত উৎসাহে "মৌখিক" গাঙ্গেয় বুলিকে তাঁহাদের "লৈখিক" ভাষায় রূপায়িত করিতে লাগিলেন। এই অত্যুৎসাহের ফলে মজার মজার শাব্দিক "পরিস্থিতি"-রও উদ্ভব হইতে লাগিল—তবে বিশেষ "গুরুত্বপূর্ণ" নয় এই যা রক্ষা। সাধুভাষার "আসিলে" শব্দ বঙ্গজদিগের হাতে পড়িয়া "আস্‌লেন" আকার ধারণ করিল, রাঢ়ীয় মৌখিক "এলেন" পর্য্যন্ত আর পৌঁছিল না। "সাথী" কথাটি এযাবৎ কল্প-লোকের কাব্যকাননেই পথের সাথী ছিল; ইহার আটপৌরে গাদ্যিক ব্যবহার বড় একটা ছিলই না; কিন্তু ভাবুকতাগ্রস্ত বাঙ্গালদিগের হাতে পড়িয়া ইহা একেবারে মাঠে ঘাটে হাটে বাজারে নিত্যসঙ্গী হইয়া দাঁড়াইল। "জুতামোজা" বাঁকা হইয়া একেবারে "জুতোমুজো" আকার ধারণ করিল। বার্দ্ধ-গাঙ্গেয়দিগের † উৎসাহের তোড়ে বক্র গাঙ্গেয় ভাষার প্লাবনের জলতরঙ্গ দ্বিগুণ বেগে প্রবাহিত হইল।

ফলতঃ ব্যাপার দাঁড়াইল এই যে, বিগত পঁচিশ বৎসরের

---

* প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের জামসেদপুরে মূল সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই. সি. এস.।

† বুড়ী-গঙ্গা তীরবাসীদিগের।

ভাষাগত ইন্‌খিলাফের ফলে এখন চিরপ্রচলিত সুপ্রতিষ্ঠিত সর্ব্বজনমান্য লিখিত ভাষার সাধুরূপের ভিত্তি পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছে। নাটক উপন্যাসাদির ত কথাই নই, গম্ভীর প্রবন্ধাদিতে, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক কিংবা ঐতিহাসিক আলোচনাদিতে পর্য্যন্ত "মৌখিক" রূপের প্রচলন অত্যধিক পরিমাণে চলিতেছে। প্রমাণের জন্য বেশী দূর যাইবার প্রয়োজন নাই। আমাদের এই সভাতেই তিন প্রস্থ সভাপতির অভিভাষণ পঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে আমাদের এই সাহিত্য-শাখার সভাপতিরূপে রায় মহাশয় উজ্জ্বলে মধুরে মিশাইয়া "বিনুর আত্মকাহিনী"-র যে উপভোগ্য চিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন, শুধু সেইটির নয়, পরন্তু অপর দুইটি গুরুগম্ভীরভাবে রচিত অভিভাষণেরও ভাষা অতি মর্ম্মান্তিকরূপেই "চলন্তিকা"। বস্তুতঃ যে কোন মাসিক-পত্র খুলিলেই দেখিতে পাইবেন, অর্দ্ধেক লেখা "সাধু," বাকী অর্দ্ধেক "অসাধু"। আপনারা হয়ত ভাবিতে পারেন যে "অসাধু" হইয়াও যদি "চল্‌তি" ভাষা বুঝিতে একটু সহজতর হয়, তবে মন্দ কি ? কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। এই তথাকথিত "মৌখিক" রূপের মৌখিকত্ব থাকে প্রধানতঃ সর্ব্বনাম ও ক্রিয়া পদের বিভক্তি ব্যবহারে, এবং বহুল-প্রচলিত দুই একটি বিশেষ্য-বিশেষণের "বাঁকা" রূপের ব্যবহারে ; যেমন, "তাহাদের" স্থলে "তাদের", "তাহাদিগকে" স্থলে "তাদেরকে", "করিয়াছি" স্থলে "করেছি", "করিব" স্থলে "কর্‌ব", "করিয়া" স্থলে "ক'রে" ; "পূজা" স্থলে "পূজো", "ইচ্ছা" স্থলে "ইচ্ছে",

"অবশ্য" স্থলে "অবিশ্যি", "খুড়া" স্থলে "খুড়ো", "বুড়া" স্থলে "বুড়ো", ইত্যাদি। এইগুলি বাদ দিলে তথাকথিত "মৌখিক" ষ্টাইলের রচনার শব্দ-সমাবেশ প্রাবৃটের ঘন-সমাবেশের ন্যায়ই গুরুগম্ভীর ঘোরঘটাচ্ছন্ন সংস্কৃতবহুল—প্রাকৃত ইতর লোকের পক্ষে শুধু দুষ্পাচ্য নয়, একেবারেই দুষ্পাঠ্য। বুঝিবার পক্ষে একেবারেই সুগম নহে। এবংবিধ রচনার "মৌখিক" অভিধা একেবারেই "পরিহাসবিজল্পিতং"। অথচ লাভের মধ্যে হইয়াছে এই যে এই অতি নিরর্থক "মৌখিক" ফোড়ন রচনা-সম্ভারে মিশাল দেওয়াতে কতকগুলি contracted এবং corrupted রূপ খামখা ভাষাতে প্রবেশ করিয়া শুধু শুধু বাণানের বিশৃঙ্খলার আমদানী করিয়াছে। কোন উপকার যে হইয়াছে এমন ত দেখিতে পাই না।

"করিয়াছি" এই সাধু ভাষার ক্রিয়াপদটি অপেক্ষা "করেছি" মৌখিক রূপটি বুঝিতে সহজতর, একথা বোধ করি কেহই বলিবেন না। তবে কিনা আজকাল hundred per cent speed-এর যুগ—তাই চারি syllable-এর পরিবর্ত্তে তিন syllable-এর আমদানীতে কিঞ্চিৎ time-এর economy বা সময়-সংক্ষেপ হইতে পারে, এই পর্য্যন্ত। কিন্তু অপরদিকে যে ঘোরতর গোলমাল। "করিয়াছি" শব্দটির বর্ণবিন্যাস একেবারে সুস্থির সুদৃঢ়—কোন অনিশ্চয়তা, কোন হাঙ্গামা নাই—আর বাঙ্গালী মাত্রেই অক্লেশে বুঝিতে পারে। এখন "মৌখিক" রূপ ধরা যাউক। কত রকমারী রূপ হয় একবার দেখুন :

করেছি, করেচি, কোরেছি, কোরেচি ; ইহার উপর আবার কেহ কেহ ইলেক্ বা apostrophe-র পক্ষপাতী,—সেই ইলেক্-ট্রিক মতে আরও দুইটি রূপ দাঁড়ায় : ক'রেছি, ক'রেচি। মোট রূপ দাঁড়াইল ছয়টি। কোন বঙ্গভাষাশিক্ষার্থী অবাঙ্গালী, নিরীহ সাধু "করিয়াছি" পদের স্থলে এই "মৌখিক" ষড়ানন-রূপের ষড়্‌যন্ত্রে যে একেবারে আক্কেল-গুড়ুম হইয়া যাইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তবুত একটা অতি সহজ দৃষ্টান্ত দিলাম। যদি মনে করুন "করিতেছি" পদটি ধরিতাম, তবে শ্রাদ্ধ কতদূর গড়াইত একবার ভাবুন দেখি? করছি, করচি ; কোরছি, কোরচি ; কর্চ্ছি, কর্চ্চি ; কোর্চ্ছি, কোর্চ্চি ; কচ্ছি, কচ্চি ; কোচ্ছি, কোচ্চি ; ইত্যাদি ইত্যাদি। "করিলাম" পদটির অবস্থা কি দাঁড়ায় দেখুন দেখি? করলাম, করলেম, করলুম ; কোরলাম, কোরলেম, কোরলুম ; কর্ল্লাম, কর্ল্লেম, কর্ল্লুম ; কল্লাম, কল্লেম, কল্লুম ; ইত্যাদি। লাম-লুম-লেম-সংবলিত ত্রিধারার একেবারে উদ্দাম প্লাবন! উপনিষদে যে লেখা আছে "একোঽহং বহুঃ স্যাম্" তাহার একেবারে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। গণিতজ্ঞ বলিয়া আমার কিঞ্চিৎ খ্যাতি আছে ; কিন্তু permutation and combination--এর সহযোগে এক একটি "সাধু" বাঙ্গালা ভাষার ক্রিয়াপদের যে কতগুলি রূপান্তর সম্ভব তাহা গণনা করিতে আমিও হিম্‌সিম্ খাইয়া যাই। তবে মিছামিছি এই নিরর্থক পণ্ডশ্রম কেন? কোন দিক্ দিয়াই কোন সুবিধা হয় না—অর্থবোধও সুগম হয়

না—শুধু শুধু বিশ পঞ্চাশ রকম বিচিত্র বাণানের অবতারণা করিয়া নিষ্কামভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা কেন? ভাষাশিক্ষার্থী-দিগের পক্ষে—তা কি বাঙ্গালী কি অবাঙ্গালী শিক্ষার্থী—তাহাদের পক্ষে ত রীতিমত একটা বিভীষিকার সৃষ্টি হয় এই "মৌখিক" বঙ্গবুলি আয়ত্ত করিতে।

শুধু "গাঙ্গেয়" মৌখিক ভাষার রূপেরই খেলা কিঞ্চিৎ দেখাইলাম। বাঙ্গালার অন্যান্য অঞ্চলের "মৌখিক" রূপ আমদানী করিলে ত বোধ করি ভূতের উপদ্রব মনে করিয়া আপনার সভাস্থল পরিত্যাগ করিবেন। তাই তাহা আর করিলাম না। বস্তুতঃ কোন সুপ্রতিষ্ঠিত ভাষাতেই এইরূপ "মৌখিক" রূপের আমদানী করা হয় না—কারণ "মৌখিক" উচ্চারণ স্থানভেদে কালভেদে পাত্রভেদে পরিবর্ত্তিত হইবেই, এবং তদনুসারে শব্দবিন্যাস করিতে গেলে কোন দিনই শব্দের রূপের স্থিরতা থাকিবে না। ধরুন ইংরাজী ভাষা। ইংলণ্ডেও নানা স্থানীয় dialect প্রচলিত আছে; Dorsetshire-এর কথা আর Yorkshire-এর কথা একরকম নহে; আবার খাস লণ্ডনের Cockney-দের উচ্চারণ অন্যবিধ। কিন্তু "সাধু" ইংরাজী ভাষায় ওসব dialect ব্যবহৃত হয় না—এমন কি রাজধানীর Cockney dialect-ও নহে। আমাদের বাঙ্গালা দেশের মত বিলাত দেশে রাজধানী-প্রীতি এতটা উৎকটভাবে দেখা দেয় নাই। একম কি, স্কচ্ লেখকরাও "সাধু" ইংরাজীতেই পুস্তকাদি লেখেন। তবে কোন কোন সময়ে দুই একজন

লেখক ঐসব উপভাষার নমুনা দেখাইবার জন্য তাহাতে কবিতাদি লেখেন, এই মাত্র—যেমন টেনিসনের Northern Farmer কিংবা Barnes এর Dorsetshire Poems। এখনও মনে পড়ে জর্জ্জ ইলিয়টের "Mill on the Floss" উপন্যাসে ম্যাগি টালিভারের কথাবার্ত্তায় গ্রাম্য ভাষার ব্যবহার কিরূপ অদ্ভুত ও অবোধ্য মনে হইত। বস্তুতঃ "সাধু" ইংরাজী ভাষার একটা কাঠাম দাঁড়াইয়া গিয়াছে—লিখিবার সময়ে সকলেই সচরাচর সেই ভাষাতেই লেখেন—মৌখিকের ছড়াছড়ি করেন না। ফরাসীতেও তদ্রূপ। "সাধু" ফরাসী রচনায় Parisian gamin-এর অপভাষা ব্যবহৃত হয় না, অন্য প্রদেশস্থ patois ত নহেই। খামখা ভাষায় বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিবার এই যে দুষ্প্রবৃত্তি, ইহা আমাদের বাঙ্গালীদেরই একটা একচেটিয়া বিশেষত্ব বলিয়া মনে হয়। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের সহিত আমার বাঙ্গালা ভাষা-ঘটিত আলোচনা-প্রসঙ্গে আমি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলাম, "জানি না কি অপরাধে 'সাধু' বাঙ্গালা আপনার সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা হইতে বঞ্চিত হইল। 'সাধু' বাঙ্গালা ত আর কোন অপরাধ করে নাই। বঙ্গভাষাভাষীদের নানাবিধ প্রাকৃত বুলি বা dialect-এর একটা সর্ব্বজনবোধ্য common form বা common forum সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র। এই ঐক্যসাধন-প্রচেষ্টা যে আধুনিক জন-গণ-মন-অধিনায়কদিগের বিষদৃষ্টিতে পতিত হইল, ইহা খুবই বিচিত্র বটে। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং!"

বস্তুতঃ এই "মৌখিক" বুলির সাম্প্রতিক উৎপাত যদি দূরীভূত হয়, তাহা হইলে "সাধু" বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহারে বিশেষ বিশৃঙ্খলা থাকে না। ক্রিয়াপদের ও সর্ব্বনামের রূপে ত কোনই বিশৃঙ্খলা নাই। এমন কি বিশেষ্য বিশেষণ প্রভৃতির মধ্যেও যে শব্দগুলি সংস্কৃতমূলক, তাহাদের রূপে কোন অনিশ্চয়তা নাই। শুধু সংস্কৃতেতর ভাষা হইতে আগত কিংবা খাঁটি দেশজ শব্দের বাণানে কিছু কিছু রূপান্তরের বা variant-এর ব্যবহার আছে—বাঙ্গালাতে দুই জ, দুই ন, তিন শ, এবং হ্রস্ব-দীর্ঘের উচ্চারণ প্রায় একই রকম হইয়া দাঁড়ানর ফলে ঃ যেমন, জিনিষ, জিনিস ; খুসি, খুশি ; ইত্যাদি। আমরা আজ জামশেদপুরে উপস্থিত ; কেহ হয়ত তালব্য শ দিয়া লেখেন, কেহ দন্ত্য স দিয়া। এই variant spelling-এর ব্যবহার এমন কিছু গুরুতর নহে। সংস্কৃত যে এমন কঠিন ব্যাকরণের নিগড়ে আবদ্ধ ভাষা, তাহাতেও এবংবিধ রূপান্তর বিরল নহে ; যেমন, শ্রেণী, শ্রেণি ; আবলী, আবলি ; ইত্যাদি হ্রস্ব দীর্ঘ দুই-ই হয়। এই সভাতেই হয়ত ডজন ডজন "অবনী" উপস্থিত আছেন ; কিন্তু সংস্কৃতে অবনী, অবনি, দুই-ই হয়। আমরা ছেলেবেলা "কেশরী"কে তালব্য-শ-যুক্তই জানিতাম, এখন শুনি নাকি ""কেসরী"-ও হয়। 'বশিষ্ঠ" মুনিও তথৈবচ ; পূর্ব্বে ধারণা ছিল তাঁহার দৌড় শুধুই তালব্য-শ পর্য্যন্ত, এখন শুনি মুনিঠাকুর দন্ত্য-স কেও আয়ত্ত করিয়াছেন। তালব্য-শ-

যোগে যে সমস্ত উপাদেয় খাদ্যসামগ্রীর "পরিবেশন" পূর্ব্বে হইত, এখন মূর্দ্ধন্য-ষ-যোগে "পরিবেষণ" হওয়াতেও তাহাদের উপাদেয়ত্বের কিঞ্চিন্মাত্রও হানি হয় নাই। তারপর শুনুন অতি অত্যাশ্চর্য্য বার্ত্তা। সে দিন "শব্দকল্পদ্রুম" উল্টাইতে উল্টাইতে দেখি যে জনকনন্দিনী বৈদেহী সীতা—যাঁহার নাম আশা করি আপনাদের সকলেরই সুবিদিত আছে—অবশ্য এখন পর্য্যন্ত খুবই আশা করিতে পারি, তবে ভবিষ্য প্রগতিগ্রস্ত তরুণ যুগে কি হইবে বলিতে পারি না—এমন যে সীতা, তিনিও নাকি "শীতা" রূপে অবতীর্ণ হইতে পারেন। অপরং কিংবা ভবিষ্যতি ? এই যে রূপ-বাহুল্য ইহাতে সংস্কৃত অচল বা অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া পড়ে নাই। তারপর ধরুন ইংরাজী। Axe, Ax Connection, Connexion ; Rhyme, Rime, নানাবিধ রূপই প্রচলিত। এমন কি আজ যে হাকিম সাহেব আমাদের সভাপতিরূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তিনি যখন এজলাসে বসেন, তখন বোধ করি রায় লিখিবার সময়ে judgment ও judgement উভয়বিধ বর্ণবিন্যাসই গ্রাহ্য করিয়া থাকেন—তাহাতে হুকুমের রদবদল হয় না। ইহাতে এই সহজ কথাটাই বুঝা যায় যে অল্প কিছু শব্দে যদি রূপবাহুল্য থাকেও, তজ্জন্য সাতিশয় শিরঃপীড়ার কোন কারণ নাই। এই সব বহুরূপী শব্দেরও কালক্রমে বহুস্থলেই প্রয়োগে একটাই রূপ দাঁড়াইয়া যায়। অবশ্য, এই সব স্থলে কোন একটা রূপকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা প্রশংসনীয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বড়

কথা এই যে "সাধু" বাঙ্গালা ভাষার শিষ্টপ্রয়োগে তেমন বেশী কিছু বিশৃঙ্খলা নাই ; এবং এই "সাধু" ভাষাই সচরাচর রচনাতে লেখকদিগের ব্যবহার করা উচিত।

তবে এই প্রসঙ্গে ছোট্ট একটা কথা বলা যাইতে পারে। "মৌখিক" ভাষার প্রয়োগ কোন কোন স্থলে করিলে তেমন অনিষ্ট হয় না, যেমন কথোপকথন-স্থলে। নাটক বা উপন্যাসে যেখানে পাত্রপাত্রীর কথাবার্ত্তা লিপিবদ্ধ হয়, সেখানে "মৌখিক" ভাষা ব্যবহার করিলে একটু বেশী স্বাভাবিক ও শ্রুতিমধুর হয়। সংস্কৃতেও এই রীতি অনেকটা প্রচলিত আছে। আপনারা সকলেই জানেন যে সংস্কৃত নাটকে 'যেখানে স্ত্রীলোকের এবং ইতর লোকের কথাবার্ত্তা আছে, সেখানে প্রায়শঃই প্রাকৃতের ব্যবহার ; আর যেখানে প্রধান নায়কেরা বা উচ্চশ্রেণীস্থ পুরুষেরা কথাবার্ত্তা বলেন, সেখানে সংস্কৃতের ব্যবহার। আজ এই সভায় অনেক মহিলা উপস্থিত আছেন—স্ত্রীলোক এবং ইতর লোককে এক পর্য্যায়ভুক্ত করায় তাঁহারা আমার প্রতি কুপিতা হইবেন না—দোষ আমার নহে, দোষ সেই প্রাচীন বুড়া সংস্কৃত কবিদের—তাঁহারাই এইরূপ বিধান করিয়া গিয়াছেন। বোধ করি সে আমলে feminism-এর রেওয়াজ ছিল না, তাই তাঁহারা এতটা ভরসা পাইয়াছেন। তবে কারণ যাহাই হউক, তাঁহাদের বিধানে নায়িকাদিগের শ্রীমুখ হইতে "অজ্জউত্ত" ব্যতীত "আর্য্য-পুত্র" সম্ভাষণ বহির্গত হইত না। সংস্কৃতের নজীর বাঙ্গালা নাটক-উপন্যাসেও বোধ করি চলিলে মন্দ হয় না। কিন্তু যে স্থলে

লেখক নিজে কথা বলিতেছেন, পাত্রপাত্রীদের মুখ দিয়া বলাই-তেছেন না, সেই স্থলে "সাধু" ভাষারই প্রয়োগ করা বিধেয়। আমাদের বড় বড় ঔপন্যাসিকগণ—শরৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পর্য্যন্ত—এই রীতিই অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ একটা via media বা মাঝামাঝি বন্দোবস্ত অশোভন মনে হয় না। আবশ্যক মত পাত্রপাত্রীদিগের মুখে বাঙ্গালার অন্যান্য অঞ্চলের "মৌখিক" বুলিও ব্যবহৃত হইতে পারে, এবং হইয়াও আসিতেছে। "মৌখিক" বুলির এই প্রকার সীমাবদ্ধ প্রয়োগে "মৌখিক"-এর বিশেষত্বও বেশ পরিস্ফুট হয়।

আমার বক্তব্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল। এখন বর্ত্তমানে কয়েক বৎসর ধরিয়া যে "সাধু" ভাষার বাণান-সংস্কার ও বাণান-পরিবর্ত্তনের একটা প্রয়াস দেখা দিয়াছে—বিশেষতঃ বোলপুরের বিশ্বভারতী ও গোলদীঘীর বিশ্ববিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট কতিপয় ব্যক্তির অতিরিক্ত উৎসাহের ফলে—তৎসম্পর্কে দুই একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করি। আপনারা অনেকেই বোধ করি অবগত আছেন যে যখন এই প্রচেষ্টার প্রথম উদ্ভব হয়, তখন এ বিষয়ে আমি কিঞ্চিৎ প্রতিবাদ করি। সেই বাদ-প্রতিবাদের বিস্তৃত বিবরণ মৎপ্রণীত "বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান" গ্রন্থে পাইবেন। সেই বাদ-প্রতিবাদের ব্যাপারে বন্ধুবর সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন এক পক্ষে, আমি ছিলাম বিরুদ্ধ পক্ষে। অবশ্য বলাই বাহুল্য মাত্র যে তিনি ছিলেন শুক্লপক্ষ, আমি ছিলাম কৃষ্ণপক্ষ। আমার ভয় হইতেছে যে এই ভাষাগত পক্ষাঘাতের ফলে আমার

সম্বন্ধে বোধ করি একটা prejudice-ই দাঁড়াইয়া গিয়া থাকিবে যে উঁহারা যাহাই বলুন না কেন, আমি অম্‌নি তাহার বিরুদ্ধতা করিব। সেই জন্যই এবিষয়ে কিছু বলিতে আমি একটু সঙ্কোচ অনুভব করি। সে যাহাই হউক, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমি যথাসম্ভব prejudice-বর্জ্জিত হইয়া, রাগদ্বেষবিমুক্ত হইয়া আমার বক্তব্য পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব। সংস্কারকদিগের কার্য্যকলাপে আমার প্রধান আক্ষেপ এই যে যদিও "মৌখিক" ভাষার বিষম বাণান-বিশৃঙ্খলা দূরীভূত করিবার জন্য উঁহাদের প্রয়াসের সূত্র-পাত, কিন্তু সে বিষয়ে উঁহারা বিশেষ কিছুই করিলেন না, কিংবা করিতে ভরসা পাইলেন না ; "মৌখিক" ভাষার "লাম-লেম-লুম" সবই অবাধে স্বীকৃত হইল, "মত-মতো","ভাল-ভালো", ইত্যাদিও মানিয়া লওয়া হইল ; এমন কি "কি-কী" সমস্যায় হস্তক্ষেপ করিতেও উঁহাদের সাহসে কুলাইল না। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে উঁহারা করিলেন কি ? না, "সাধু" ভাষার শব্দের সুপ্রতিষ্ঠিত বাণান পরিবর্ত্তনে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন—তখন slogan হইল "সরলী-করণ"। সেই ধাক্কায় "রাণী" হইল "রানি", "কার্য্য হইল "কার্য", "ধর্ম্ম" হইল "ধর্ম", "সর্ত্ত" হইল "শর্ত", "সৌখীন" হইল "শৌখিন", "পোষাক" হইল "পোশাক", ইত্যাদি ইত্যাদি। রেফের পরে কোন কোন ব্যঞ্জনের দ্বিত্বভাব—যাহা বাঙ্গালা ভাষাতে চিরপ্রচলিত ও ধ্বনি-সঙ্গত, এবং যাহা সংস্কৃত-ব্যাকরণানুমোদিত—তাহার উপর একেবারে উঁহারা খড়্গহস্ত হইলেন ; ফতোয়া জাহির হইল

যে আর সব সংস্কার-প্রস্তাব যদি তুলিয়াও লইতে হয়, তাহাও স্বীকার—কিন্তু রেফের পরে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব কিছুতেই চলিবে না—নৈব নৈব চ। এতাদৃশ অত্যুৎসাহের ফল যাহা হইবার তাহাই হইল; অর্থাৎ "মৌখিক" ভাষার বিশৃঙ্খলতা ত পূর্ব্ববৎ অব্যাহত রহিলই, পরন্তু "সাধু" ভাষার বাণানে যে সব স্থলে কোন অনিশ্চয়তা ছিল না, সে সব স্থলেও নূতন করিয়া বিশৃঙ্খলা আমদানী করা হইল। একেবারে 'উল্টা বুঝিলি রাম!" এখন দেখিতে পাইবেন, মাসিক-পত্রাদিতে পাশাপাশি প্রবন্ধে একটিতে চিরপ্রচলিত বাণান, অপরটিতে "নয়া" প্রস্তাবিত বাণান সমানে চলিয়াছে। "সরলীকরণ"-এর ধাক্কায় ভাষার আদ্যশ্রাদ্ধ হইতে সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত সংসাধিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এবিষয়ে আমার বক্তব্য অতি সংক্ষিপ্ত, এবং আমি আশা করি আপনারা সকলেই ইহার অনুমোদন করিবেন। আমার বক্তব্য এই। ভাষাতে যে শব্দের বর্ণবিন্যাসে কোন রূপান্তর নাই, কোনও অনিশ্চয়তা নাই, তথায় নূতন করিয়া বিকল্প বা রূপান্তর বা বিশৃঙ্খলা আনয়ন করা অবিধেয়—তা কি উচ্চারণের খাতিরেই হউক, কি সরলীকরণের খাতিরেই হউক, কি ভাষাগত ব্যুৎপত্তির খাতিরেই হউক। কারণ ভাষার প্রয়োগের বিশুদ্ধতার আর কোন theoretical test নাই—ব্যবহার-বাহুল্য (usage) ও একরূপত্ব (uniformity) ব্যতিরেকে। এমন কি, এই প্রয়োগ-বাহুল্যের ফলে অনেক ব্যাকরণ-দুষ্ট পদকেও শেষটা

নিপাতন-সিদ্ধ মনে করিয়া বৈয়াকরণিকদিগকে মানিয়া লইতে হয়—সংস্কৃতের মত rigid ভাষাতেও ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। ইংরাজীর ত কথাই নাই। এবিষয়ে আর অধিক বলা বাহুল্য মাত্র—বিষয়টি এতই সহজ এবং যুক্তি এতই সমীচীন। আশা করি, অত্যুৎসাহী সংস্কারকগণ তাঁহাদের সঞ্চিকীর্ষার বেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া অতঃপর একটু কাণ্ড-জ্ঞানের পরিচয় দিবেন।

আমার আর কিছু এপ্রসঙ্গে এখন বলিবার নাই। মাননীয় সভাপতি মহাশয় যে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমার বক্তৃতার নিমিত্ত "কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, এবং আপনারা যে অবিচলিত ধৈর্য্যসহকারে এই নীরস ভাষাতত্ত্বের সম্পর্কে হয়ত আমার নীরসতর আলোচনা এতক্ষণ ধরিয়া শ্রবণ করিয়াছেন তজ্জন্য আপনাদের প্রতি আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

১৩ই পৌষ, ১৩৪৭।

বৃহত্তর বঙ্গ

বৃহত্তর বঙ্গ

[প্রবাসী বঙ্গসাহিত্যসম্মেলনের জামশেদপুর অধিবেশনে
"বৃহত্তর বঙ্গ" শাখায় প্রদত্ত বক্তৃতা]

বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন, "হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে রাখিবে কে?" আপনাদের সমক্ষে বক্তৃতা দিতে দণ্ডায়মান হইয়া সেই কথাটিই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া আমার বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, "বন্ধুকে বন্ধু না মারিলে মারিবে কে?" আজিকার এই "বৃহত্তর বঙ্গ" শাখার সভাপতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ মহাশয় আমার পঁচিশ বৎসরের বন্ধু; তাই তিনি তাঁহার অতীব ওজস্বিনী ভাষায় ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতার পরে আমাকে এই বক্তৃতামঞ্চে সংএর মত দাঁড় করাইয়া দিয়া বন্ধুরই কাজ করিয়াছেন। ঠিক জানি আমার বর্ত্তমান এই দুরবস্থা বন্ধুবর কায়মনোবাক্যেই উপভোগ করিতেছেন; কারণ

জার্ম্মাণ দার্শনিক মানব-চরিত্রবিৎ শোপেনহাউয়ার ঠিকই বলিয়াছেন, "Our sincerest pleasures are at the misfortunes of our friends"! যাক্, সে দুঃখের কথা আর বাড়াইয়া লাভ কি?

কবি শেক্স্পীয়ার একটা কথা নাকি বলিয়া গিয়াছেন, "What's in a name? that which we call a rose, By any other name would smell as sweet!" কিন্তু কবিবাক্য হইলেও কথাটা আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় না। কারণ প্রকট দেখিতেছি। আপনারা সকলেই বোধ করি সেই সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকটি জানেন:

উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ॥

আমাদের আজিকার সভাপতির নাম যদি কালিদাস না হইত, তবে কি তিনি এই মাত্র আপনাদের সমক্ষে যে বিরাট্ উপমার অবতারণা করিয়াছেন, তাহা করিতে পারিতেন? একমাত্র কালিদাসেই এত বড় ব্যাপক উপমা সম্ভবে। তিনি বাঙ্গালী জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাসকে একেবারে মহাভারতের সহিত তুলিত করিয়াছেন; এবং শুধু তুলিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সেই মহাভারতের আদিপর্ব্ব হইতে সুরু করিয়া সভাপর্ব্ব-উদ্যোগপর্ব্বের মধ্য দিয়া শান্তিপর্ব্ব পর্য্যন্ত টানিয়া আনিয়া তবে ছাড়িয়াছেন। মহেঞ্জোদড়ো হইতে মন্‌খ্মের পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিরাট্ পটভূমিকায় প্রসারিত করিয়া কালিদাস

বাবু প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজিকার সমরোত্তর যুগ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী জাতির ঐতিহ্য, তাহার নৃ-তত্ত্ব, তাহার সমাজ-ব্যবস্থা, তাহার রাষ্ট্র-সমস্যা ইত্যাদির আলোচনা করিয়াছেন। দ্রাবিড়-মঙ্গল-আর্য্যজাতির বিচিত্র সংমিশ্রণে ও ঘাত-প্রতিঘাতে ভারতের এই প্রাচ্য প্রদেশে যে একটি বিশিষ্ট ভাবপ্রবণ তীক্ষ্ণধী জাতি সুদূর অতীত কাল হইতে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে, বন্ধুবর সেই জাতির বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াসে হাম্মুরাবির অনুশাসন হইতে আরম্ভ করিয়া মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

তিনি ত এই পর্য্যন্ত কার্য্য সমাধা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে আসন গ্রহণ করিয়াছেন। এখন আমি করি কি? কালিদাস বাবু ত কৌশলী লোক, তাই তিনি মহাভারতের ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-শল্য-পর্ব্ব প্রভৃতি যুদ্ধপর্ব্বের ধার দিয়াও যান নাই—সুনিপুণ ভাবে এড়াইয়া গিয়াছেন। কারণও অবশ্য যথেষ্ট আছে। একদিকে রহিয়াছেন মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং, অপর দিকে রহিয়াছে সরকারী Defence of India Act; সুতরাং ওসব হিংসাত্মক ব্যাপার লইয়া নাড়াচাড়া করা বিপজ্জনক। আমিও মহাজনপন্থা অবলম্বন করিয়া উহা এড়াইয়া যাওয়াই নিরাপদ্ মনে করি। তবে আমার এই অসহায় অবস্থায় সহায় একমাত্র ভগবান্ বেদব্যাস। ভগবান্ বেদব্যাসের পরমায়ু অক্ষয় হউক! তিনি মহাভারত রচনা করিতে গিয়া শান্তিপর্ব্বেই শান্তিবাচন করিয়া কাজে ইস্তফা দেন নাই, আরও কয়েকখানি পর্ব্ব রচনা

করিয়া গিয়াছিলেন—তাই রক্ষা। তবে তাহার সবগুলির বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক করে না।

মনে করুন, মুষলপর্ব্ব। তা বাঙ্গালা মুল্লুকে আমার পরম-শ্রদ্ধাস্পদ পিতৃবন্ধু মাননীয় ফজ্‌লুল হক্ সাহেব যে মুষল চালাইতেছেন, তার পর বোধ করি আর ওবিষয়ে বেশী কিছু বলা বাগ্বাহুল্য মাত্র। আর বাঙ্গালার বাহিরেও আপনাদের এই বৃহত্তর বঙ্গের বিহার-প্রদেশে মাননীয় শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মুষল-প্রয়োগও বাঙ্গালীদিগের উপর নেহাৎ কম নহে। তবে শুনিলাম যে তিনি নাকি সম্প্রতি বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ রাজকীয় অতিথিশালায় আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন—মহাত্মাজীর প্ররোচনায়—তাই রক্ষা ; নচেৎ আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে আপনারা আজ তাঁহার রাজত্বে জামশেদপুরে বাঙ্গালীদের এই বিপুল কলরবের সৃষ্টি করিতে পারিতেন কিনা ; এবং আমি নিজেও হয়ত কৃষ্ণপ্রাপ্তির ভয়ে এতদূর পর্য্যন্ত অভিযান করিতে সাহসী হইতাম না। সুতরাং মুষল-পর্ব্বের বিস্তৃত আলোচনার আবশ্যকতা দেখিনা।

তারপর ধরুন, স্ত্রীপর্ব্ব। আজকাল feminism-এর যুগ ; প্রাচীনেরা যাই বলুন না কেন, স্ত্রীনায়ক শিশুনায়ক সমাজের সম্বন্ধে যতই কেন কটূক্তি করুন না, বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এখন শিশুনায়ক স্ত্রীনায়কের ছড়াছড়ি—স্ত্রীনায়িকা ত আছেই। এমত অবস্থায় আমাহেন নিরীহ নেহাৎ পুরুষ মানুষের স্ত্রীপর্ব্বের বিষয়ে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে সাহসে কুলাইতেছে না।

তারপর রহিল মহাপ্রস্থান ও স্বর্গারোহণপর্ব্ব। বাঙ্গালী যে আজ প্রায় মহাপ্রস্থানের পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং স্বর্গারোহণও যে তাহার অবিলম্বেই প্রত্যাসন্ন, এবিষয়ে বোধ করি আজ আর বিশেষ মতভেদের অবকাশ নাই ; সুতরাং আমার বলার বিশেষ কোন অপেক্ষা রাখে না।

তবে আমি বলি কি ? ভাবিয়া দেখিলাম যে আর একটি পর্ব্ব রহিয়াছে—সৌভাগ্যক্রমে সভাপতি মহাশয়ের শ্যেনচক্ষু সেদিকে পতিত হয় নাই—সে পর্ব্বটি অশ্বমেধপর্ব্ব। সে বিষয়ে বলিতে কোন বাধাও দেখি না—কারণ সেটা ঘোড়দৌড়-বিষয়ক ; সরকার সেটা নিষেধ করেন নাই, এবং গান্ধীজীও যে এবিষয়ে কোন ফতোয়া দিয়াছেন এমন ত মনে পড়ে না। সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া এই অশ্বমেধ-পর্ব্বেরই কিঞ্চিৎ আলোচনা আমি করিতে প্রয়াস পাইব।

অশ্বমেধপর্ব্ব জয়যাত্রার পর্ব্ব। পাণ্ডুপুত্রগণ কুরুক্ষেত্রের সুদুস্তর সমরসাগর উত্তীর্ণ হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ হইলে পর আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত জয়যাত্রা করিয়াছিলেন—অশ্বমেধ সেই জয়যাত্রারই প্রতীক। আমিও আপনাদিগের নিকট বাঙ্গালীর জয়যাত্রার কাহিনী কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিতে চাই। কালের বিচিত্র গতিতে কি রকমে ধীরে ধীরে বাঙ্গালাতে একটা বলিষ্ঠ স্বপ্রতিষ্ঠ সমাজ ও জাতি গড়িয়া উঠিল, তাহার বিবরণ কালিদাস বাবু বিস্তৃতভাবে আপনাদিগকে দিয়াছেন। সেই স্বপ্রতিষ্ঠ সমাজ ও জাতি কি

প্রকারে পাশ্চাত্য জাতির সংস্রবে আসিয়া নূতন আলোক-সম্পাতে নববলে বলীয়ান্ হইয়া বাঙ্গালাদেশ হইতে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষে নিজেদের প্রভুত্ব—নৈতিক প্রভুত্ব, চারিত্রিক প্রভুত্ব, সাংস্কৃতিক প্রভুত্ব—বিস্তার করিয়াছিল অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে—তাহারই কিঞ্চিৎ বিবরণ আমি বিবৃত করিতে চাই। আশা করি আপনারা অধৈর্য্য হইবেন না।

বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যের বিবরণ কালিদাসবাবু কিঞ্চিৎ দিয়াছেন। এবিষয়ে আমি তাঁহার সঙ্গে একমত। সত্যসত্যই ভারতীয় সমাজের মধ্যে বাঙ্গালীর একটা বিশিষ্টতা, একটা স্বতন্ত্রতা আছে। ইহা শুধু একটা অহমিকার কথা নহে; ইহা ঐতিহাসিক সত্য। আপনারা সকলেই জানেন যে অতি প্রাচীন যুগে ভারতের এই অতি প্রাচ্য প্রদেশে বঙ্গ ও মগধ প্রভৃতিতে আর্য্য প্রভাব অতি অল্পই ছিল। এই সব অঞ্চলেব অধিবাসীদিগকে “প্রাচ্যাঃ” (মেগাস্থিনিসের “Prasii”) এই আখ্যায় অভিহিত করা হইত—যেমন কতকটা আজও রাঢ় অঞ্চলের লোকেরা পূর্ব্বাঞ্চলের লোকদিগকে “বাঙ্গাল” বলিয়া নাসিকাকুঞ্চন করিয়া থাকেন। কথাটা ঘৃণাব্যঞ্জক। ঐতরেয় আরণ্যকে লেখাই আছে “বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ” অর্থাৎ বঙ্গ ও মগধ ইত্যাদির লোক পাখীর ন্যায়। বস্তুতঃ এই সুদূর অনার্য্য-অধ্যুষিত অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-সমতট অঞ্চলকে উত্তম-পশ্চিম ভারতবর্ষে অবস্থিত আর্য্যগণ কতকটা ঘৃণার চক্ষেই দেখিতেন;

এই সব অঞ্চল বিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞানও ছিল যৎসামান্য—terra incognita বলিলেই হয়। তাই এই সব পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে আসিলে আর্য্যদিগকে "পতিত" হইতে হইত। এই ছিল গোড়াকার অবস্থা।

কিন্তু ধীরে ধীরে যখন আর্য্য-উপনিবেশের ও সভ্যতার বিস্তার ক্রমশঃ প্রাচ্যদেশে উপনীত হইল, তখন পূর্ব্বের অজ্ঞতাজনিত অবজ্ঞা যতই থাকিয়া থাকুক, প্রাচ্যদিগের বৈশিষ্ট্য ও বীরত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের খুব সুস্পষ্ট জ্ঞান ও সম্ভ্রমই জন্মিল। রঘুর দিগ্বিজয়-কাহিনীতে বর্ণিত আছে যে বঙ্গদেশীয় ভূপতিগণ বিপুলবিক্রমে রণতরীযোগে রঘুর সৈন্যবাহিনীর সহিত নৌযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—কালিদাস "নৌসাধনোদ্যতান্ বঙ্গান্" বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। পাণ্ডবদিগের অশ্বমেধ-অভিযানের সময়েও দেখিতে পাই যে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন একস্থানে মাত্র পরাভূত হইয়াছিলেন—সেও প্রাচ্যদেশে মণিপুরের বভ্রুবাহনের নিকট। গ্রীকদিগের বর্ণিত Gangaridae বা গঙ্গারাঢ়গণ অর্থাৎ গঙ্গাতীরবর্ত্তী রাঢ় বা বঙ্গের অধিবাসিগণের কার্য্যকলাপ ও শৌর্য্যবীর্য্য মগধপ্রভুত্বের যুগেও ভারতে সুবিদিত ছিল।

বাঙ্গালার রাজপুত্র বিজয়সিংহ কর্ত্তৃক সিংহলবিজয়ের কিংবদন্তী সকলেই অবগত আছেন। এই কিংবদন্তীর মূলে ঐতিহাসিক সত্য কতটা নিহিত আছে তাহা আমাদের সভাপতি মহাশয়ের ন্যায় ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিতগণই নিরূপিত করিতে পারেন; কিন্তু একথা অক্লেশে বলা যাইতে পারে যে এই কিংবদন্তীর

মূলে বাঙ্গালীর নৌবিদ্যায় পারদর্শিতা এবং naval traditions নিহিত রহিয়াছে। এই tradition বা খ্যাতির আর একটা নিদর্শন চাঁদ সদাগরের চৌদ্দডিঙ্গা মধুকরের কাহিনী। তাম্রলিপ্তি হইতে ফাহিয়ান যে অর্ণবপোতে সমুদ্র-যাত্রা করিয়া সুমাত্রা, যবদ্বীপ, চম্পা উত্তীর্ণ হইয়া মহাচীনে গমন করিয়াছিলেন, বঙ্গীয় নাবিক যে তজ্জাতীয় পোত চালনা করিত তাহা নিঃসন্দেহ। মধ্যযুগ ও মুসলমান-যুগের মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর এই naval tradition সমানভাবে চলিয়া আসিতেছে। আজিও ব্রিটিশ বাণিজ্যপোত-সমূহের ভারতীয় নাবিক-দিগের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গীয় লস্করগণই সংখ্যাবহুল। বস্তুতঃ দাদাজী আংগ্রিয়ার নেতৃত্বে ছত্রপতি শিবাজী যে মারাঠা নৌবাহিনী গঠিত করিয়াছিলেন, সেই দৃষ্টান্ত বাদ দিলে সমগ্র ভারতবর্ষে বোধ করি নৌবিদ্যার সাধনায় বাঙ্গালীর সমকক্ষ আর কেহই নাই। আপনারা হয়ত শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে আমাদের বরিশাল জেলায় বহু সম্ভ্রান্ত কায়স্থ-পরিবার আছেন, যাঁহাদের উপাধি "মীর-বহর" অর্থাৎ Admiral of the Fleet—সম্ভবতঃ মোগল আমলে পদ্মা-মেঘনা-বঙ্গোপসাগরে নৌবাহিনী পরিচালনার নিদর্শন। কবির বিশেষণ বৃথা হয় নাই যে, বঙ্গীয়গণ নৌসাধনোদ্যত। এটা সত্যই বাঙ্গালীর একটা বিশেষত্ব—এই সুজলা সুফলা নদী-বহুলা amphibious বঙ্গ-ভূমির পক্ষে স্বাভাবিকও বটে।

স্থলযুদ্ধেও বাঙ্গালীদের শৌর্য্যের যে বিশেষ কোন ন্যূনতা ছিল তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই ; কারণ বিশাল মগধ-সাম্রাজ্যের পতনের পর বঙ্গে যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছিল, ক্রমে ক্রমে সেই রাষ্ট্র উত্তর-ভারতের এক পরাক্রান্ত রাষ্ট্রেই পরিণত হইয়াছিল। পঞ্চগৌড়েশ্বর পরমভট্টারক সম্রাট্‌ ধর্ম্মপাল উত্তর-ভারতে রীতিমত সাম্রাজ্যই স্থাপন করিয়াছিলেন। অবশ্য এবিষয়ে বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্যের কোন দাবী করা চলে না, কারণ সাময়িকভাবে সাম্রাজ্য স্থাপন ভারতবর্ষে বহু জাতিই করিয়াছে।

কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা ছাড়িয়াই দিই। জ্ঞানের ক্ষেত্রে, ধর্ম্মের ক্ষেত্রে, culture-এর ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যের কথাই সংক্ষেপে বলি।

পালবংশীয় বৌদ্ধ সম্রাট্‌গণের শাসনকালেই বোধ করি বৌদ্ধপ্রভাব—বিশেষতঃ মহাযান ধর্ম্মের প্রভাব—বঙ্গে বিশেষ বিস্তৃত হইয়াছিল। এই প্রভাবের বহু নিদর্শন পরবর্ত্তী বাঙ্গালায় পাওয়া যায়—ধর্ম্ম-ঠাকুরের পূজা প্রভৃতি সেই বৌদ্ধ প্রভাবেরই চিহ্ন। কিন্তু এই মহাযান-ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা বড় রকমের যে ছাপ রাখিয়া গিয়াছে বঙ্গীয় সমাজে—সেটা হইল বৌদ্ধ প্রভাবিত শৈব ও তান্ত্রিকধর্ম্মের প্রতিষ্ঠায়। সমাজতাত্ত্বিকদিগের এটা বড় একটা গবেষণার বিষয়—মহাযান-মতের সহিত তন্ত্রোক্ত শৈব ও শাক্তধর্ম্মের সম্পর্ক কতটুকু। কিন্তু তদ্বিষয়ে সিদ্ধান্ত যাহাই হউক, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে বঙ্গদেশে ও বঙ্গীয়-সমাজে

তন্ত্রপ্রচারিত ধর্ম্ম ও আচারের প্রভাব অসামান্য। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, গৃহে গৃহে, মহিষমর্দ্দিনী দুর্গারূপে শক্তিপূজা বাঙ্গালায় যে ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, সমগ্র ভারতে আপামর-জনসাধারণের দ্বারা সে ভাবে কোথাও অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া আমার জানা নাই। একমাত্র মহীশূরে চামুণ্ডা দেবীর অনুরূপ পূজা দেখিয়াছি, তবে তাহাও স্বয়ং মহারাজেরই পূজা—ঘরে ঘরে পূজা হয় বলিয়া শুনি নাই। তন্ত্রোক্ত আচার-অনুষ্ঠান এবং শক্তিপূজা বাঙ্গালার এক বিশেষত্ব।

সমাজ-গঠন ও বন্ধনের ক্ষেত্রেও বাঙ্গালার বিশিষ্টতা কম নহে—সেটি বাঙ্গালার কৌলীন্যপ্রথা। কৌলীন্যপ্রথা পরবর্ত্তী কালে অনেক দোষে দোষী হইয়া থাকিতে পারে—কোন্ প্রথারই বা কালক্রমে ব্যভিচার হয় না? কিন্তু যে আদর্শে মহারাজ বল্লাল সেন এই প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা অতীব উচ্চ আদর্শ। কুলীনের লক্ষণ বোধ করি আপনাদের মনে আছে ঃ

আচারো বিনয়োবিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো.দানং নবধা কুললক্ষণম্॥

যাহাকে বলে aristocracy of talent and character —জগদ্বরেণ্য মনীষী প্লেটোর Republic-এ কল্পিত—a State governed by wise men! আজ বিদ্রূপ করিয়া "কুকর্ম্মেতে লীন" ব্যাসবাক্য-সহযোগে "কুলীন" শব্দটি নিষ্পন্ন করিতে পারি; কিন্তু সেটা শুধু ব্যঙ্গের কথামাত্র। কিন্তু বস্তুতঃ শীলের

উপরই কুল নির্ভর করে, মহত্ত্বের উপরই শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি, সচ্চরিত্রই সমাজপতিত্বের মুলীভূত উপাদান—এই আদর্শে কার্য্যতঃ সমাজ-গঠন করিবার প্রচেষ্টা বাঙ্গালীর চিত্তেই স্থান পাইয়াছিল এবং বহুল পরিমাণে সাফল্য-মণ্ডিতও হইয়াছিল।

আর এক দিক্ ধরুন। ভারতীয় হিন্দু সমাজবিধি মোটামুটি ভাবে মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র ও সংহিতাদির উপরই প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু এ বিষয়েও ভারতের অন্যত্র অবস্থিত হিন্দুসমাজ হইতে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ মিতাক্ষরা-বিধি দ্বারা শাসিত। বঙ্গীয় প্রদেশ জীমূত-বাহনের দায়ভাগ-বিধি দ্বারা শাসিত। এই প্রভেদের মূলীভূত কারণ বঙ্গদেশে গোষ্ঠীর অপেক্ষা ব্যষ্টির উপরে প্রসক্তি, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। বাঙ্গালার জাতীয় ইতিহাসে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিস্বাধীনতার উপরে ঝোঁকের বহু নিদর্শন পাইবেন।

তারপর ধরুন নব্যস্মৃতি—যে স্মৃতি রঘুনন্দনের নামের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। নব্যস্মৃত্যুক্ত অনুশাসন দ্বারা বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ মধ্যযুগের বিষম মুসলমান উপপ্লবের মধ্যেও আপনার অস্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠা অব্যাহত রাখিয়াছে, এবং আজ পর্য্যন্ত এই অনুশাসনই বাঙ্গালার সমাজগঠনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিতেছে। এই অনুশাসনের ফলে সমাজের বিধি-ব্যবস্থা কঠিনাকার ধারণ করিয়াছিল সত্য; কিন্তু কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় সেই কাঠিন্যের আবরণের অন্তরালে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংহত

করিয়া—"কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ"—তৎকালীন প্রলয়-দুর্য্যোগের মধ্যেও বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিল। তৎকালে এই কঠিন বর্ম্মের উপযোগিতা যে কতটা ছিল, তাহা বর্ত্তমানে বঙ্গীয় সমাজের শ্লথতা, তরলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার উদ্দাম লীলার দিকে নেত্রপাত করিলেই অতি সুষ্ঠুভাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে। সময়ে সময়ে মনে হয় আত্মমর্য্যাদাহীন, আত্ম-বিশ্বাসহীন বর্ত্তমান বাঙ্গালার হিন্দু-সমাজের দুর্দ্দম "প্রগতি" বা শোচনীয় অধোগতির স্রোত রোধ করিতে নয়া রঘুনন্দনেরই আবির্ভাব আবশ্যক—নহিলে এ যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবে কে? ভারতীয় হিন্দু সভ্যতার সংস্কৃতির আচারের সমুদয় অবদানই যে নিশ্চিহ্নভাবে ধুইয়া মুছিয়া যাইবার উপক্রম! যাক্, যা বলিতেছিলাম। রঘুনন্দনের নব্যস্মৃতি বাঙ্গালীর সামাজিক দূরদর্শিতার একটা প্রকাণ্ড নিদর্শন।

বাঙ্গালীর মনীষার অপর নিদর্শন নব্যন্যায়। কথিত আছে যে মিথিলায় গমন করিয়া পক্ষধর মিশ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বাসুদেব সার্ব্বভৌম সমস্ত ন্যায়শাস্ত্র মুখস্থ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং তৎপরে ভাগীরথীতীরে নবদ্বীপে ন্যায়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য রঘুনাথ সেই বিদ্যার যে চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি পণ্ডিত-সমাজকে চমৎকৃত করিয়া দেয়।

সাহিত্য ও শিল্পকলার দিক্ দিয়াও বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য ছিল। —সাহিত্যে এক প্রকার রচনারীতি গৌড়ীর রীতি বলিয়াই

আখ্যাত হইত। স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্যেও বঙ্গীয় শিল্পীর এক বিশিষ্ট গঠনরীতি ও শিল্পাদর্শ ছিল।

তারপর বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান—ভারতের ধর্ম্ম-জগতে—গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। ভাবপ্রবণ প্রেমিক বাঙ্গালী প্রকৃতি এই ধর্ম্মপ্রেরণায় উৎকর্ষের চরমে পৌঁছিয়াছিল। বৈষ্ণব ধর্ম্ম আজিকার নয়; বৃন্দাবনে যমুনাপুলিনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কবে লীলাখেলা করিয়াছিলেন, কবে কোন্ সুদূর অতীতে শ্যামের বাঁশরীতে যমুনা উজান বহিয়াছিল, গোপীগণ আত্মহারা হইয়াছিল, ইতিহাসজ্ঞের তাহা বিচার্য্য—কিন্তু নিঃসন্দেহে সে অতি প্রাচীন যুগের কথা। শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহ্যের সহিত জড়িত "ভাগবত" ধর্ম্মের ধারা বহুকাল হইতে ভারতীয় সমাজে চলিয়া আসিতেছিল—মহাভারতে ইহার বর্ণনা আছে। বেশনগরে আবিষ্কৃত গ্রীক-নৃপতি Heliodorus-এর গরুড়স্তম্ভ শ্রীকৃষ্ণোপাসনার এক অতি প্রাচীন চাক্ষুষ নিদর্শন। কিন্তু সেই ভক্তিধর্ম্মের ধারা নানা যাগ-যজ্ঞ, পূজা-প্রতিষ্ঠান, বৌদ্ধ-শাক্ত-তান্ত্রিক আচারের উষর মরুভূমিতে একরকম লুপ্তই হইয়া গিয়াছিল বলিলে হয়। কিন্তু কবির সেই কথাই বাঙ্গালার বুকে সত্য হইয়া উঠিল:

> "যে নদী মরুপথে হারাল ধারা
> জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।"

বাঙ্গালার শান্ত শীতল সরস বক্ষে সেই লুপ্তপ্রায় ধারা পুনরায় উৎসারিত হইয়া উঠিল। জয়দেবের কোমলকান্ত পদাবলীর মধ্য

দিয়া প্রস্তুত হইয়া বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের ভাবোদ্বেল আবেগোচ্ছল ভক্তিধারার সহিত সম্মিলনে সমৃদ্ধ হইয়া, সেই ভাগবতী ধারা ভাগীরথীতীরে পুণ্যভূমি নবদ্বীপে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের উন্মত্ত ভাবগঙ্গায় বিলীন হইয়া গিয়া যে প্রেমভক্তির বন্যায় সমাজকে প্লাবিত করিয়া ফেলিল, তাহা অবর্ণনীয়। সেই প্রেমভক্তির উচ্ছ্বাস শ্রীচৈতন্যকে ঘরছাড়া করিল, বাড়ীছাড়া করিল, দেশত্যাগী করিল। সেই উচ্ছ্বাসের তরঙ্গ তাঁহাকে দিকে দিকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল—নীলাচলে লইয়া গেল, সমস্ত দক্ষিণ ভারত অতিক্রম করিয়া পাণ্ড্য-কেরল-কুমারিকা পর্যান্ত লইয়া গেল, আবার ঢেউ ফিরাইয়া কঙ্কণ-সহ্যাদ্রি-দণ্ডকারণ্য-বিন্ধ্যগিরি অতিক্রম করিয়া শেষে যমুনাতটে বৃন্দাবনে আনিয়া আছড়াইয়া ফেলিল। সহস্র সহস্র বৎসর পরে আবার প্রেমতরঙ্গে যমুনাবক্ষ টলমল করিতে লাগিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম উত্তর-ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইল। মহাপ্রভু এক জ্যোৎস্না-পুলকিত পৌর্ণমাসী নিশিতে শ্রীক্ষেত্রের সমুদ্রতটে মহাসাগরে বিলীন হইলেন—the deep called unto the deep ; কিন্তু যে প্রেমধারা তিনি প্রবাহিত করিয়া গেলেন, সমৃদ্ধবেগে সে ধারা—বাঙ্গালার প্রাণের অনবদ্য সেই রসধারা—সমগ্র ভারতের বক্ষকে স্নিগ্ধ রসসিক্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। অধ্যাত্মজগতে ভারতবর্ষকে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর এই শ্রেষ্ঠ দান।

যাক্, এবিষয়ে আর বেশী কিছু বলিতে চাহি না। বাঙ্গালীর প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইতিহাসে অনেক কিছু গৌরব করিবার

সামগ্রী আছে—তাহার অতি যৎসামান্যই কিছু উল্লেখ করিলাম। আচার্য্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন, বাঙ্গালী এক আত্মবিস্মৃত জাতি। আজ সেই আত্ম-বিস্মরণের যবনিকা অপসারণের সময় আসিয়াছে। আশা করি মদপেক্ষা যোগ্যতর নিপুণতর ব্যক্তিগণ সেই মহৎ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবেন। আমি এখন শুধু বর্ত্তমান ব্রিটিশ যুগে বাঙ্গালীর কার্য্যকলাপের বিবরণ কিছু বর্ণনা করিতে চাই।

বিধাতার আশীর্ব্বাদে ভারতবর্ষের বহু স্থানে আমি বিচরণ করিয়াছি। বন্ধুবর কালিদাস বাবুর মত আমি ভূপ্রদক্ষিণ করি নাই বটে, তবে ভারতভূমি—এমন কি আ-"ব্রহ্ম"-স্তম্ব পর্য্যন্ত—প্রদক্ষিণ করিয়াছি বলিয়া দাবী করিতে পারি। যাহাকে বক্তৃতার ভাষায় বলা হয়—হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত—তাহা literally আমি ভ্রমণ করিয়াছি। বস্তুতঃ কাশ্মীর হইতে কেরল পর্য্যন্ত, চট্টগ্রাম হইতে চামান পর্য্যন্ত, মান্দ্রাজ হইতে মৌলমেন পর্য্যন্ত আমার গতিবিধি হইয়াছে। এস্থলে আমার এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তের কাহিনী উপস্থিত করিবার কারণ এই যে, ভারতের ও ব্রহ্মদেশের যে সব নানাস্থানে আমি পর্য্যটন করিয়াছি, তাহার প্রায় অধিকাংশ স্থলেই আমি বাঙ্গালীর সন্ধান পাইয়াছি। শুধু সন্ধান পাইয়াছি বলিলে ঠিক হয় না—বহুস্থলেই বাঙ্গালীদিগকে অতি সম্ভ্রান্তভাবে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া হৃষ্ট হইয়াছি। আজ শুনিতে পাই বাঙ্গালীকে নাকি কেহ দেখিতে পারে না—সর্ব্বত্রই নাকি anti-Bengalee

crusade—তৎসত্ত্বেও নানাস্থানে বাঙ্গালীকে সগৌরবে আজও অধিষ্ঠিত থাকিতে দেখিয়া সত্যই আনন্দে হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে ত অবশ্য বাঙ্গালীর ইহা অপেক্ষাও বেশী প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। যে বৃহত্তর বঙ্গের সমস্যার আলোচনায় আজ আমরা নিযুক্ত, বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীদের উপনিবেশগুলিই ত সেই বৃহত্তর বঙ্গ।

বর্ত্তমান যুগের এই বৃহত্তর বঙ্গের উৎপত্তির কারণ কি? এবং কখন হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল? প্রাগ্-ব্রিটিশ যুগেও নানাস্থানে অবশ্য বাঙ্গালীর গতিবিধি ছিল; কিন্তু তখন যানবাহনের অসুবিধার জন্য দূরদেশে বেশী লোক যাইত না, তীর্থযাত্রাদি উপলক্ষ্যেই যা কিছু যাতায়াত ছিল; খুব বেশী পরিমাণে বহুসংখ্যক বাঙ্গালী পরিবার বিদেশে বোধ করি বসবাস করিত না। অন্ততঃ আজ যে আকারে এবং যে কারণে নানাস্থানে বাঙ্গালীর বসতি হইয়াছে, তাহার উদ্ভব ব্রিটিশ যুগেই হইয়াছে। এবং তাছাড়া, ব্রিটিশ শাসন ও সভ্যতার সংস্পর্শ খুব বেশী পরিমাণে বাঙ্গালীই সর্ব্বাগ্রে প্রাপ্ত হওয়ায় পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষায় ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালীই অগ্রণী হইয়াছে। তাই আমি ব্রিটিশ যুগের বাঙ্গালীর জয়যাত্রার বিবরণই বর্ণনা করিব।

আপনারা সকলেই জানেন যে যদিও সুরাট, মান্দ্রাজ, মসুলিপত্তন প্রভৃতি স্থানে ইংরাজদিগের কুঠি স্থাপিত হইয়াছিল বঙ্গে ইংরাজ আগমনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—কিন্তু

তথাপি নানা ঐতিহাসিক কারণ বশতঃ ব্যাপকভাবে ইংরাজ-শাসনের প্রতিষ্ঠা প্রথমতঃ বঙ্গদেশেই হইয়াছিল। বাঙ্গালায় পলাশীর যুদ্ধে অপদার্থ নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয় ও পলায়নের ফলে কার্য্যতঃ বাঙ্গালার রাজদণ্ড ইংরাজদিগের হাতে আসিয়া পড়ে; নবাব মীরকাশিম কিছুদিন বীরবিক্রমে সেই রাজদণ্ড শিথিল করিতে প্রয়াস করিয়া অবশেষে পরাভূত হন; বক্সারের যুদ্ধে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার পরাজয়ে প্রাচ্য ভারতে ব্রিটিশ শক্তি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে; এবং তৎপরে দিল্লীর মোগল বাদশাহ শাহ আলমের নিকট হইতে ইংরাজ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করিয়া রীতিমত রাজ্যশাসনে ব্যাপৃত হয়। ১৭৫৭ হইতে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ঘটনাবহুল আট বৎসর কালের মধ্যেই বাঙ্গালাদেশে ইংরাজ-শাসনের প্রতিষ্ঠা। এখন হইতে ইহা প্রায় ১৮০ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। সেই হইতেই পাশ্চাত্যের সহিত বাঙ্গালীর সাক্ষাৎ সম্পর্ক।

কিন্তু সমগ্র ভারত ধরিতে গেলে, ইংরাজের সম্পর্ক অনেক পরে আসিয়াছে—বহু যুদ্ধ বিগ্রহের পরে। বহু মারাঠা যুদ্ধ, শিখ যুদ্ধ, গুর্খা যুদ্ধ, এবং সর্ব্বশেষে সিপাহী বিদ্রোহের পরে ঠিক বলা যাইতে পারে সমগ্র ভারতে ইংরাজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন—১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে। বড়লাট ডালহৌসীর আমলে Sir Charles Wood-এর Education Despatch-এর নির্দ্দেশানুসারে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয় প্রথম ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে। রেল লাইন প্রভৃতি স্থাপনও প্রায় এই সময় হইতে আরম্ভ হয়। বস্তুতঃ আমরা যে আধুনিক যান্ত্রিক-শৃঙ্খলাবদ্ধ পাশ্চাত্য সভ্যতালোকিত ভারতবর্ষের কাঠাম দেখিতে পাইতেছি, তাহার সূচনা হয় সিপাহী বিদ্রোহের পরে। আজ হইতে মাত্র প্রায় ৮০ বৎসরের কথা। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এমন অনেক লোক আজও জীবিত রহিয়াছেন। সুতরাং মোটামুটি ধরিলে বাঙ্গালা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে পাশ্চাত্যের সম্পর্কে আসিয়াছে।

ইংরাজ শুধু বাঙ্গালা অধিকার ও শাসন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; ঘটনাচক্রের সমাবেশে বাঙ্গালা দেশকেই base বা কেন্দ্রভূমি করিয়া ইংরাজ ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতে প্রভাব ও পরিশেষে রাজত্ব বিস্তার করিতে থাকে। সে এক অতি বিচিত্র কাহিনী। সে রাজ্যবিস্তার কখনও প্রতিহত হয় নাই; কোম্পানীর মুল্লুক বাড়িয়াই চলিয়াছে; দূরদর্শী পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ বলিয়া গিয়াছেন, "সব লাল হো যায়েগা।" এই অপ্রতিহত রাজ্যবিস্তারের কারণ কি? সামরিক অপেক্ষা নৈতিক কারণই বেশী। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর সমুদায় অষ্টাদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া যে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, হানাহানি সমগ্র ভারতময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, জনগণ তাহাতে একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল—"মগের মুল্লুক" "বর্গীর হাঙ্গামা" প্রভৃতি প্রবচন সেই প্রচণ্ড আপ্লাবের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি

মাত্র। কিন্তু ব্রিটিশ কোম্পানী যেস্থানেই অধিকার করিতে লাগিল, সেস্থানেই সুশৃঙ্খল শাসনপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া শান্তি স্থাপিত করিল; লোকে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, বলিতে লাগিল, কোম্পানীর মুল্লুকের মত আর মুল্লুক হয় না। সত্য কথা বলিতে কি, লোকে আবাহন করিয়া যেন Pax Britannica-র প্রসার কামনা করিতে লাগিল। আজ হয়ত সে যুগের ভীষণ অবস্থা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না; সেই ত্রস্ত ক্ষুব্ধ আতঙ্কিত যুগের পর শত বর্ষেরও অধিক কাটিয়া গিয়াছে; তথাপি আপনারা লক্ষ্য করিবেন যে শত স্বরাজ-আন্দোলনের তীব্রতা সত্ত্বেও ব্রিটিশ অধিকার হইতে দেশীয় রাজন্যদিগের অধিকারে কোন অঞ্চল ফিরিয়া যাইবার প্রস্তাব হইলেই তুমুল কলরব ও প্রতিবাদ উত্থিত হয়। শান্তি, সুশৃঙ্খলা ও নিরুপদ্রবের আকর্ষণ এতই প্রবল।

যাক্, এই নানাবিধ কারণের সমাবেশে, নৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামরিক ঘটনাপরম্পরার ফলে—ইংরাজের প্রভাব ধীরে ধীরে ভারতের নানাদিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীরাও সেই সব দিকে যাইতে লাগিল—নানা কারণে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মচারী ভাবে যাইতে লাগিল; রসদ বিভাগে, হিসাব বিভাগে, ডাক বিভাগে, ইত্যাদিতে কেরাণী ভাবে যাইতে লাগিল; ব্যবসায়ী হিসাবেও যাইতে লাগিল। তারপর যখন এক এক অঞ্চলে ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল, তখন তথায় শিক্ষক-

ভাবে, উকীল-ব্যারিষ্টার ভাবে, মুন্সেফ-ডেপুটি ভাবে, ডাক্তার-কবিরাজ ভাবে—civil life-এর নানাবিভাগেই বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন স্তরে বাঙ্গালী যাইতে লাগিল। ইংরাজী শিক্ষা-দীক্ষায় বাঙ্গালীই আগে অগ্রণী হইয়াছিল তাহা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি; তাছাড়া, বাঙ্গালার প্রধান সহর কলিকাতাই ছিল সমগ্র ভারতবর্ষের রাজধানী—সুতরাং বাঙ্গালীই অধিক পরিমাণে পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত ছিল। এই সব কারণে শুধু ব্রিটিশ শাসন নহে, পাশ্চাত্য শিক্ষা, সভ্যতা ও প্রভাবের বাহনও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে প্রধানতঃ বাঙ্গালীরাই হইল। প্রত্যুত তত্তৎপ্রদেশের লোকেরা ইংরাজকে অবশ্য রাজসম্মান প্রদান করিত, কিন্তু তৎপরেই বাঙ্গালীকে সম্মান করিত। এই সম্মানের প্রভূত কারণও ছিল—একটু পরেই বলিতেছি।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়িল। বাঙ্গালীরা ইংরাজের রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই ভাবে যে ভারতময় ছড়াইয়া পড়িল, এই ঐতিহাসিক ঘটনার আলোচনা প্রসঙ্গে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একদা বলিয়াছিলেন যে ইহাতে বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয় ত কিছু নাই-ই, পরন্তু ইংরাজের তল্পীবাহী হইয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশে শাসন-বিস্তারের সহায়ক হওয়াতে এই ব্যাপার বাঙ্গালীর কলঙ্কেরই বিষয়; অর্থাৎ আজ যাহাকে বৃহত্তর বঙ্গ বলিয়া আপনারা গৌরব করেন, তার উৎপত্তির ইতিহাস অতিশয় লজ্জাজনক। এবিষয়ে আমি বন্ধুবরের সহিত কিছুতেই একমত হইতে পারিলাম না।

আমি মোটেই একথা মানিনা। কোন্ ঐতিহাসিক অবস্থার ফলে বা ঘটনার সমাবেশে কি প্রকারে কোন্ জাতি কোথায় গমন করে সেটা তত বড় কথা নহে, যতটা বড় কথা গমনানন্তর সেই নূতন আবেষ্টনে, নূতন দেশে প্রদেশে কি ভাবে তাহারা আচরণ করে, কি ভাবে কার্য্যপদ্ধতি পরিচালনা করে।

মহম্মদ ঘোরী যখন দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজকে তিরৌরীর রণক্ষেত্রে পরাভূত ও নিহত করিয়া ভারতে মুসলমান শাসনের সূত্রপাত করেন, তখন তাঁহার সঙ্গে তদীয় একটি ক্রীতদাস আসিয়াছিল—সেই ক্রীতদাসটির নাম কুতবুদ্দীন আয়বক। (এই নামের প্রসঙ্গে একটা কথা ভয়ে ভয়ে বলি। মোগল-পাঠান আমলের যে সব নাম আমাদের বাল্যাবধি পরিচিত, বর্ত্তমান ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, তাহার অধিকাংশই নাকি ভুল। ছেলেবেলা হইতে পাঠানসম্রাট্ আলতামসের নাম শুনিয়া আসিয়াছি—এখন শুনি যে তিনি নাকি ইল্‌তুত্‌মিস্। খিলিজী হইয়াছেন খালজী। এ ত সামান্য কথা। পাঠান-সাম্রাজ্য পর্য্যন্ত উড়িয়া গিয়াছে গবেষকদের ফুৎকারে—আলাউদ্দীন খিলিজী ও মহম্মদ তোগলক যে দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত পদানত করিয়া বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন, সেটা নাকি সাম্রাজ্যই নহে—পাঠান ত নহেই, উহা নাকি শুধু আফগানদের দিল্লীর সুলতানী মাত্র। মঙ্গলবংশসম্ভূত এমন যে ইতিহাসবিশ্রুত মোগল সম্রাট্-বংশ—পাশ্চাত্য সমাজে যাঁহারা Great Mogul বলিয়া পরিচিত—তাঁহারা নাকি মোগল নহেন, মুঘল। আমার ভয়

হইতেছে যে কোন্ দিন বা ঐতিহাসিকদের অনুসন্ধিৎসার দাপটে কুতবুদ্দীন আয়বক কুতবুদ্দীন বুড়বক বনিয়া যান। যাক্, আমি যদি কিছু ভুলচুক করিয়া ফেলি নাম বিষয়ে, ইতিহাসজ্ঞ কালিদাস বাবু যেন বিনামা হস্তে প্রস্তুত থাকিয়া আমাকে শোধরাইয়া দেন।) এই কুতবুদ্দীন আয়বক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দাসবংশীয় পাঠান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ক্রীতদাস হইয়া ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া তৎপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের মর্য্যাদা কিছুমাত্র কমে নাই, কিংবা কুতব মিনারের উচ্চতাও কিছুমাত্র খাট হয় নাই। মানুষ কি প্রকারে সুযোগ পায় সেটাই আদত কথা নহে ; সেই সুযোগের কি প্রকার সদ্ব্যবহার করে সেইটাই আসল কথা।

একথা সত্য যে বাঙ্গালী নানাভাবে ইংরাজের সহযোগী হইয়া ভারতের অন্যত্র গমন করিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালী যদি মাত্র কেরাণীগিরি, কি অন্য চাকুরী, কি ব্যবসায় করিয়া অন্যদেশ হইতে অর্থার্জ্জন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত, তবে বাঙ্গালীর এত মর্য্যাদা, এত সম্মান হইত না সেই সব দেশে। আজও বাঙ্গালা মুল্লুকে ভিন্ন-প্রদেশবাসী নানা লোকে নানা ভাবে আসিয়া অর্থোপার্জ্জন করে—ভৃত্যভাবে, পুলিস-দ্বারোয়ান ভাবে, কেরাণী ভাবে, ব্যবসায়ী ভাবে, মোটর-চালক ভাবে, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ভাবে, কিন্তু তন্মধ্যে যাহাদের দ্বারা বাঙ্গালী সমাজের বা জাতির কোন কল্যাণ কোন উন্নতি হয় না, তাহারা ত বাঙ্গালাতে কোন সম্মানের বা সম্ভ্রমের অধিকারী হয় না।

বাঙ্গালী সারা ভারতে যে সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীতে, তাহা তাহারা জীবিকাব্যপদেশে নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া নয়; পরন্তু তাহারা তাহাদের নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি-শক্তি অনুযায়ী সেই সব স্থানের ও স্থানীয় ব্যক্তিদিগের কল্যাণকর নানাবিধ প্রচেষ্টা ও প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়াছিল বলিয়া।

প্রথমতঃ, বিদেশে বাঙ্গালীদিগের একটা সঙ্ঘবদ্ধতা ছিল; এখনও উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রায় প্রত্যেক বড় সহরেই—পেশোয়ারে, রাওলপিণ্ডীতে, দিল্লীতে, সিমলাতে—বঙ্গের নিকটতর স্থানগুলিতে ত বটেই—বাঙ্গালীর কালীবাড়ী, বাঙ্গালীদের সহিত সংস্কৃতি সংরক্ষণের একটা মস্ত কেন্দ্র। দ্বিতীয়তঃ, উচ্চতর পাশ্চাত্যভাবাপন্ন শিক্ষাদীক্ষা প্রাপ্ত হওয়ায় প্রবাসী বাঙ্গালীরা নিজেদের উপর খুবই আস্থাসম্পন্ন ছিলেন। এবং তাঁহাদের অনেকেরই মনে এই কামনার উদয় হইয়াছিল যে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত তদ্দেশবাসীদিগকে শিক্ষা দ্বারা, সমাজসংস্কার দ্বারা, ধর্ম্মসংস্কার দ্বারা, রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনাদি দ্বারা, সংবাদপত্রাদি প্রতিষ্ঠা দ্বারা উন্নততর সভ্যতর করিয়া তুলিবেন। মধ্যভারতে ঝান্সী-গোয়ালিয়রে যান, উত্তরভারতে দিল্লী-লাহোরে যান, যুক্তপ্রদেশে কাশী-প্রয়াগ-লক্ষ্ণৌতে যান, আসাম-বিহার-উড়িষ্যার ত কথাই নাই—ইহারা ত সেদিন পর্য্যন্ত বঙ্গের অঙ্গীভূতই ছিল—বাঙ্গালীর হাতে মানুষ বলিলেই হয়—প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিবেন যে তত্রত্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, তত্রত্য

সংবাদপত্র, তত্রত্য সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টার গোড়ায় রহিয়াছেন বাঙ্গালী। ভারতভ্রমণে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহাতে এক দাক্ষিণাত্যে বাঙ্গালী-প্রভাব ততটা লক্ষ্য করি নাই; তাছাড়া প্রায় সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করিয়াছি। বাঙ্গালী নিজ বাঙ্গালাদেশে যে সমস্ত আন্দোলনের যে সমস্ত সংস্কার-প্রচেষ্টার যে সমস্ত শিক্ষা-পদ্ধতির সূত্রপাত করিয়াছিল, কায়মনোবাক্যে চেষ্টিত হইয়াছিল সমগ্র ভারতে তাহা প্রচলিত করিতে, সমগ্র ভারতকে তাহার ফলভোগ করাইতে। তাই উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী বর্ত্তমান নব্য-ভারতের শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরু হইয়াছিল—শুধু কেরাণীগিরি ওকালতী হাকিমী বা ব্যবসায় দ্বারা অর্থোপর্জ্জন করিয়া নহে।

বাঙ্গালী রামমোহন ধর্ম্মসংস্কার আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়া ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপন করিলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাহার আদর্শ ভারতময় ছড়াইয়া দিলেন—ফলে পশ্চিম ভারতে প্রার্থনা-সমাজ, পঞ্চনদে আর্য্য-সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইল। বাঙ্গালী মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আদর্শ ও বাণী বাঙ্গালী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ প্রচার করিলেন; সারা ভারতময় সেই আদর্শ সেই বাণী যেন তরুণ মনে আগুন ধরাইয়া দিল। বাঙ্গালী সুরেন্দ্রনাথ সমগ্র ভারতে এক মহাজাতি-সংগঠনের স্বপ্ন দেখিলেন, মহারাষ্ট্র হইতে সাড়া আসিল, জাতীয় মহাসমিতির সূত্রপাত হইল। তারপর বঙ্গ-ভঙ্গের প্রচণ্ড আন্দোলনের তরঙ্গ বাঙ্গালার বিপিনচন্দ্র বাঙ্গালার

অরবিন্দের জ্বলন্ত উৎসাহের ফলে আসমুদ্রহিমাচল ছড়াইয়া পড়িয়া ভারতে নবজাগরণ আনয়ন করিল। ভারতের উন্নতির জন্য—যে প্রদেশে বাঙ্গালী উপনিবেশ স্থাপিত করিয়াছে সেই প্রদেশের সর্ব্ববিধ কল্যাণের জন্য বাঙ্গালী—ঘরের বাঙ্গালী এবং বাহিরের বাঙ্গালী—আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে এবং জাতিকে গড়িয়া তুলিয়াছে। তাই সমগ্র ভারত বাঙ্গালীকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়াছে। বৃহত্তর বঙ্গের এই অপরূপ বিকাশে লজ্জার কোন কারণ নাই—বস্তুতঃ এই ইতিহাস বাঙ্গালীর পরম গৌরবের বিষয়।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর কথা বলিতেছিলাম। অনেক কথাই মনে পড়ে। বঙ্গের বাহিরে এই অপরূপ ঐশ্বর্য্য বাঙ্গালী প্রকটিত করিল কি প্রকারে? কেননা বঙ্গের ভিতরেও ঐশ্বর্য্যের অবধি ছিল না। বাঙ্গালার জাতীয় জীবনে প্রাণশক্তি যেন উপচিয়া পড়িতেছিল—তাহারই কণিকামাত্র যেন বাঙ্গালার বাহিরে গিয়া সারা ভারতকে কৃতার্থ করিয়াছিল। বঙ্গীয় প্রতিভার সে কি অপূর্ব্ব স্ফুরণ! হিন্দু ও মুসলমান সভ্যতার সংঘাত ও সংস্পর্শে ষোড়শ শতাব্দীতে মহাপ্রভুর যুগে সেই এক বঙ্গপ্রতিভার স্ফুরণ হইয়াছিল; নৈয়ায়িক রঘুনাথ, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন, তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ, বৈষ্ণব শ্রীচৈতন্য—বাসুদেব সার্ব্বভৌমের এক এক দিক্‌পাল শিষ্য—জাতীয় জীবনের এক এক দিক্ যেন উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। আর তারপর প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার সংঘাত ও সংস্পর্শে উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গপ্রতিভার আর এক অনুরূপ বিচিত্র স্ফুরণ দেখা গিয়াছিল।

জাতীয় জীবনের প্রত্যেক বিভাগে—কি সাহিত্যে, কি ধর্ম্মে, কি রাজনীতিতে, কি সমাজ-সংস্কারে—প্রত্যেক বিভাগেই কি ভাস্বর এক জ্যোতিষ্কমণ্ডলী বাঙ্গালার গগনকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল! নাম আর কত করিব? সাহিত্যে মাইকেল-রঙ্গলাল-দীনবন্ধু-ভূদেব-বঙ্কিম-রমেশ-হেম-নবীন-গিরিশ-দ্বিজেন্দ্র-অমৃত-রবীন্দ্রনাথ, ধর্ম্মে রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ-কেশবচন্দ্র-শিবনাথ-বিজয়কৃষ্ণ-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, রাজনীতিতে কৃষ্ণদাস-হরিশ্চন্দ্র-সুরেন্দ্রনাথ-রাসবিহারী-বিপিনচন্দ্র-অরবিন্দ-অশ্বিনী-কুমার-চিত্তরঞ্জন, সমাজসংস্কারে বিদ্যাসাগর-রাজনারায়ণ-রাম-তনু; আর কত নাম করিব? এ যেন একটা galaxy of stars! আমার মনে হয় যে কোন এক যুগে একই দেশে এতগুলি অদ্বি-তীয় মনীষীর আবির্ভাব কখনও হইয়াছে কিনা সন্দেহ—এতদ-পেক্ষা বেশী যে হয় নাই সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। Lytton Strachey একখানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন—আপনারা সকলেই জানেন—Eminent Victorians; আমার মনে হয় যে Emi-nent Victorians in Bengal সম্বন্ধে লিখিলে বোধ এক-খানি বৃহত্তর গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। বাস্তবিকই ঊনবিংশ শতাব্দী —বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় যুগ—রোমের Augustan age-এর সঙ্গে ইহা তুলিত হইবার যোগ্য।

বাঙ্গালীর প্রতিভার এই যে অভাবনীয় বিকাশ, নানাদিক্ দিয়া বাঙ্গালীর প্রচেষ্টার এই যে চিন্তাতীত সাফল্য—বাঙ্গালার ভিতরে এবং বাহিরে—ইহার অন্তর্নিহিত কারণ কি? কারণ

ছাড়া কার্য্য সম্ভবে না—তা Heisenberg যাই বলুন না কেন। তবে কারণ অতি সহজ—তখনকার বাঙ্গালীর ভিতর পদার্থ ছিল। এবং অতি দুঃখ ও ক্ষোভের সহিতই স্বীকার করিতে হয় যে বর্ত্তমান বাঙ্গালী সমাজে শত বাহ্য চাকচিক্য সত্ত্বেও এই পদার্থেরই যেন একান্ত অভাব ঘটিয়াছে। সে যুগের বাঙ্গালী জীবনকে কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে serious ভাবে গ্রহণ করিত : আদর্শে তাহাদের নিষ্ঠা ছিল, আর সাধনায় ছিল একাগ্রতা। সকলেই যে তাঁহারা এক পথের পথিক ছিলেন, এক ভাবের ভাবুক ছিলেন, এক আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন, এমন নহে। নানা বিভিন্ন আদর্শের দিকে তাঁহাদের গতি ছিল, তদ্ধেতু সংঘাত-সংঘর্ষও তাঁহাদের মধ্যে কম হইত না ; কিন্তু সে সংঘর্ষ ছিল বীরের সংঘর্ষ—কারণ স্ব স্ব আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা তাঁহাদের ঐকান্তিক ছিল। তাঁহাদের সেই আদর্শের অনুসরণে অতি বড় নির্য্যাতন উৎপীড়নও তাঁহাদিগকে দমিত করিতে পারিত না। তাই এত বেগবান্ প্রাণবান্ হইয়া উঠিয়াছিল তাঁহাদের জীবন। তাঁহারা জানিতেন এবং বিশ্বাস করিতেন যে চেষ্টা ছাড়া সাফল্য হয় না, সাধনা ব্যতীত সিদ্ধিলাভ হয় না। Short-cut-এ তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন না ; ফাঁকি দিয়া স্বর্গলাভে তাঁহাদের আস্থা ছিল না—তাই তাঁহারা ফাঁকি দিতে চেষ্টা করিতেন না। কি জ্ঞানান্বেষণে, কি কর্ম্মপ্রচেষ্টায়, কি ধর্ম্মসাধনায় তাঁহারা ছিলেন thorough ; অখণ্ড প্রচেষ্টার দ্বারা জীবনের সমগ্রতাকে সার্থক করিতে প্রয়াস তাঁহারা পাইতেন। তাই তাঁহাদের জীবন সত্য সত্যই সার্থক হইয়াছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ একদা বলিয়াছিলেন, "চালাকী দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয় না।" কথাটা একেবারে খাঁটি। চালাকী দ্বারা অনেক কিছু মতলব সিদ্ধি সাময়িক ভাবে হইতে পারে বটে : কিন্তু যা কিছু মহৎ, জাতীয় জীবনে যা কিছু স্থায়ী সম্পদ্ দান করিতে পারে, এমন কিছু চালাকী দ্বারা সম্ভব নহে। সস্তা রকমের চটুলতা দ্বারা, তরলতা দ্বারা, পণ্ডিতম্মন্যতা দ্বারা, শুধু nil admirari ধরণের শ্রদ্ধাহীন নাস্তিকতার দ্বারা জীবনকে গড়িয়া তোলা যায় না। আমরা অনেক সময়ে আজকাল আক্ষেপ করিয়া থাকি—মুসলমান আমাদের পিষিয়া ফেলিল, বিহারীরা আমাদের কোণঠাসা করিল। সত্য কথা বলিতে কি, এ কথায় আমি বিশ্বাস করি না। ভিতরে যদি পদার্থ থাকে, তবে কেহ কাহাকেও কোণঠাসা করিয়া পিষিয়া মারিয়া ফেলিতে পারে না—Nations by themselves are made! নিজেদের অপদার্থতার প্রতি অন্ধ হইয়া, নিজেদের দোষ-ত্রুটীর প্রতি দৃষ্টিহীন হইয়া, অন্যের বিরূপতার উপর প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপর দোষ চাপাইয়া, কাঁদুনী গাওয়ায় একরকম আরাম পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা অপদার্থতা-দোষ দূরীভূত হয় না, ব্যাধির কোন প্রতিকার হয় না। এই কাঁদুনী, এই whining, আমার ভাল লাগে না। চাই অন্তর্দ্দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা, চাই বিশ্লেষণের নৈপুণ্য, চাই চিত্তের অকুতোভয়তা। যে বাঙ্গালীজাতি উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া মুকুটমণির ন্যায় শোভা

পাইত, সেই বাঙ্গালী জাতি কেন আজ ধাপের পর ধাপে নামিয়া আসিতেছে, জীবন-সংগ্রামে ক্রমাগত হটিয়া আসিতেছে—এই অবস্থা-বিপর্য্যয়ের কারণ কি, নিজেদের গলদ কোথায়—নির্ভীকভাবে ধীরস্থিরভাবে এই বিষয় আলোচনা করিতে হইবে, বিশ্লেষণ করিতে হইবে। ব্যাধির নিদান নির্ণয় করিতে হইবে—তবেই ত প্রতিকার সম্ভব।

এই বিশ্লেষণ আমি একটু করিতে চাই। চারিত্রিক লঘুতা ও অবনতির বিষয়ে যা একটু ইঙ্গিত এইমাত্র করিলাম তাহা ত যেন আছেই; তদ্ব্যতীত বিগত পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনা-পরম্পরা এবং বাঙ্গালীদিগের অবলম্বিত রাষ্ট্রীয় কর্ম্মপ্রচেষ্টার ধারাও বর্ত্তমানে বাঙ্গালীর অধোগতির নিমিত্ত অনেকটা দায়ী। এই সত্য অস্বীকার করিলে চলিবে না। অবসর-মত রাজনীতি-চর্চ্চার কু-অভ্যাস আমার আছে—আজ এই অবসরে আপনাদের সমক্ষে কিঞ্চিৎ রাজনীতি-চর্চ্চা করিতে চাই—আশা করি আপনারা অধৈর্য্য হইবেন না।

ঊনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া জাতীয় জীবনের নানাবিভাগে সমগ্র ভারতের উপর বাঙ্গালী যে নেতৃত্ব করিয়াছিল, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে—বিশেষ করিয়া রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে—বাঙ্গালীর সেই নেতৃত্ব পরিস্ফুট হইয়াছিল। সেই রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ব্যাপক আকারে বাঙ্গালাতে দেখা দেয় ইতিহাস-বিখ্যাত স্বদেশী আন্দোলনে। এই আন্দোলন প্রধানতঃ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে আরব্ধ হইলেও, ইহা

কালক্রমে সর্ব্বাঙ্গীণ জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের আকার ধারণ করে, এবং ইহারই প্রভাবে সমগ্র ভারতবর্ষে একটা জাতীয় নবজাগরণের সাড়া পড়িয়া যায়। বন্ধুবর কালিদাস বাবু স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছেন। আমিও তাঁহারই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতেছি যে বাঙ্গালায় তেমন আন্দোলন আর দেখিলাম না। স্বদেশী আন্দোলনের পর অনেক রকমের আন্দোলন দেখিয়াছি—অহিংস অসহযোগ বা non-violent non-co-operation দেখিয়াছি—সামষ্টিক এবং বৈয়ষ্টিক, mass and individual, আইন-অমান্য বা civil dis-obedience-ও দেখিয়াছি—আর চোখের সামনে আজিকার এই নোটিস দিয়া ছুটিছাটা-বড়দিন-মহরম বাদ দিয়া অবসর মাফিক সমর-বিরোধী সত্যাগ্রহের তামাসাও দেখিতেছি—যে সত্যাগ্রহকে মহাত্মাজী বলেন selective সত্যাগ্রহ, এবং ইতর জনে বলে elective সত্যাগ্রহ, অর্থাৎ সামনের election-টা সুগম করিবার নিমিত্ত সত্যাগ্রহ, তাহাও দেখিতেছি—কিন্তু তেমনটি আর দেখিলাম না। স্বদেশী আন্দোলন বাঙ্গালার মর্ম্মকোষকে যেরূপ গভীরভাবে আলোড়িত করিয়া বাঙ্গালার প্রাণকে কর্ম্মে, ভাবে, কাব্যে, গানে স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিকাশ দান করিয়াছিল—আবেগের সে গভীরতা, আদর্শের সে নিষ্ঠা, মুক্তির সে পিপাসা—আর দেখিলাম না। রাষ্ট্রীয় জগতে, বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর চরমতম ও শ্রেষ্ঠতম দান স্বদেশী আন্দোলন ; এবং

এই আন্দোলন বহুল পরিমাণে সার্থক ও সফল হইয়াছিল, কারণ এই আন্দোলন বাঙ্গালী দেশভক্ত ও দূরদর্শী নেতৃগণের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল—ভাবুকতার সহিত বিচক্ষণতার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণের ফলেই আন্দোলন জয়যুক্ত হইয়াছিল।

বঙ্গভঙ্গ রহিত হওয়ায় আন্দোলন জয়যুক্ত হইল বটে; কিন্তু ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, ইহার পর হইতেই রাষ্ট্রীয় প্রতিপত্তির দিক্ হইতে বাঙ্গালীর পশ্চাদপসরণ আরম্ভ হইল। প্রথমতঃ, বঙ্গভঙ্গ রহিত হইলেও পূর্ব্বের বাঙ্গালা—বিহার-উড়িষ্যা-সমেত বাঙ্গালা—ফিরিয়া আসিল না; বিহার-উড়িষ্যা স্বতন্ত্র প্রদেশ হইয়া গেল; তাছাড়া, খাঁটি বঙ্গভাষাভাষী অনেক জিলাও নূতন বন্দোবস্তে বাঙ্গালার প্রত্যন্ত দেশে কিন্তু বাঙ্গালার বাহিরে পড়িয়া রহিল—সিংহভূম, মানভূম, শ্রীহট্ট, কাছাড়, প্রভৃতি জিলা। একই শাসনের অন্তর্ভুক্ত থাকাতে বাঙ্গালীর উচ্চতর শিক্ষা দীক্ষার হেতু ঐ সব প্রদেশে বাঙ্গালীর যে প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল তাহা বহুল পরিমাণে ক্ষুন্ন হইল।

দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইল। এই অভাবনীয় ব্যাপারে বাঙ্গালার ক্ষতি হইল আরও প্রচুর। ব্রিটিশ শাসনের সূত্র-পাতের সময় হইতেই কলিকাতা ছিল ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত ভারতের রাজধানী—প্রায় দেড় শতাব্দীর কথা—তাই এইখানেই পাশ্চাত্য শিক্ষাসভ্যতার প্রথম প্রচার। তাছাড়া, বড়লাট হইতে আরম্ভ করিয়া শাসনযন্ত্রের সমস্ত হোম্‌রা-

চোম্‌রা ব্যক্তি, ব্যবস্থা-পরিষদ্‌ প্রভৃতি সমস্তই কলিকাতাতে থাকায়, ভারতের সমস্ত প্রদেশ হইতেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ, দেশীয় রাজন্যগণ, কলিকাতাতেই প্রতিনিয়ত সমবেত হইতেন ; শাসনের কেন্দ্র কলিকাতায় থাকাতে স্বভাবতঃই বাঙ্গালীর প্রভাব শাসন-যন্ত্রের উপরও কতকটা বেশী ছিল ; ভারতসরকারে চাকুরী-বাকুরী হিসাবে ত বাঙ্গালীর সুবিধা বেশী ছিলই। মোটের উপর বাঙ্গালীর প্রাধান্যের ভাব খুবই বজায় ছিল। কিন্তু হঠাৎ ভারতের রাজধানী দিল্লীতে সরিয়া যাওয়ায় দাঁড়াইল এই যে যেস্থান ছিল সদর, সেস্থান হইয়া পড়িল মফঃস্বল : এবং সদর ও মফঃস্বলের মনোবৃত্তি ও প্রভাবের যে কতটা তফাৎ তাহা আপনারা সকলেই বুঝিতে পারেন। যে বিশিষ্ট সুবিধাটা ছিল বাঙ্গালার, ভারত-সরকারে চাকুরী প্রভাব প্রতিপত্তি হিসাবে, সেই সুবিধাটা চলিয়া গেল উত্তর-পশ্চিম ভারতে।

কিন্তু হঠাৎ এইরূপ অবস্থাবিপর্য্যয় সত্ত্বেও তখন পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠতা এতটা বেশী ছিল, উপযুক্ত নেতৃস্থানীয় বাঙ্গালী তখনও এত বেশী সংখ্যক ছিলেন, যে সহসা বাঙ্গালীর পশ্চাদ্‌গতি অনুভূত হইল না। এই পশ্চাদ্‌গতি ক্রমে ধরা পড়িতে লাগিল। ক্রমেই দেখা যাইতে লাগিল যে নিখিল-ভারতীয় ব্যাপার ও আন্দোলনাদির উপর বাঙ্গালীর যে প্রভাব ও নেতৃত্বের স্থান, তাহা কমিয়া যাইতেছে। বিগত মহাযুদ্ধের পর মণ্টেগু-শাসন-সংস্কারের প্রবর্ত্তনের পর হইতেই এই ব্যাপারটি বিশেষভাবে প্রকট হইতেছে। মহাত্মা গান্ধী নূতন

শাসন-সংস্কারের বিরুদ্ধে অসহযোগ নীতি অবলম্বন করিলেন, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বহু নেতা এই নীতি সমর্থন করিলেন। বাঙ্গালাতেও চিত্তরঞ্জন-প্রমুখ অনেক নেতা প্রথমে বিরুদ্ধতা করিয়া শেষটা ঐ নীতিই সমর্থন করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী মুসলমানী খিলাফতী আন্দোলন—মূলের সঙ্গে পুনশ্চ হিসাবে—যুড়িয়া দিলেন। ফল এই হইল যে, সারা ভারতময়ই হিন্দুর প্রভাব কমিয়া যাইতে লাগিল—বিশেষ করিয়া বাঙ্গালায়, যেখানে হিন্দু সংখ্যায় ভূয়িষ্ঠ নহে। ইহার বছর সাতেক পরে, ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে, নবতর শাসন-পদ্ধতি নির্ণয় করিবার জন্য সাইমন কমিশন বসিল—আবার হিন্দু patriot মহল হইতে ফতোয়া বাহির হইল, Go back Simon ; এবং স্থানে অস্থানে সর্ব্বত্রই কমিশন কৃষ্ণ-পতাকাযোগে অভিনন্দিত হইতে লাগিল। কিন্তু মুসলমানেরা মোটামুটিভাবে কমিশনের সহযোগিতা করিতে লাগিল। কিন্তু এতাদৃশ লাঞ্ছনা সত্ত্বেও, সাইমন কমিশনের সভ্যগণ তাঁহাদের রিপোর্টে যে সমস্ত প্রস্তাব নির্দ্ধারণ করিলেন, সেগুলি যথেষ্ট মূল্যবান্ ছিল। তাঁহারা হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তাহাই যদি অবলম্বিত হইত, তবে আজ আর Communal Award-এর, এবং তদুপরি গোদের উপর বিস্ফোটক হিসাবে, Poona Pact-এর চাপে পড়িয়া বাঙ্গালী হিন্দুর ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে হইত না। তাঁহারা প্রদেশ-গঠন সম্বন্ধে যে Boundary Commission

নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা অনুসৃত হইলে আজ আর এই সিংহভূম-মানভূম-শ্রীহট্ট-কাছাড়ের বাঙ্গালী "ন ঘরকা ন ঘাটকা" অবস্থায় বাঙ্গালার বাহিরে পড়িয়া থাকিত না। কিন্তু তখন গান্ধী-উৎসাহ টগ্‌বগ্‌ করিতেছে, সেই উৎসাহের আতিশয্যে ঘোষণা বাহির হইয়া গেল—Throw the Simon Report into the waste-paper basket! সেই আস্ফালনের ঠেলা এখন সাম্‌লান আপনারা।

যাক্, সাইমন রিপোর্ট ত আবর্জ্জনাস্তূপে নিক্ষিপ্ত হইল; তৎস্থলে বিলাতে Round Table Conference-এ গান্ধীজীর কাণ্ডকারখানার ফলে উৎপন্ন হইল Minorities Pact এবং তাহারই সাক্ষাৎ সন্ততি Communal Award, এবং তদুপরি গান্ধীজীর অনশনের ফলে গজাইল বিখ্যাত Poona Pact—মহাত্মাজীর প্রতি অচলা ভক্তির ফলে বাঙ্গালার হিন্দু রাষ্ট্রনৈতিক নির্ব্বাণ হইল আসন্ন। ভক্তিগদ্‌গদতার যাহা ফল হইবার তাহাই হইল—রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে শুধু ভক্তিতে কুলায় না, কিঞ্চিৎ পরিমাণে যুক্তিও আবশ্যক।

যাক্, আরও আধুনিক ইতিহাসে আসিতেছি। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে নূতন অর্থাৎ বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইল। বাঙ্গালা দেশে ব্যবস্থাপরিষদে মুসলমানদিগের প্রভাব বহুগুণ বর্দ্ধিত হইল। দুই প্রধান মুসলমান নেতার মধ্যে প্রচণ্ড নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। আমাদের বরিশাল জিলারই পটুয়াখালী মহকুমায় ফজ্‌লুল হক্ সাহেবের সহিত খাজা নাজিমুদ্দিন

সাহেবের দ্বন্দ্ব হইল। দ্বন্দ্বে হক্ সাহেবই জয়ী হইলেন। সেই ভোটের ব্যাপারে হিন্দুরা তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন ; এবং হক্ সাহেবও জয়ী হইয়া মন্ত্রিত্ব-গঠন ব্যাপারে হিন্দুনেতৃগণের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। চেষ্টার ত্রুটি তিনি করেন নাই, হিন্দু নেতাদের বাড়ী বাড়ী তিনি ধর্ণা দিয়াছেন—আমাদের বাঙ্গালার "মেজদা" শরৎ বসু মহাশয়ের বাড়ী যাইতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই ; কিন্তু সর্ব্বত্রই কংগ্রেসী হিন্দু নেতৃবর্গের দ্বারা তিনি প্রত্যাখ্যাত হইলেন। Communal Award সত্ত্বেও অবস্থাগতিকে যে সুযোগ বাঙ্গালায় উপস্থিত হইয়াছিল একটা জাতীয় ভাবাপন্ন মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিবার, সে সুযোগও নষ্ট হইল। আজ ফজ্‌লুল হক্ সাহেবের উপর কটূক্তি করিলে কি হইবে ? সাধক রামপ্রসাদের আক্ষেপোক্তিই থাকিয়া থাকিয়া মনে পড়ে ঃ

"দোষ কারও নয় ত গো মা,
স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।"

প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও ফজ্‌লুল হক্ সাহেবের সহিত এক-যোগে কাজ করিতে নাজিমুদ্দিন সাহেব রাজী হইলেন—পাকা-পোক্ত মুসলমান-প্রধান মন্ত্রিমণ্ডলী বাঙ্গালাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

মুসলমান নেতাদিগের কার্য্যকলাপে আমার কি মনে হয় জানেন ? রাজনৈতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে তাঁহারা চমৎকার খেলিতেছেন—they are playing their cards marvellously well! বস্তুতঃ আমরা হিন্দুরা আমাদের বুদ্ধির

বড়াই করি বটে, কিন্তু মুসলমানদিগের নিকট হইতে আমাদের অনেক কিছু শিখিবার আছে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে। আমাদের হইয়াছে অতিবুদ্ধি; এবং আমাদের দেশে প্রাচীন প্রবাদেই রহিয়াছে "অতি-বুদ্ধির গলায় দড়ি"—তাহাই আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে। নিজেদের মধ্যে ঈর্ষ্যা দ্বন্দ্ব দলাদলি মুসলমানদের মধ্যেও যথেষ্ট আছে; কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে—হউক না তাহা সাম্প্রদায়িক স্বার্থ—তাহার খাতিরে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি তাঁহারা সংযত করিয়া একযোগে কাজ করিতে পারেন। তাই, হক্-খাজার বিরোধ-বিতণ্ডা ঘুচিল।

কিন্তু আমাদের হিন্দু বাঙ্গালার দুই কংগ্রেসী দলের ঝগড়া-কোলাহল আজও মিটিল না। দুই পক্ষ—বর্ত্তমানে বসুপক্ষ এবং গান্ধীপক্ষ—সমানেই লড়াই চালাইয়া যাইতেছেন। কোন্‌টি শুক্লপক্ষ কোন্‌টিই বা কৃষ্ণপক্ষ তাহা নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া পক্ষ-পাত প্রদর্শন করিতে চাহি না; কিন্তু উভয় দলের এই নিরন্তর পক্ষ-সন্তাড়নের ফলে বাঙ্গালায় কংগ্রেসী রাজনীতির প্রচেষ্টা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে সকলেই দেখিতে পাইতেছেন।

তদুপরি মজার কথা এই যে, আজ যখন মুসলমান-শাসন বাঙ্গালায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া চাপিয়া বসিয়াছে, তখন মুসলমানের খোসামুদী ও স্তাবকতা করিবার লোকের কোন অভাব দেখা যাইতেছে না—এমনকি গরমতম অতি "Forward" কংগ্রেসী মহলেও। কলিকাতা কর্পোরেশন—যেখানে Communal Award নাই, মুসলমানদিগের সংখ্যাধিক্য নাই—সেখানেও

সিদ্দিকী-ইস্পাহানীর দলের সহিত চুক্তি করিয়া অ-বাঙ্গালী সিদ্দিকী সাহেবকে মেয়রের তক্তে বসাইয়া সুভাষ-ভক্ত patriot-এর দল কর্পোরেশনে পর্য্যন্ত মুসলমান-প্রভুত্ব কায়েমী করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আরও আশ্চর্য্য ঘটনা আছে—দায়ে পড়িলে স্তাবকতা কতদূর যাইতে পারে, তাহারই অতি বিচিত্র নিদর্শন। নবাব সিরাজদ্দৌলা—উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি লম্পট-স্বভাব নৃপকুলকলঙ্ক অপদার্থ নবাব সিরাজদ্দৌলা—যাহার অত্যাচারে উৎপীড়নে কামান্ধতায় জর্জ্জরিত হইয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ জননায়কগণ হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান নির্ব্বিশেষে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন তাহার উচ্ছেদ সাধন করিতে এবং কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন—সেই "পুণ্যশ্লোক" সিরাজদ্দৌলার "পবিত্র স্মৃতি" হইতে কলঙ্ক-কালিমা ক্ষালন করিবার নিমিত্ত আজ হিন্দু যুবক-যুবতী কারাবরণ করিতেছেন! O the shades of Rani Bhavani! এবং এই অতি সুমহৎ প্রচেষ্টার নায়ক আমার স্নেহভাজন বন্ধু তরুণ হিন্দু নেতা শ্রীমান্ সুভাষচন্দ্র বসু! কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্! হিন্দুর রাষ্ট্রীয় নির্ব্বাণের আর বিলম্ব কি?

[এই সময়ে সভাস্থলে সুভাষ-পন্থী কতিপয় ব্যক্তি "Stop, stop" বলিয়া চীৎকার করায় সভায় কিছু গণ্ডগোল উপস্থিত হয়; কিন্তু কিছু পরেই উহা থামিয়া যায়।]

কেহ কেহ আমার কথাতে উত্তেজিত হইয়াছেন দেখিতে পাইতেছি। গভীর মনোদুঃখেই হিন্দু নেতাদের আত্মঘাতী

নীতির সমালোচনা আমাকে করিতে হইয়াছে। কাহারও মনে দুঃখ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নহে। কেহ যদি আমার কথায় দুঃখ বোধ করিয়া থাকেন, তজ্জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু আমি একটিও অন্যায্য কথা বলি নাই। যাহা যাহা বলিয়াছি প্রত্যেকটিই অবিসংবাদিত ঐতিহাসিক সত্য।

আমার বক্তব্যও প্রায় শেষ হইয়া আসিল। বৃহত্তর বঙ্গের অধিবাসী বাঙ্গালীর—অর্থাৎ আজকালকার ভাষায় প্রবাসী বাঙ্গালীর—সমস্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া, কি হেতু আজ বাঙ্গালী, বিশেষতঃ হিন্দু বাঙ্গালী মাত্রেরই, দুর্ব্বলতার দিকে দুর্গতির দিকে নৈরাশ্যের দিকে দুর্দ্দম বেগে গতি হইতেছে—তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। এই আলোচনার আবশ্যকতা আছে। যদি বহুল পরিমাণে নিজেদের কর্ম্মদোষেই এই অবস্থাবিপর্য্যয়ে বাঙ্গালী—কি স্বদেশের কি বিদেশের—আজ পড়িয়া থাকে, তবে শুধু অদৃষ্টের উপর দোষারোপ করিয়া, কিংবা ইংরাজ কি মুসলমান কি বিহারী ইত্যাদির প্রতি কটূক্তি করিয়া ত এই দুরবস্থার অবসান হইবে না। ধরিয়া লউন, অন্যান্য সম্প্রদায় হিন্দু বাঙ্গালীদের উপর বিরূপ। তাহারা প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়, তাহাদের বিরূপতা ত স্বাভাবিক—যতই কেন অপ্রীতিকর হউক না। আমাদের নিজেদের গলদ কোথায়, আমাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টার ত্রুটি কোথায়, আমাদের চরিত্রে অপদার্থতা কোথায়—নির্ম্মম ভাবে সে বিষয়ে জাতির হিতাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেক ব্যক্তির আলোচনা করিতে হইবে। নৈরাশ্য আর

ক্লৈব্য আর হৃদয়দৌর্ব্বল্য দ্বারা ত দুর্দ্দশার নিরসন হইবে না।

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যাক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥"

গীতার এই মহাবাণী স্মরণ রাখিতে হইবে।

বাঙ্গালীর যে আকস্মিক ও কৃত্রিম সুবিধা হইয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীতে তাহা আজ নাই বটে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসিগণও এখন আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করিয়া জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হইতেছে বটে—এবং তাহাদের এই উন্নতি ও অগ্রগতি ত আনন্দেরই বিষয়—বাঙ্গালীর ইহাতে দুঃখ কিংবা ঈর্ষ্যা করিবার কোনই কারণ নাই ; সমগ্র ভারতই সমভাবে উন্নত হউক, শিক্ষিত হউক, সমৃদ্ধ হউক—ইহা সকল দেশ-হিতৈষীরই কাম্য। কিন্তু বাঙ্গালীর দুঃখ এই যে আগে আগে চলা দূরে থাকুক, এখন সে আগে কেন, অন্যান্য ভারতবাসীর সঙ্গে সমান তালেও পা ফেলিয়া চলিতে পারিতেছে না। ইহা ত দুঃখের বিষয় বটেই। ইহার প্রতিকার কোথায় ? প্রতিকার বাঙ্গালীর নিজের হাতে।

বাঙ্গালীর জননায়কগণের শুধু ভাবালুতা দ্বারা পরিচালিত হইলে চলিবে না, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতাও অবলম্বন করিতে হইবে ; আর সর্ব্বোপরি শোধন করিতে হইবে নিজেদের চরিত্র। বিশেষ করিয়া প্রবাসী বাঙ্গালীর দায়িত্ব এবিষয়ে অত্যন্ত গুরুতর। প্রত্যেকটি প্রবাসী বাঙ্গালী এক হিসাবে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রতিনিধি। তাহার আচরণ ও ব্যবহারের মাপকাঠির

দ্বারাই অন্যদেশীয়গণ বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রের পরিমাপ করিয়া থাকে। বিগত যুগে প্রবাসী বাঙ্গালীদের মহনীয় রূপের সহিত তাহারা পরিচিত হইয়াছিল বলিয়াই সমগ্র ভারতে সকলেই বাঙ্গালীকে অতি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। বাঙ্গালীর সেই মহনীয় চরিত্র, সেই উদার সমদর্শিতা, সেই তেজস্বিতা, সেই কল্যাণমূর্ত্তি ফিরাইয়া আনিতে হইবে বৃহত্তর বাঙ্গালায়। আমি বিশ্বাস করি যে ব্যবহারের মাধুর্য্যে, আচরণের ঔদার্য্যে, চরিত্রের দার্ঢ্যে বাঙ্গালী যদি আবার মহীয়ান্ হইয়া উঠে, তবে বাঙ্গালী—কি স্বদেশে কি বিদেশে—কোথাও পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িয়া থাকিবে না।

আমাদের সকলের মধ্যে—সমস্ত বাঙ্গালীর মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান, আত্মসম্মানবোধ ফিরিয়া আসুক, ইহাই আমার ঐকান্তিকী প্রার্থনা। কুরুক্ষেত্রের সমর-প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে উদাত্ত বাণী প্রচার করিয়াছিলেন—অবসাদগ্রস্ত মুমূর্ষু জাতির পক্ষে যে বাণী মৃতসঞ্জীবনীতুল্য—সেই অমৃতময়ী বাণী আমাদের সকলের কর্ম্মপ্রচেষ্টার মূলমন্ত্র হউক :

> "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
> আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥"

১৪ই পৌষ, ১৩৪৭।

সাহিত্যে
প্রলাপ ও বিলাপ

সাহিত্যে প্রলাপ ও বিলাপ

[রঙ্গপুর সারস্বত সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে
সভাপতির অভিভাষণ]

রঙ্গপুর সারস্বত সম্মেলনের অদ্যকার এই বার্ষিক অধিবেশনে আমাকে যে আপনারা সভাপতিপদে বরণ করিয়াছেন তজ্জন্য আমি নিজেকে সাতিশয় গৌরবান্বিত বোধ করিতেছি। এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশমাত্র নাই। তবে আপনাদিগকে এই জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে কিন্তু একটু ইতস্ততঃ করিতেছি। কারণ এই যে, বিগত কয়েকদিনের মধ্যে আপনা-দিগের এই সম্মেলনের পূর্ব্বেকার ইতিহাস ও কার্য্যধারা সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা হইতে জানিতে পারিয়াছি যে পূর্ব্বে পূর্ব্বে বাঙ্গালার বহু লোকবরেণ্য মনীষী আপনাদের এবংবিধ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিয়া গিয়াছেন।

সুতরাং তাঁহাদিগের স্থলাভিষিক্ত হইয়া পড়াতে মাদৃশ ব্যক্তি স্বভাবতঃই কিঞ্চিৎ বিপন্ন বোধ করিতেছে ; এবং এই বিপদের মধ্যে আপনারা আমাকে টানিয়া আনিয়াছেন। সুতরাং ধন্যবাদ দিতে একটু ইতস্ততঃ করিলে নেহাৎ দোষ দিতে পারেন না। আমার নিজের কিন্তু এবিষয়ে কোন দোষ নাই, কারণ "প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ" হইয়া সভাপতিপদপ্রার্থীর উপহাস্যতা বরণ করিবার লোভ আমার বিশেষ নাই। আপনারা ধরিয়া বাঁধিয়া আমাকে উপহাস্য করিয়া তুলিলে আমি আর কি করিতে পারি বলুন ?

তবে আপনাদিগের এবংবিধ নির্ব্বাচন সম্পর্কে আমি যে একটু গবেষণা না করিয়াছি এমন নহে। গবেষণার নির্যাসটুকু আপনাদিগকে সেবন করাইতেছি। শুনা যায় যে প্রাতঃস্মরণীয় রাজা হবুচন্দ্র এবং তস্য মন্ত্রী গবুচন্দ্রের পার্থিব লীলা-নিকেতন ছিল এই রঙ্গপুর, এবং তাঁহাদিগের বিস্ময়কর কার্য্যকলাপ বিশ্ব-বিশ্রুত। সুতরাং তাঁহাদিগের রঙ্গভূমি রঙ্গপুরে যতই কেন অভাবনীয় ব্যাপার ঘটুক না, তাহাতে আর নূতন করিয়া বিস্ময় উৎপাদনের কারণ নাই। কাজেই হবুচন্দ্র-গবুচন্দ্রের স্বদেশবাসী আপনারা বাছিয়া বাছিয়া যে দেবুচন্দ্রকে সভাপতির আসনে বসাইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? যাক্, যখন বসাইলেনই, তখন দায়িত্ব আপনাদেরই। আমি বসিয়াই খালাস। দেখিবেন যেন আর কোন অঘটন না ঘটে। তাহা হইলেই সভাবসানে আমি মুক্তকণ্ঠে আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে পারিব।

সাহিত্যে প্রলাপ ও বিলাপ

আপনাদের রঙ্গপুরের রঙ্গমঞ্চে আমার আবির্ভাব বেশী দিনের নহে। বৎসরাধিক কাল হইল একবার রঙ্গপুরের তরুণেরা আমাকে ভাগীরথীর তীর হইতে টানিয়া ত্রিস্রোতার এই তটদেশ পর্য্যন্ত আনিয়াছিলেন ; কিন্তু আমি আবার পলায়ন করিয়া নির্ব্বিঘ্নে ভাগীরথীতীর-সমাশ্রিত হইতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু কিছুকাল পরে আবার রঙ্গপুরের প্রবীণেরা আমাকে গ্রেপ্তার করিযা আনিলেন। তাঁহারা প্রবীণ লোক কিনা—কাজেই তাঁহাদের বন্দোবস্তও কিছু পাকা ও কায়েমী রকমের। সুতরাং সহজে পলায়ন করিতে পারিলাম না। এমন কি, সেই যে ছেলেবেলায় উদ্ভট শ্লোক শুনিয়াছি—

রবেঃ কবেঃ কিং সমরস্য সারং
কৃষের্ভয়ং কিং কিমদন্তি ভৃঙ্গাঃ।
সদা ভয়ং চাপ্যভয়ঞ্চ কেষাম্
ভাগীরথীতীরসমাশ্রিতানাম্ ॥

—যে শ্লোকের নির্দ্দেশানুসারে ভাগীরথীতীরসমাশ্রিতদিগের কোন ভয়ের কারণ কদাপি হইতে পারে না—সেই সনাতন নির্দ্দেশও এই প্রবীণদিগের চক্রান্তেই বোধ করি বাতিল হইয়া গেল। এমনভাবেই কলকাঠি তাঁহারা ঘুরাইয়া দিলেন যে প্রতীচ্যের যুদ্ধ প্রাচ্যে আসিয়া পড়িল, দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ রাজেন্দ্র-চোল-প্রতিষ্ঠিত সিংহপুর হইতে বৃটিশ-সিংহের পাততাড়ি গুটাইতে হইল, ফলে এই ফাল্গুন-সন্ধ্যায় দোলপূর্ণিমার উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে মলয় হইতে ভাসিয়া আসিতে লাগিল—মলয়-

মারুত নহে, পাপিয়ার তান নহে—আসিতে লাগিল বোমার বিস্ফোরণ, কামান-গর্জ্জন, দম্ভোলি-গম্ভীর ভীষণ ঝঞ্ঝাবাত—আর আলোকমালাসজ্জিত ইন্দ্রপুরীসদৃশ গঙ্গাতীরস্থ মহানগরীর সকল আলোক নিবিয়া গেল সেই ঝঞ্ঝাবাতে—রহিল শুধু বহিঃকৃষ্ণ (Black-out)-এর অন্ধকার। তাই আর গঙ্গাযাত্রা করিতে সাহসে কুলাইল না, আপাততঃ রঙ্গপুরেই রহিয়া গেলাম। অত্রত্য প্রবীণদিগের চক্রান্তজাল এমনই তুর্ভেদ্য। এখন শুধু সংবাদপত্র পড়িতেছি, আর কালসাগরের লহরী গণিতেছি, আর রাজ্য-সাম্রাজ্যের উত্থানপতনের লীলা স্তম্ভিতভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি। আব্রহ্মস্তম্ব-পর্য্যন্ত যে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, তাহাতে ব্রহ্মে ত আগুন ধরিয়াছেই. আমরা যে স্তম্ব বা খড়কুটা মাত্র আমাদের দাহ কবে আরম্ভ হইবে সন্ত্রস্তচিত্তে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছি। সংক্ষেপতঃ আমার বিগত কয়েক মাসের রঙ্গপুর-প্রবাসের ইহাই ইতিহাস।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, এই ডামাডোলের মধ্যে আবার সাহিত্যিক মজলিস কেন? কার্ত্তিকেয়ের এই কোদণ্ড-টঙ্কারের মধ্যে দেবী বীণাপাণির বীণা-নিক্বণের অবকাশ কোথায়? একটা সহজ উত্তর অবশ্য অনায়াসেই দেওয়া যাইতে পারে। বাহিরের জগতে যতই তাণ্ডব-লীলা চলিতে থাকুক না কেন, দৈনন্দিন জীবনের চিরন্তন কার্য্যধারার বিশেষ ব্যাঘাত ত তদ্দ্বারা ঘটিবার নহে। রান্নাবাড়া, বাজার করা, আহার-নিদ্রা ইত্যাদি ত মোটামুটিভাবে চলিতেই থাকিবে। সমরাগ্নি যতই কেন উত্তপ্ত

হউক না, জঠরাগ্নিকে ত প্রশমিত রাখিতেই হইবে। কাজেই এই গুরুতর গণ্ডগোলের মধ্যেও মোটামুটিভাবে সংসারের কাজকর্ম্ম চলিবেই। তাই যদি চলে, তবে কাজকর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে একটু অবসর-বিনোদন, একটু অবকাশ-রঞ্জন, একটু কাব্যামৃত-রসাস্বাদন করিলে ক্ষতি কি? আর কিছু না হউক, উৎকট বাস্তবের নির্ম্মম বিভীষিকা হইতে ক্ষণিকের জন্যও ত মনটাকে নির্ম্মুক্ত করিয়া আনন্দ লাভ করা যায়। ইহাই কি কম লাভ?

কিন্তু শুধু এইটুকু কৈফিয়ৎ দিয়াই ক্ষান্ত হইতে আমি রাজী নহি। আরও একটু তলাইয়া দেখিতে চাহি। সাহিত্য-বিকাশের মূলে হইল মানবচিত্তের সৃজনী-শক্তি। ঘটনাচক্রের ঘাত-প্রতিঘাতে মানবমনে যে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়, সেই প্রতিক্রিয়ার একটা স্বাভাবিক প্রকাশ মানুষের সাহিত্যে; এবং চিত্ত যদি সজীব থাকে, তবে আঘাত যত প্রবল হয়, প্রতিক্রিয়াও ততই প্রবল হয়, এবং সাহিত্য-সৃষ্টিও ততই সতেজ ও সজীব হয়। ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এলিজাবেথের যুগে ইংরাজী সাহিত্যের, জুলিয়াস্ সীজার ও অগাষ্টাস্ সীজারের যুগে রোমক সাহিত্যের, পেরিক্লিসের যুগে গ্রীক সাহিত্যের, ফরাসী বিপ্লবের যুগে ইউরোপীয় সাহিত্যের, বিক্রমাদিত্যের যুগে ভারতীয় সাহিত্যের অপরূপ স্ফূর্ত্তি ও বিকাশ এই সত্যেরই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। আমাদের একান্ত নিজেদের এই বাঙ্গালা দেশেও স্বদেশী আন্দোলনের অগ্নিময় যুগে বঙ্গীয়সাহিত্য-প্রতিভার অপূর্ব্ব স্ফুরণও ইহার অপর এক দৃষ্টান্ত। ইহাদিগের কোনটাই নিছক

শান্তিময় যুগ ছিল না ; পরন্তু ছিল বিপ্লব-বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝাময় যুগ। এই রকম যুগেই ভয়াল ঝটিকাবর্ত্তে তরঙ্গিত হইয়া মানবের চিত্তবীণা শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে ; আর সেই রুদ্রঝঙ্কার মুমূর্ষু জাতির প্রাণেও নবজীবনের সঞ্চার করে। তাই যাঁহারা প্রচার করেন যে, পরিপূর্ণ শান্তিময় আবেষ্টনেই সাহিত্যের প্রকৃষ্ট বিকাশ সম্ভব, যাঁহারা মনে করেন যে সাহিত্যচর্চ্চা কাব্যালোচনা শুধু নিরুদ্বেল নিস্তরঙ্গ জীবনের বিলাসলীলা মাত্র, তাঁহারা ভ্রান্ত। জাতির প্রাণের সাধনার ধনকে তাঁহারা শুধু প্রসাধনসামগ্রী মনে করিয়া ভ্রম করেন। তাই বলিতেছিলাম, সমর-বিপ্লব জাতীয় সাহিত্য-সাধনার মোটেই প্রতিকূল নহে।

বস্তুতঃ সাহিত্যের সহিত জাতির প্রাণের যোগ অতি গভীর, অতি নিবিড়। সাহিত্য শুধু ব্যক্তিগত খেয়ালের নিবৃত্তি মাত্র নহে, ক্ষণিকের হেলাফেলার লীলাখেলা নহে কাজেই সাহিত্য যাঁহারা চর্চ্চা করেন, কাব্য যাঁহারা রচনা করেন, তাঁহাদের দায়িত্ব গুরুতর।

একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি এবং নৈরাশ্যের সহিতই লক্ষ্য করিয়াছি যে, সাহিত্যস্রষ্টাদিগের এই যে গুরু দায়িত্বভার, ইহার বোধ যেন ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে। সমাজের মঙ্গলের সহিত, দেশের কল্যাণের সহিত সাহিত্যের সম্পর্ক যে কত ঘনিষ্ঠ, তাহার অনুভূতি যেন ক্রমশঃই ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। শুধু যে বর্ত্তমান অতি-আধুনিক বা "সাম্প্রতিক" নামে আখ্যাত বাঙ্গালা-সাহিত্য লক্ষ্য করিয়াই এই কথা আমার

মনে হইয়াছে তাহা নহে, প্রায় সকল দেশেই, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দেশে, বিগত মহাসমরের পরবর্ত্তী যুগের সাহিত্য-প্রচেষ্টার ভিতরে এই ভাব অথবা অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। পূর্ব্বতন সাহিত্যাচার্য্যগণের মধ্যে যে নিষ্ঠা সম্ভ্রম গাম্ভীর্য্য দায়িত্বজ্ঞান দেখা যায়, তাহার ক্রমিক অবসান হইয়া সাহিত্য শুধু একটা চটুলতা, একটা কায়দা, একটা বাহাদুরী, একটা কসরতে পরিণত হইবার লক্ষণ দেখা দিয়াছে। শুধু intellectual gymnastics, technique বা কায়দার কসরত, বাক্য-বিন্যাসের অস্বাভাবিক মোচড়—যেন বেহালার pizzicato—দুরুচ্চার্য্য শব্দরাশির সাড়ম্বর সমাবেশ, আর ছন্দের বা নৈশ্ছন্দ্যের পাগলাঝোরা—ইহাতেই যেন সমরোত্তর "সাম্প্রতিক" কাব্যের "আধুনিকতা"। সমাজনীতি হিসাবে শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রসঙ্গ ত ছাড়িয়াই দিলাম। সে বিষয়ে ত কবি হিসাবে আধুনিকেরা একেবারেই নিরঙ্কুশ। কিন্তু ইহারা ভুলিয়া যান যে "শ্লীল" ও "শ্রীল" বস্তুতঃ একই অভিন্ন শব্দ—কারণ "রলয়োরভেদঃ"; সুতরাং যাহা শ্লীল নহে তাহা যথার্থ শ্রীল বা শ্রীমণ্ডিত হইতে পারে না, যাহা অশ্লীল তাহা কুশ্রী অসুন্দর অশোভন। কাজেই সাহিত্যের বিচারালয়ে Ethics এবং Aesthetics-এর নির্দ্দেশ উভয়ই তুল্য। রচনার ভিতরে সংযমের অভাব, শৃঙ্খলার অভাব, শালীনতার অভাব, নিষ্ঠার অভাব—Decadence বা অধোগতির এই সমুদয় লক্ষণই এখনকার সাহিত্যে অতিমাত্রায় প্রকটিত হইতেছে। তাই

সুগভীর মনঃক্ষোভে বিলাতের একজন আধুনিক কবি Thomas Thornely এই নিরর্থক নির্ব্বীর্য্য স্বৈরাচারের প্রতিকৃতি কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে ফুটাইয়া তুলিয়া নিজের মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন ঃ

"We tack no more of meaning to our song
Than clings to motions of a drifting log ;
Form, Grammar, Rhyme we spurn, such gauds belong
To simpering bard and brain-drugged pedagogue.
What else is left us ? Gone are codes and creeds
And smug conceits that waked Victorian lyres.
Mind is for us a string of worthless beads,
And life a fatuous round of balked desires."

শুধু এই বর্ত্তমান যুগেই যে এই মানসিক ব্যাধির লক্ষণ সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম দেখা দিয়াছে এমন নহে। বস্তুতঃ যখনই সামাজিক আবেষ্টন এবং জীবনযাত্রা-প্রণালী অতিমাত্রায় কৃত্রিম হইয়া পড়িয়া শুধু বিলাস-লালসারই ইন্ধন যোগায়, জীবন্ত প্রাণধারা লুপ্তপ্রায় হইয়া stagnation বা ক্লেদাক্ত নিশ্চল অবসাদের সৃষ্টি করে, তখনই প্রাণের যোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া সাহিত্য-প্রচেষ্টা শুধু একটা কৃত্রিম আলঙ্কারিকতা এবং কারিকরীতে পর্য্যবসিত হয়। Decadent যুগের সংস্কৃত সাহিত্যেও ইহার উদাহরণের অভাব নাই। কত কত অদ্ভুত রকমের শ্লোকের সৃষ্টি হইয়াছে সে যুগে—তাহাতে শব্দের সমাবেশের কি কারুকার্য্য, অক্ষর-বিন্যাসের কি বাহাদুরী,

"সর্ব্বতোভদ্র", "চক্রবন্ধ", প্রভৃতি ছন্দোবন্ধের কি বিচিত্র চাতুরী—লম্বালম্বি পাশাপাশি কোণাকুণি যে দিক্ দিয়াই পড়া যায় একই রকম হইবে—যেন এক একখানা magic square বা cross-word puzzle আর কি! এমন সব কাব্য রচিত হইয়াছে সে যুগে, যাহাদের রচনায় এমনই বাহাদুরী এমনই শ্লেষের বাহার যে এক অর্থে পড়িলে হয় রামায়ণের কাহিনী, আর এক অর্থে পড়িলে হয় মহাভারতের আখ্যান। এই সকলের রচনা-কৌশলের তারিফ করিতে হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত্ত রসসৃষ্টি ইহাকে বলে না, প্রাণবান্ সাহিত্য ইহাকে বলে না। কাব্যলক্ষ্মীর প্রাণ হইয়াছে অস্তমিত, রহিয়াছে যেন শুধু তাঁহার নিষ্প্রাণ দেহবল্লরীর প্রসাধন করিবার নিরর্থক প্রয়াস। ইহা প্রাণহীন নিস্তেজ decadence-এরই পরিচায়ক।

বর্ত্তমানে যে তরুণম্মন্য decadence-এর আবর্ত্তে আমরা পড়িয়াছি তাহাতে তারুণ্য কতটা আছে বলিতে পারি না, তবে আছে একটা অকালপক্কতা। ইহার একটা প্রধান লক্ষণ হইল দাম্ভিকতা—পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের সাহিত্যস্রষ্টাদিগের প্রতি একটা অপরিসীম অবজ্ঞার ভাব। রসজ্ঞান যেন শুধু আজিকালিকার "সাম্প্রতিক"-দিগেরই একচেটিয়া সামগ্রী—আর্ট সম্বন্ধে তাহারাই যেন একমাত্র সমঝ্দার—এই প্রকার একটা আত্মম্ভরিতা তাহাদের রচনার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। সে আজ প্রায় বছর পাঁচ ছয়েক হইল, আমি

তরুণিমা

কলিকাতার এক ছাত্রসভায় এক প্রবন্ধ পাঠ করি—বিষয় ছিল, "বঙ্গসাহিত্যে অর্ব্বাচীন যুগ।" তাহাতে অবশ্য আমার স্বভাবসিদ্ধ তীব্র সমালোচনা কিছু প্রচুর পরিমাণেই ছিল, এবং প্রসঙ্গক্রমে আজিকালিকার বাঙ্গালী তরুণ কবিদিগের এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত বাঙ্গালী কবি রঙ্গলাল, মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতির আলোচনাও ছিল। সভাবসানান্তে একটি যুবক আমাকে বলিলেন, "দেখুন, আপনি ত ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী কবিদের সম্বন্ধে এত বলিলেন, কিন্তু ওসব কি আবার কবি? ধরুন, নবীন সেন। নবীন সেন ত আর কবি নহেন।" এমন অম্লানবদনে যুবক এই কথাটি বলিলেন যেন নবীন সেন যে কবি নহেন, ইহা জ্যামিতির একখানি স্বতঃসিদ্ধ। ক্ষণেকের জন্য আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। তারপর সামলাইয়া লইয়া বলিলাম, "দেখ, নবীন সেন একেবারে কবিই নহেন, এ অমূল্য তথ্যটি কোথা হইতে আবিষ্কার করিলে? রঙ্গলাল-মাইকেল-হেমচন্দ্রও বোধকরি তোমার কাছে একেবারেই বাতিল হইয়া গিয়াছেন। রবি ঠাকুরও বুঝি যান যান। তাহা হইলে বাকী থাকিবে বাঙ্গালা দেশে দুইটি কবি—একটি তুমি, আর একটি আমি। কি বল?" আমার শ্লেষ তাহার বোধগম্য হইল কিনা তাহা অবশ্য আমি অবগত হইতে পারি নাই।

এইরূপ বিন্ধ্যপ্রমাণ ধৃষ্টতা কিংবা ধার্ষ্ট্যমো আমাদের এই সমরোত্তর অর্ব্বাচীন যুগের একটি অতি সুপ্রকট লক্ষণ। শুধু এদেশে নয়, বিদেশেও। এই "সাম্প্রতিক" অহমিকা এবং

আড়ম্বর সম্পর্কে অতি সম্প্রতি বিলাতের এক বিখ্যাত সমালোচনাপত্রে একটি অতি সুন্দর বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে :

"The growing mass of 'modernistic' stultifying criticism—the reading of which is a snare to the young and a dreary confusing waste to their elders—threatens to overlay and bury creative literature. Its chief presumption is that most things that were written before 1920 are obsolete because they expressed the views of a dying world. New expressions, new techniques are needed for the experiences of new senses —though what new senses men have acquired since the last war is never made known. Cliques and mutual admiration societies of venturesome speculative thinkers grow apace, and members acclaim each other's work for breaking new ground—new ground of intricate, esoteric symbolism. Poets add foot-notes to explain obscure historical and anthropological allusions. Novelists are of no account unless they have a new 'Fiction theory.' Critics are not true guides in interpretation, unless they can

supply the propaedeutic for an epistemological scheme which seeks to establish a philosophy of literary form." *(Times Literary Supplement)*

পাশ্চাত্য সাহিত্য-সমাজের এই আধুনিক চিত্রখানি পাশ্চাত্যের নকলনবীশ আমাদিগের আধুনিক বাঙ্গালার "সাম্প্রতিক" সাহিত্যসমাজেও হুবহু খাটিয়া যায়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে যাহা কিছু সাহিত্যসম্ভার আহৃত হইয়াছে, তাহা আলোচনার যোগ্যই নহে, আবর্জ্জনা মাত্র—ইহাই বাঙ্গালার "সাম্প্রতিক" লেখকগণেরও বদ্ধমূল সংস্কার বলিয়াই বোধ হয়। রাজনীতিক্ষেত্রেও অনুরূপ অহমিকার দৃষ্টান্ত অপ্রতুল নহে। যেমন গান্ধীভক্ত খদ্দরবিলাসীদিগের আস্ফালন—১৯২০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আবার ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল নাকি? কৌপীনবন্ত হইয়াই ত আমরা ভাগ্যবন্ত হইতে সুরু করিয়াছি। এই দাম্ভিকতার দাপটে আমাদের sense of values পর্য্যন্ত লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে! এই প্রসঙ্গে কবি কালিদাসের সেই পুরাতন উপদেশ মনে উদিত হয়ঃ

পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ॥

তবে ঈষৎ বদলাইয়া বলিতে ইচ্ছা হয়ঃ

"নবীনমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং ন চাপি কাব্যং পুরাণমবদ্যম্।"

যাক্, এই আড়ম্বর-আস্ফালন-অহমিকা ত গেল আধুনিক decadence-এর একটা দিক্।

সাহিত্যে প্রলাপ ও বিলাপ

আরও একটা দিক্ আছে। কিছুকাল হইতে সেটা বিশেষভাবে দেখা দিয়াছে। সেটাকে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে totalitarian বা সর্ব্বগ্রাসী দিক্। অর্থাৎ আধুনিকদিগের মধ্যে যাঁহারা কোন এক বিশেষ মতবাদের ভক্ত বা কোন বিশেষ ভাবের ভাবুক, তাঁহাদিগের দাবী এই যে যাহা কিছু সাহিত্য রচিত হইবে, তাহা কি গদ্য কি পদ্য, কি উপন্যাস কি প্রবন্ধ, সকলই সেই মতবাদ ও ভাবের প্রচারে নিয়োজিত হওয়া চাই। ভক্তির আতিশয্যে এবংবিধ দাবীতেও তাঁহাদের আশ মিটিতেছে না। তাঁহাদের অনুশাসন আরও সুদূরপ্রসারী। তাঁহারা ফতোয়া জারী করিতেছেন যে, যে সমস্ত রচনা উক্ত মতবাদ ও ভাবের প্রসার ও প্রচার কল্পে প্রণীত না হয়, তাহা সাহিত্যই নহে—অর্থাৎ propaganda সাহিত্যই একমাত্র সাহিত্য, আর যা কিছু তাহা নিতান্তই অপোগণ্ড সাহিত্য।

ইহাদিগের অনেকের মধ্যে আবার অতি দ্রুত মত-পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। কিছুকাল পূর্ব্বেও ইহাদিগের বেদবাক্য ছিল Art for Art's sake—শিল্প-কলা-সাহিত্যে কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না ; যদি থাকে, তবে উহা হইয়া পড়িল didactic, আর আর্ট-পদবাচ্য রহিল না—আর্ট হইবে স্বপ্রতিষ্ঠ"আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ"—ইহার কোন নীতি, কোন রীতি, কোন লক্ষ্য, কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। অর্থাৎ সাহিত্যের উৎকর্ষ আলাপে নয়, প্রলাপে—ইহাই ছিল ইঁহাদিগের মত। হঠাৎ একেবারে মত বদলাইয়া ঘড়ির দোলকের ন্যায় একেবারে দোলনের

অপর প্রান্তে গিয়া ইহারা রাতারাতি উপনীত হইয়াছেন। এখন ইহাদিগের মত এই যে আর্ট-শিল্প-কলা-সাহিত্যের উদ্দেশ্য ত থাকিতেই হইবে; তবে নানাবিধ উদ্দেশ্য থাকিলে চলিবে না, একই ছাঁচে ঢালা এক এবং অদ্বিতীয় উদ্দেশ্যের দিকে সমস্ত আর্ট সমস্ত সাহিত্যকে নিয়োজিত করিতে হইবে—অর্থাৎ একেবারে "একমেবাদ্বিতীয়ম্।" এবং যেহেতু এখনও বিশ্বের বিধি-ব্যবস্থা সেই উদ্দেশ্যের সর্ব্বতোভাবে অনুকূল হইয়া উঠে নাই, সুতরাং অধুনা সাহিত্যরচয়িতাদিগের একমাত্র কর্ত্তব্য হইতেছে তদ্বিষয়ে প্রতিবাদ করা, কোলাহল করা, চীৎকার করা, ক্রন্দন করা—গদ্যে, পদ্যে, ছন্দে, চিত্রে, গানে—অর্থাৎ এখনকার মত সাহিত্যের উৎকর্ষ আলাপে নয়, বিলাপে। কাজেই আমাদের মত নিরীহ সাবেকী ধরণের লোকদিগের বর্ত্তমানে "পরিস্থিতি" দাঁড়াইয়াছে বড়ই "গুরুত্বপূর্ণ"—একদিকে প্রলাপী "আধুনিক", অন্য দিকে বিলাপী "সাম্প্রতিক"—এতদুভয়ের মধ্যে পড়িয়া আমরা যে ভদ্রলোকের মত দুদণ্ড বৈঠকে বসিয়া সাহিত্যিক রসালাপ করিব তাহাও দুষ্কর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

উদ্দেশ্যবাদিগণের উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নাই—আর উৎসাহ ত অত্যুগ্র বটেই; অভাব যা কিছু তা শুধু রসজ্ঞানের। তবে কিনা, সাহিত্য হইল রসেরই সামগ্রী—প্রাচীনেরাও একথা জানিতেন, তাই তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন, "কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং"। যে কোন মতবাদ-সংবলিত রচনাই সাহিত্য-পদবীতে

উন্নীত হইতে পারে, যদি উহা রসাল হয়। এই কারণেই ইতিহাসের, দর্শনের, এমনকি বিজ্ঞানেরও অনেক গ্রন্থ—যাহাদিগকে সচরাচর সাহিত্যের পর্য্যায়ে ফেলা হয় না——শুধু লিপিচাতুর্য্য ও রসালতার গুণে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যরূপে পরিগণিত হইয়াছে। আবার, এই রসবস্তুর অভাবের দরুণই অনেক কাব্য-উপন্যাসও সাহিত্যের কোঠায় স্থান পায় নাই। বস্তুতঃ সাহিত্যের বৈশিষ্টা ততটা matter-এ নহে যতটা manner-এ ; ততটা বস্তুতে নহে যতটা রূপে, ততটা অঙ্গেতে নহে যতটা রঙ্গে। তাই যে শিল্পী রূপকার, যে লেখক রূপদক্ষ, তাঁহার তূলিকাতে তাঁহার লেখনীতে শিল্প ও সাহিত্য রসমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। তাই ভাববাদিগণের ভাবের উগ্রতা যতই হউক না কেন, তাহাতে যদি রস-সঞ্চার তাঁহারা না করিতে পারেন, তবে তাঁহাদের propaganda কখনও সাহিত্য হইয়া উঠিবে না।

আরও একটা কথা এ বিষয়ে বলিবার আছে। প্রাচীন একটা শ্লোক আছে ঃ

তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি ॥

জীবনধারণ ত তরুলতা পশুপক্ষী সকলেই করিয়া থাকে ; কিন্তু তাঁহাকেই প্রকৃতপ্রস্তাবে জীবন্ত মানুষ বলা যায় যিনি মনন দ্বারা জীবন ধারণ করেন। শিল্পীর জীবনের বিশেষত্বই এই মননে। বৃহৎ যন্ত্র সহযোগে এক ছাঁচে ঢালিয়া

হাজার হাজার দ্রব্যের যুগপৎ উৎপাদন—অর্থাৎ mechanized mass-production—তাহাতে যেমন আর্ট হয় না, তেমনই এই সাহিত্যিক সর্ব্বগ্রাসীদিগের যে আদর্শ, অর্থাৎ সকল মনুষ্যের চিত্তকেই একই ছাঁচে গড়িয়া তোলা, তাহাতে অনেক কিছুই হয়ত সৃষ্ট হইতে পারে—Fascism হইতে পারে, Nazism হইতে পারে, এমনকি Dictatorship of the Proletariat পর্য্যন্ত হইতে পারে—কিন্তু সরস সুস্থ সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। এই সর্ব্বগ্রাসী মনোবৃত্তিকে লক্ষ্য করিয়াই এক বিখ্যাত পাশ্চাত্য মনীষী বলিয়াছেন ঃ

"I see in the modern world a horrifying vision of volitionless stuffed men, head-piece filled with straw."

মানব-চিত্তের mechanized mass-production প্রচেষ্টার ইহাই অবশ্যম্ভাবী ফল।

অতিমাত্রায় অনুচিকীর্ষু আমাদের আধুনিক বাঙ্গালী সমাজে পশ্চিমের দেখাদেখি এই প্রকার propagandist-দিগের উৎপাত কিছুদিন ধরিয়া বেশ প্রবলভাবেই দেখা দিয়াছে। ইহাদের বেশীর ভাগই নাকি Marxist, অর্থাৎ বর্ত্তমানের Soviet বা "সভায়ত" (অর্থাৎ কৃষক-শ্রমিকদিগের সভা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত) রুশ সমাজ-পদ্ধতির মহাভক্ত। "সভায়ত" রুশতন্ত্রের প্রতি অতি-ভক্তিতে কাহারও আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না—আর আমাদের চিরমুখর বাঙ্গালাদেশে ত সভাসমিতির

প্রাদুর্ভাব যে প্রকার, তাহাতে এখানে "সভায়ত"-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে বলিয়াও মনে হয় না ; কিন্তু তথাপি কলম ধরিলেই যে রুশ-প্রশস্তি রচনা করিতে হইবে, এ রকম হুকুম হইলে যেন বড় জুলুম বলিয়া মনে হয়। আমাদের স্থানীয় Nazi-Fascist বন্ধুগণই বা ছাড়িবেন কেন ? উত্তাপ ত তাঁহাদিগেরও কম নহে। বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা ?

বস্তুতঃ প্রলাপ এবং বিলাপ—এই যে দ্বিবিধ ব্যাধি, ইহাদিগের কবল হইতে সাহিত্যকে রক্ষা করিতে হইবে, সাহিত্যকে সুস্থ সবল স্বাধীন করিতে হইবে। আবেষ্টনের সঙ্ঘাতে ব্যষ্টি-মনের যে প্রতিক্রিয়া—তাহার সহজতা, স্বাভাবিকতা এবং স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতে হইবে। তবেই জীবন্ত সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে। কোন মনগড়া ক্ষণস্থায়ী theory বা মতবাদের খাতিরে সমস্ত স্বাধীন মনন-শক্তি নিষ্পিষ্ট করিয়া মানবসমাজকে মস্তিষ্ক-বিহীন ক্রীড়নক বা robot-এর সমষ্টিতে পরিণত করিবার প্রচেষ্টা করিলে চলিবে না। অপর পক্ষে, সাহিত্যকে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত খেয়াল বা উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির ক্রীড়নকরূপে দেখিলেও চলিবে না, শুধু অবসর-বিনোদনের অলস-বিলাসের সামগ্রী মনে করিলেও চলিবে না ; কারণ এইরূপ করিলে সাহিত্যপ্রচেষ্টা সমাজকল্যাণের পরিপন্থী হইয়া উঠিতে পারে, এবং তাহা হইলে কি সমাজ কি ব্যক্তি কেহই "মহতী বিনষ্টি"-র হাত হইতে পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হয় না। তাঁহাদিগের সমুদয় সাহিত্য-প্রচেষ্টার মধ্যে যদি আমাদের লেখকগণ এই সংযম, এই সামঞ্জস্য, এই

কল্যাণাদর্শের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া রসসৃষ্টি করিতে পারেন, তবেই তাঁহাদিগের সমস্ত শ্রম সার্থক হইবে।

আর সর্ব্বোপরি আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সমস্ত সৃষ্টির মূলে—কি জীবসৃষ্টি, কি সমাজসৃষ্টি, কি সাহিত্যসৃষ্টি—সকলেরই মূলে চাই বীর্য্য, চাই তেজ, চাই প্রাণ। জাতীয় জীবনের প্রাণধারার সঙ্গে অব্যাহত যোগ রাখিতে হইবে সাহিত্যিকের—নচেৎ সাহিত্য হইয়া পড়িবে শুষ্ক, ঊষর, নিষ্ফল। জাতির বিবিধ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে সাহিত্যিকের—পলায়নী-মনোবৃত্তি লইয়া, escapist হইয়া, দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত বিলাস-স্তম্ভোপরি কল্পলোকের আশ্রয় লইলে চলিবে না। নির্ভীক ভাবে বীর্য্যের সঙ্গে তেজস্বিতার সহিত সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। আমাদের এই অতি প্রাচীন দেশে যে অতি দীন দরিদ্র লক্ষ লক্ষ জনগণ বসবাস করিতেছে, তাহাদের

এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা ; এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।

কবি ও সাহিত্যিকের সাড়া দিতে হইবে রবীন্দ্রনাথের আকুল আহ্বানে ঃ

কবি, তবে উঠে এস—যদি থাকে প্রাণ,
তবে তাই লহ সাথে, তবে তাই কর আজি দান !
বড় দুঃখ, বড় ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার।

সাহিত্যে প্রলাপ ও বিলাপ

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট ! এ দৈন্য-মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি !

বাঙ্গালার দেশভক্ত কবি রবীন্দ্রনাথ এই যে ভাস্বর আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের সাহিত্যব্রতিগণের কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে—রঙ্গময়ী কল্পনার মায়ার ছলনে প্রলুব্ধ হইয়া সেই কর্ত্তব্যে অবহেলা করিলে প্রত্যবায় হইবে। আজ বাঙ্গালার গৌরবময় অগ্নিযুগের স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম পীঠস্থান রঙ্গপুরে সমাসীন হইয়া—"বন্দে মাতরম্" মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ" ও "দেবী চৌধুরাণী"-র অমরস্মৃতি-বিজড়িত রঙ্গপুরের এই পুণ্যভূমিতে অধিষ্ঠিত হইয়া —এবিষয়ে বেশী বলা বাহুল্য মাত্র।

আমাদিগের সারস্বত সমাজের সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত সাধনা, সমগ্র শক্তি নিয়োজিত হউক দেশের ও সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণকল্পে—পরিপূর্ণ মুক্তিকল্পে। ভগবতী ভারতী আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। বন্দে মাতরম্।

দোলপূর্ণিমা
১৭ই ফাল্গুন, ১৩৪৮।
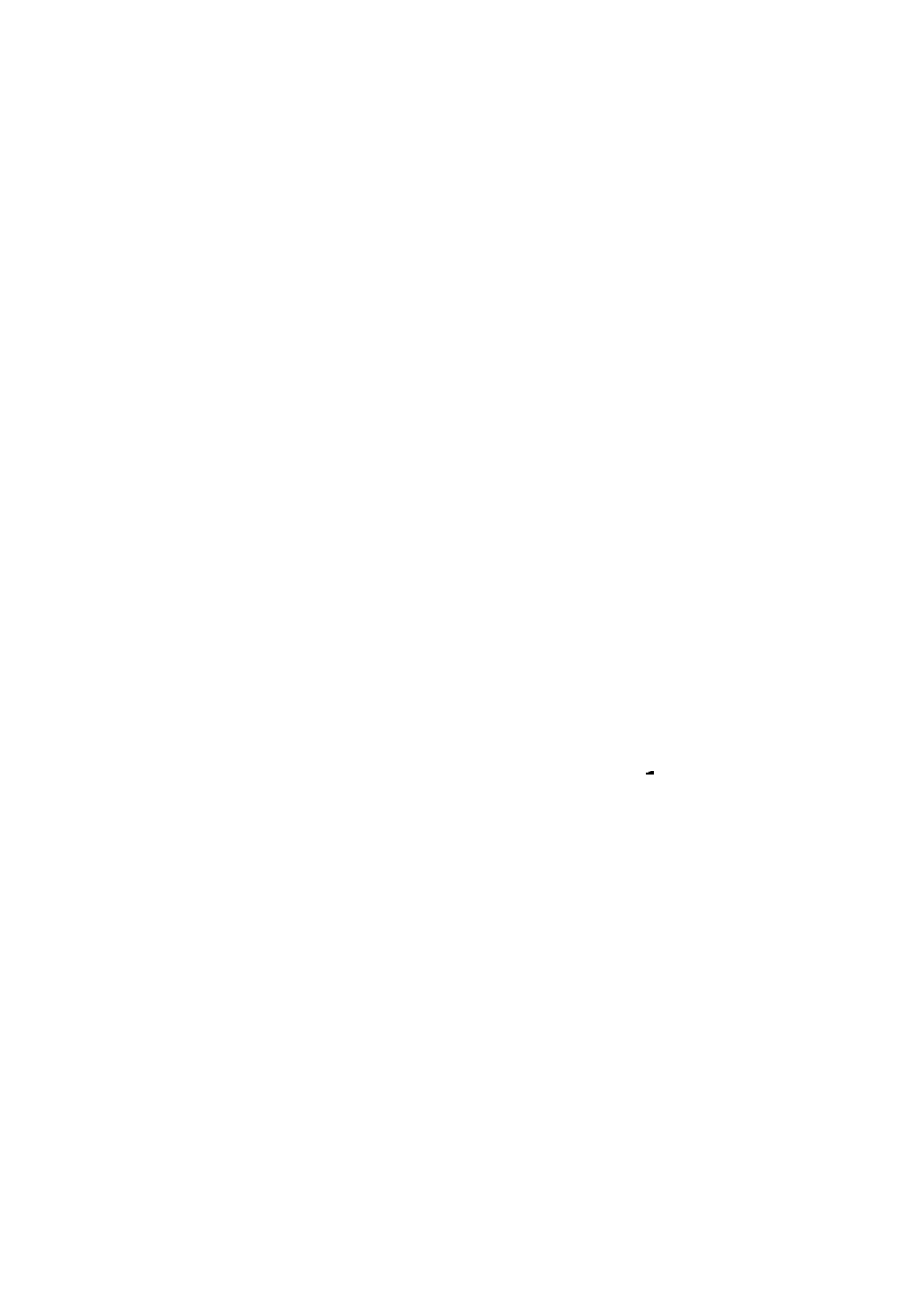
ছিন্ন-বঙ্গে শিক্ষা-সঙ্কট

ছিন্ন-বঙ্গে শিক্ষা-সঙ্কট

[নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক-সম্মিলনীর বিষ্ণুপুর অধিবেশনে
সভাপতির অভিভাষণ]

আজ নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক-সম্মিলনীর অধিবেশনে সভাপতি-রূপে কার্য্য করিবার জন্য আপনারা যে আমাকে আহ্বান করিয়াছেন তজ্জন্য আপনারা আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিবেন। বিশেষতঃ বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর আজিকার এই অভাবনীয় সঙ্কটের সময়ে আমাকে যে আপনারা আপনাদের এই গুরুদায়িত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের কর্ণধাররূপে নিযুক্ত করিয়াছেন, ইহা আমার প্রতি আপনাদের আন্তরিক স্নেহ ও প্রগাঢ় আস্থারই পরিচায়ক। আপনাদের সেই স্নেহের উপর ভরসা করিয়াই আপনাদের আহ্বানে সাড়া দিতে আমি সাহসী

হইয়াছি। আশা করি আমার দোষ-ত্রুটি-অক্ষমতা আপনারা স্নেহগুণে মার্জ্জনা করিবেন, এবং অধিবেশনের কার্য্য যাহাতে সুসম্পন্ন হয় তজ্জন্য আপনারা সকলে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করিতে কার্পণ্য করিবেন না। আমি বিশ্বাস করি যে সকলের সমবেত প্রচেষ্টা থাকিলে সম্মিলনীর বর্ত্তমান অতি গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন অবশ্যই সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

আমার বিশেষ ভরসা এই যে আমি আপনাদের ও আপনাদের প্রতিষ্ঠানের নিকট নিতান্ত অপরিচিত নহি। বহুদিন যাবৎ আপনাদের শিক্ষক-সমিতির যাঁহারা কর্ম্মকর্ত্তা, তাঁহারা অনেকেই অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়া বাধিত ও সম্মানিত করিয়াছেন। এখনও মনে পড়ে চারি বৎসর পূর্ব্বে, ১৯৪৬ সনের এপ্রিল মাসে, আপনাদের এই সম্মিলনীর দিনাজপুর অধিবেশনের কথা। আমি তখন রঙ্গপুরে ছিলাম। সেই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু ডাক্তার শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা মহাশয়। ঠিক তাহারই অনতিপূর্ব্বে আমারই আহ্বানে ডাক্তার সাহা রঙ্গপুরে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আমি রঙ্গপুর হইতে রওয়ানা হইয়া এক সূর্য্যালোকিত প্রভাতে দিনাজপুর পৌঁছিয়াছিলাম। তারপর আপনারা আমাকে সম্মিলনীর অধিবেশন উদ্বোধন করিতে আহ্বান করিয়া সাতিশয় সম্মানিত করিয়াছিলেন। সেদিন সভাতে সম্মিলনীর প্রতিনিধিদিগের মধ্যে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তাহা আজিও

আমার স্মৃতিপটে স্পষ্টরূপে অঙ্কিত রহিয়াছে। তখনও অনেক সমস্যা ছিল, অসন্তোষের অনেক কারণ ছিল, শিক্ষকদিগের আর্থিক দুরবস্থা ও তাঁহাদিগের প্রতি সরকারী ঔদাসীন্য সকলকে পীড়া দিতেছিল—এ সকলই ছিল; কিন্তু তথাপি সেদিনের সঙ্গে এদিনের অনেক প্রভেদ। এই চারি বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশের ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অনেক কিছু ঘটিয়া গিয়াছে। তাহার ফলাফল আজ হাড়ে হাড়ে আমরা সকলে অনুভব করিতেছি।

সেদিন যখন সমস্যার উদ্ভব হইত এবং তজ্জনিত চাঞ্চল্য উপস্থিত হইত, তখন আমরা ভাবিতাম যে শাসনযন্ত্র যখন বহুল পরিমাণে বিদেশীর করকবলিত, তখন ত সৌজন্য ও সহানুভূতির অভাব হইতেই পারে। কিন্তু জানিতাম যে বিদেশীর শাসনের অবসান আসন্ন—দ্রুতবেগে তখন ভারতের রাষ্ট্রমঞ্চে পট-পরিবর্ত্তন হইতেছিল—কাজেই চিত্তের অন্তঃস্থলে এই আশাই তখন উদিত হইত যে আর কয়টা দিন কোনমতে কাটাইয়া দিতে পারিলেই হয়, কোনমতে সবুর করিতে পারিলেই হয়। কোন ভয় নাই; অচিরেই যখন রাষ্ট্রযন্ত্র আমাদিগের নিজেদের ও নিজেদের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের করায়ত্ত হইবে, তখন আমাদের সকল সমস্যার সমাধান হইবে, সকল কষ্টের অবসান হইবে। কাজেই আশা, উৎসাহ ও উদ্দীপনার তখন কোন অভাব ছিল না—তৎকালীন সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও।

কিন্তু আজ সে অবস্থার বিপুল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বিদেশীরা চলিয়া গিয়াছে—দেশের নেতৃবর্গের হস্তে সম্পূর্ণ শাসনভার ন্যস্ত করিয়া। রাষ্ট্রনৈতিক হিসাবে আমাদের এই সুপ্রাচীন ভারতভূমি স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে গুরুতর দায়িত্বও আসিয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে যখনই কোন অন্যায় অবিচার অনাচার ঘটিত, আমরা তখনই অচিরাৎ বিদেশী শাসনকর্ত্তাকে তজ্জন্য দায়ী এবং অপরাধী ঘোষণা করিতাম, এবং নিজেদের ক্রটি ও অকর্ম্মণ্যতার দায়িত্ব বহুল পরিমাণে লাঘব করিবার প্রয়াস পাইতাম। কিন্তু আজ আর সেই সহজ সুবিধাটুকু নাই—দোষ ও গুণ সবটুকুরই পরিপূর্ণ দায়িত্ব এখন নিজেদের স্কন্ধেই লইতে হইতেছে। তথাপি স্বশাসন, স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা—ইহার মস্ত একটা নৈতিক মূল্য আছে—পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের পথ ইহাতে সুগম করিয়া দেয়। নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধান করিবার প্রচেষ্টা এবং সেই প্রচেষ্টায় সাফল্য-লাভ জাতীয় জীবনে নবশক্তি ও নূতন প্রেরণার সঞ্চার করে।

আক্ষেপের বিষয় এই যে, রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন ভারতের স্বাধীনতাই শুধু আনয়ন করে নাই, ভারতের অঙ্গচ্ছেদও আনয়ন করিয়াছে। সাময়িক সুবিধা ও স্বস্তি লাভের জন্য, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবিষ কথঞ্চিৎ প্রশমনের নিমিত্ত, সস্তায় ও সুলভে স্বরাজ পাইবার লোভে, এক দুর্ব্বল মূহূর্ত্তে, জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবর্গ, ভারতবর্ষের জনগণের মতামতের অপেক্ষা

না করিয়াই, মাতৃভূমির অঙ্গচ্ছেদ অঙ্গীকার করিয়া লইলেন। সেই মাতৃঘাতের প্রায়শ্চিত্ত আজ সকলেরই করিতে হইতেছে —এই দীর্ঘ তিন বৎসর ধরিয়া—আর কতদিন করিতে হইবে বিধাতাপুরুষই বলিতে পারেন। কিন্তু এই প্রায়শ্চিত্তের প্রধান অংশ গ্রহণ করিতে হইয়াছে পঞ্চনদের ও বঙ্গভূমির—তিন বৎসর পূর্ব্বে পঞ্চনদ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, আজ বঙ্গভূমি বিধ্বস্তপ্রায়।

ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, পূর্ব্বের যে সমস্ত সমস্যা ছিল তাহা ত পুরাপুরি আছেই—তা কি শিক্ষা বিষয়ে, কি অন্নবস্ত্রের বিষয়ে, কি অন্যান্য বিষয়ে; তদুপরি অস্বাভাবিকভাবে দেশ-বিভাগ ও তৎফলে সমাজ-বিভাগের দরুণ নূতন নূতন নানাবিধ উৎকট সমস্যা দেখা দিয়াছে। ইহাদের আশু সমাধানের প্রচেষ্টা না হইলে সমগ্র বাঙ্গালী সমাজ ও বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎ ভয়াবহ মনে হইতেছে।

আজ আমরা শিক্ষক-সম্মিলনীতে সকলে সমবেত হইয়াছি —সুতরাং শিক্ষা সম্পর্কে যে সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে তদ্বিষয়েই সবিশেষ আলোচনা আবশ্যক। বর্ত্তমানে বাঙ্গালাদেশের শিক্ষা-সঙ্কট কি? সকলেই জানেন যে কংগ্রেসী নেতৃবর্গ যখন ভারতবর্ষের অঙ্গচ্ছেদে সম্মতি দান করিলেন, তখন বাঙ্গালার যে অংশ বহুল পরিমাণে হিন্দু-অধ্যুষিত, অন্ততঃ সে অংশ যাহাতে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ইস্‌লামী আওতায় পড়িয়া বিপন্ন না হয়, তজ্জন্য আন্দোলনের ফলে বাঙ্গালার পশ্চিমাংশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইল, কিন্তু পূর্ব্বাংশ পাকিস্তানে পড়িয়া রহিল।

"সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।" বঙ্গেরও অঙ্গচ্ছেদ হইল; বৃহত্তর অংশ অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গ থাকিয়া গেল ভারতবর্ষের বাহিরে—ইস্‌লামী আওতায়। এবং এই দুই অংশ শুধু দুইটি প্রদেশমাত্র রহিল না, ইহারা দুইটি পৃথক্ স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইল; এক বঙ্গের অধিবাসী অপর বঙ্গে বিদেশী বা foreigner হইয়া গেল। অথচ, বাঙ্গালী সমাজ অবিচ্ছেদ্য; পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনে সমগ্র বাঙ্গালার সমস্ত জেলা সমস্ত অংশ একসূত্রে গ্রথিত। যানবাহন ও অর্থনৈতিক সম্পর্কেও উভয় অংশ অবিচ্ছেদ্য। সুতরাং একটা সুসংবদ্ধ সুগঠিত জীবদেহকে মাঝখান দিয়া কাটিয়া ফেলিলে যে অবস্থা হয়, সেই অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হইল এই দেশ-বিভাগে। বাঙ্গালার পক্ষে বিশেষ করিয়া অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে এই বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ উপলক্ষ্য করিয়াই স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল—যে আন্দোলন কালক্রমে স্বাধীনতা-সংগ্রামে রূপান্তরিত হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসারিত হইয়া অবশেষে বিদেশী শাসনের অবসান ঘটাইতে সমর্থ হইল; আর আজ সেই বিদেশী শাসনের অবসানে স্বাধীনতার প্রথম প্রভাতে সেই বঙ্গেরই অঙ্গচ্ছেদ মর্ম্মান্তিক ভাবে সজ্ঘটিত হইল। বিধির বিড়ম্বনা আর কাহাকে বলে?

যাক্। আজ প্রায় তিন বৎসর হইল এই অঙ্গচ্ছেদ ঘটিয়াছে। সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গে সেই সময় হইতেই ইস্‌লামী রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রভাবে হিন্দুর প্রতিকূল একটা হাওয়া বহিতে

লাগিল। নানা কারণে, সামাজিক চাপে, অর্থনৈতিক কৃচ্ছ্রতায়, ধর্ম্ম ও আচারমূলক বৈষম্যে, শিক্ষার আদর্শের প্রতিকূলতায়, ক্রমশঃই পূর্ব্ববঙ্গবাসী বিশাল হিন্দু-সমাজের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। তাঁহারা বোধ করিতে লাগিলেন যে পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুর কোন ভবিষ্যৎ নাই; তাঁহাদের সন্তানসন্ততির খাটিয়া খাইবার, উপার্জ্জনপূর্ব্বক সসম্মানে জীবনধারণের কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং যাঁহাদের সামর্থ্য আছে তাঁহারা ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে—বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে—চলিয়া আসিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের বিদ্যালয়গুলি অধিকাংশই হিন্দুদিগের প্রতিষ্ঠিত এবং হিন্দুদ্বারা পরিচালিত; শিক্ষকগণও বেশী পরিমাণেই হিন্দু। হিন্দুদিগের ক্রমিক দেশত্যাগের দরুণ কাজেই এই সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি—কি স্কুল, কি কলেজ, সবগুলিই, অল্পাধিক পঙ্গু হইতে লাগিল। এই ত গেল পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থার ক্রমিক পরিণতি। পশ্চিমবঙ্গে এতগুলি নূতন আগন্তুকের আবির্ভাবে অন্যবিধ সমস্যার উদ্ভব হইল। একেই পশ্চিমবঙ্গ আয়তনে সঙ্কীর্ণ—সমগ্র বঙ্গদেশের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ আন্দাজ—তারপর অত্যন্ত জনবহুল; সুতরাং আগন্তুক পূর্ব্ববঙ্গবাসীর চাপে ক্রমশঃই পশ্চিমবঙ্গ বিব্রত বোধ করিতে লাগিল। সহানুভূতির অভাবে নহে, সামর্থ্যের অভাবে।

তবুও দেশ-বিভাগের পর প্রথম আড়াই বৎসর কাল পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থা হিন্দুদিগের পক্ষে কষ্টকর ও

অসম্মানজনক হইলেও, কতকটা সহনীয় ছিল। বরঞ্চ ধীরে ধীরে অনেকের মনে আশা হইতেছিল যে—কি হিন্দু বাঙ্গালী, কি মুসলমান বাঙ্গালী—বাঙ্গালী মাত্রেরই যে একটা নিবিড় বন্ধন আছে, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্যের মধ্য দিয়া সেই বন্ধন অচিরে পুনরায় হিন্দু-মুসলমানকে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করিবে, রাষ্ট্রনৈতিক কারণে যে সাম্প্রদায়িক ঈর্ষ্যাদ্বেষের বিষবাষ্প সমাজ-শরীরকে অবসন্ন করিয়াছিল তাহা কাটিয়া গিয়া বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানকে সৌভ্রাত্র্যে পুনর্দ্দীক্ষিত করিবে।

কিন্তু অকস্মাৎ সে আশা ধূলিসাৎ হইয়া গেল। বিগত শিবরাত্রির পুণ্য সপ্তাহে যে অশিব তাণ্ডব সুরু হইল সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে—ভূত-প্রেত-পিশাচ-প্রমথের তাণ্ডবও বুঝি তাহার নিকট নিষ্প্রভ হইয়া যায়। আড়াই বৎসর ধরিয়া ইস্‌লামী জনগণের ভিতরে হিন্দুর বিরুদ্ধে যে প্রতিকূল বায়ু বহিতেছিল, সেই বায়ু সহসা ভীম প্রভঞ্জনে পরিণত হইয়া সমস্ত বিশাল বিস্তৃত পূর্ব্ববঙ্গের—পদ্মা-মেঘনা কর্ণফুলী-সুরমা কীর্ত্তনখোলা-মধুমতী বিধৌত সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গের—ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্দ্ধন, সমস্ত স্তরের হিন্দু-সমাজের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে ঝটিকাবর্ত্তের মুখে শুষ্কপত্রের ন্যায় উড়াইয়া লইয়া চলিল। এরূপ আকস্মিক প্রচণ্ড সর্ব্বগ্রাসী বিপ্লবের তুলনা বোধ করি ইতিহাসে বড় একটা মিলে না—অথবা শুধু মিলে স্বাধীন ভারতের প্রথম বৎসরে পঞ্চনদের আলোড়নের সঙ্গেই মাত্র।

ছিন্ন-বঙ্গে শিক্ষা-সঙ্কট

বাঙ্গালার যে সঙ্কট, বিশেষতঃ পশ্চিম বাঙ্গালার যে সমস্যা, ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতেছিল, অকস্মাৎ তুমুলবেগে সেই সমস্যা ও সঙ্কট আছ্‌ড়িয়া পড়াতে দেশ এখন হাবুডুবু খাইতেছে। কি সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ, কি জনসাধারণ, সবাই দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন—এই বিষম সঙ্কটে কি করা যায় —বাঙ্গালীকে, তাহার সংস্কৃতিকে, তাহার জীবনাদর্শকে, তাহার ভবিষ্যৎকে কি প্রকারে বাঁচাইয়া রাখা যায়, ইহা ভাবিয়া। বিষম সমস্যা—সত্যই বাঙ্গালীর পক্ষে একেবারে জীবন-মরণ সমস্যা। আমি সমালোচনা করিতে চাহি না—দোষ-ত্রুটি আমাদের সকলেরই আছে—সরকারের ঔদাসীন্য আছে, কর্ম্মে অপটুতা আছে, জনসাধারণেরও কর্ম্ম-বিমুখতা ও জড়তা আছে—সবই ঠিক। কিন্তু আজ এই সঙ্কট-মুহূর্ত্তে দোষানুসন্ধানের অবকাশ নাই; সকলের সঙ্গে পরিপূর্ণ সহযোগিতায় কি প্রকারে এই ছিন্নমূল ছন্নছাড়া যাযাবরে পরিণতপ্রায় বাঙ্গালী সমাজকে রক্ষা করা যায়, আশ্রয় দেওয়া যায়, পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহাই আশু চিন্তনীয়।

শুধু শিক্ষার বিষয়েই একবার দৃষ্টি দেওয়া যাউক। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদিগের কি দুরবস্থা হইয়াছে তাহাই দেখা যাউক। পূর্ব্ববঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রায় বার শত হাইস্কুল ছিল, মাইনর ও প্রাইমারী স্কুলের কথা ত ছাড়িয়াই দিলাম। বিগত ফাল্গুন-চৈত্রে পূর্ব্ববঙ্গের বীভৎস তাণ্ডবের ফলে এই সমস্ত বিদ্যালয়ের অধিকংশই বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

হিন্দু শিক্ষকগণ প্রাণভয়ে সপরিবারে চলিয়া আসিয়াছেন, হিন্দু ছাত্রগণও বহুল পরিমাণে পড়াশুনা ত্যাগ করিয়াছে। গড়ে মোটে আট জন শিক্ষক প্রতি স্কুল হইতে চলিয়া আসিয়াছেন আন্দাজ করিলেও প্রায় দশ হাজার হিন্দু অভিজ্ঞ শিক্ষক বাস্তু-হারা জীবিকা-হারা হইয়া পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থী হিসাবে আসিয়া পড়িয়াছেন ধরিতে হইবে। মাইনর ও প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকগণকে গণনা করিলে বোধ করি আরও হাজার দশেক হইবে। এই যে বিশ হাজার দরিদ্র অভিজ্ঞ শিক্ষাব্রতী বিপত্তির ও অসহায়তার নিম্নতম কূপে নিমজ্জিত হইয়া আপনাদিগের দ্বারস্থ হইয়াছেন, ইহাদিগের কি ব্যবস্থা আপনারা করিবেন? আমি জানি আপনাদের সহানুভূতির অভাব নাই। কিন্তু শুধু সহানুভূতি দ্বারা ত সমস্যার সমাধান সম্ভবপর নহে। আবশ্যক ধীর স্থির সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা, এবং আশু তাহাকে কার্য্যে পরিণত করা। আপনাদের শিক্ষক-সমিতি এ বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্ন করিতেছেন, তাহা আমি জানি; এবং তজ্জন্য সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গবাসী শিক্ষক-সমাজের পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। কিন্তু শুধু এই সমিতির একার ত একাজ নহে; প্রধানতঃ দরকার, সরকারী পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা।

সরকারী তরফ হইতে আজকাল নানা প্রকার শিক্ষাসম্বন্ধীয় dispersal বা বিকেন্দ্রীকরণ অর্থাৎ ছড়াইয়া দিবার প্রচেষ্টা হইতেছে। এই প্রসঙ্গে শরণাগত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদিগের

বিষয়ে একটা কথা মনে হইতেছে। এ যাবৎ পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যত লোক আসিয়া পড়িয়াছে তাহার সংখ্যা বোধ করি পঞ্চাশ লক্ষের কাছাকাছি হইবে। পরে হয়ত আরও আসিবে। সে কথা এখন থাকুক। এই বিপুল জনসংখ্যার মধ্যে যাহারা বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ছিল পূর্ব্ববঙ্গে, তাহারা তত্রত্য বিদ্যালয়সমূহেই পঠনপাঠন করিত, অর্থাৎ বার শত হাই স্কুলে এবং বহু মাইনর ও প্রাইমারী স্কুলে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গেও সেই পরিমাণ স্কুলের ব্যবস্থা করিলে শিক্ষার্থীদিগেরও শিক্ষার বন্দোবস্ত হয়, এবং তাহাদের শিক্ষাকার্য্যে শরণার্থী শিক্ষকগণকে নিযুক্ত করিলে তাঁহাদের জীবিকাসমস্যারও কতকটা সমাধান হয়। একেবারে নূতন করিয়া এতগুলি বিদ্যালয় স্থাপন অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য, এবং খুব তাড়াতাড়ি করিয়া উঠা সম্ভবপর মনে হয় না। তাই একটা কথা আমার মনে হইতেছে। আপনাদের অবগতির জন্য তাহা নিবেদন করি।

জনসাধারণে ও সরকারে মিলিয়া ভাল ভাল কেন্দ্রে যতগুলি নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারেন করুন; কিন্তু তদ্ব্যতীত, পশ্চিমবঙ্গে এখনই যে প্রায় হাজারখানেক হাই-স্কুল রহিয়াছে, তাহাদেরই সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া সকালে দুপুরে সময়-ব্যবস্থা (বা shift) করিয়া, তথায় শরণার্থী শিক্ষকদিগকে এই নূতন শাখা-বিদ্যালয়গুলিতে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিলে স্বল্পব্যয়ে এবং অল্পসময়ের মধ্যেই শরণাগত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদিগের সমস্যার যুগপৎ অনেকটা সমাধান

হইতে পারে। এই প্রস্তাবকে কার্য্যে পরিণত করিলে, সরকারের dispersal প্রচেষ্টাও বহুল পরিমাণে ফলবতী হইবে ; কারণ পশ্চিম বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলার সদরে, মহকুমা-কেন্দ্রে ও গ্রামদেশে এই সমস্ত বিদ্যালয়গুলি অবস্থিত। যে সমস্ত লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা পরিবার পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আসিতেছে, তাহাদিগকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সহরে ও গ্রামে বসাইতে পারিলে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে। এই ভাবে শুধু কলিকাতা মহানগরীতে কেন্দ্রীভূত না করিয়া পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বত্র ভূমির, জীবিকার ও বসবাসের ব্যবস্থা যদি সরকারী প্রচেষ্টা দ্বারা সম্ভব হয়, তাহা হইলে শরণার্থী পূর্ব্ববঙ্গবাসীর আশ্রয়দান ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদিগের জীবিকা ও শিক্ষালাভেরও একটা সুবন্দোবস্ত হয়। হাইস্কুল সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, মাইনর ও প্রাইমারী স্কুল সম্বন্ধেও সেই কথাই প্রযোজ্য। পশ্চিমবঙ্গে বর্ত্তমানে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলিতেই একটা নূতন শাখা স্থাপন করিবার এই যে প্রস্তাব, ভরসা করি আপনারা সকলে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ সহৃদয়তার সহিত তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। পশ্চিমবঙ্গে সমস্যাটি যে আকারে দেখা দিয়াছে, এই গেল তাহার সমাধানের একটা ইঙ্গিত।

আর পূর্ব্ববঙ্গের সমস্যার কথা? সেখানে ত বলিতে গেলে শিক্ষা-ব্যবস্থা, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান একেবারে ভাঙ্গিয়াই

পড়িয়াছে—বিশেষতঃ হিন্দু অধিবাসীদের পক্ষে। কার্য্যতঃ একেবারে collapse বলিলেই হয়। তদ্বিষয়ে আপনাদের শিক্ষক-সমিতি বর্ত্তমান রাষ্ট্রনৈতিক পরিবেশে বিশেষ যে কিছু করিয়া উঠিতে পারিবেন এমন ভরসা করা শক্ত। কারণ অবস্থার চাপে আপনাদের কর্ম্মের পরিধি ক্রমশঃই বহুল পরিমাণে পশ্চিমবঙ্গের ভিতরেই সীমাবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। আমরা শুধু এখানে পশ্চিমবঙ্গে বসিয়া এইটুকুই কামনা করিতে পারি যে হিন্দু-সমাজের যে অংশ এখনও পূর্ব্ববঙ্গে রহিয়াছেন,তাঁহারা যেন যথাসাধ্য চেষ্টা করেন তাঁহাদের নষ্টপ্রায় মনোবল পুনরায় সংহত করিতে, যাহাতে নিতান্ত প্রতিকূল অবস্থার ভিতরেও তাঁহারা সসম্মানে নিজেদের শিক্ষা-সংস্কৃতি-স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারেন।

দেশ-বিভাগ-ঘটিত সমস্যা ও শরণাগত শিক্ষক ও শিক্ষার্থী-দিগের দুরবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইয়া গেল, অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। সমস্যার গুরুত্ব বিধায় ও দুরবস্থার ব্যাপকতা বিধায় ভরসা করি আপনারা আমার ত্রুটি লইবেন না।

কিন্তু হঠাৎ দেশের উপর আপতিত এই উৎকট সমস্যা ছাড়াও আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার সম্বন্ধে অনেক কিছু ভাবিবার আছে। বহুদিন হইতেই এই সব বিষয়ে আন্দোলন-আলোচনা চলিতেছে; উন্নতি বিশেষ কিছুই পরিলক্ষিত হয় নাই; বরঞ্চ অনেক বিষয়ে যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছে। বিশেষ

আক্ষেপের ও লজ্জার বিষয় এই যে প্রায় তিন বৎসর হইল আমাদের দেশের শাসনতন্ত্র বিদেশী প্রভাবমুক্ত হইলেও, এবং আমাদের স্বদেশীয়গণদ্বারা রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালিত হইতে থাকিলেও, শিক্ষা-বিষয়ে যে পরিমাণ দরদ, দূরদৃষ্টি ও ন্যায়নিষ্ঠা আশা করা গিয়াছিল কর্তৃপক্ষগণের নিকট হইতে, তাহার বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় নাই।

তাছাড়া, নৈতিক আদর্শের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে, বিগত বৎসরে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপ্রতিষ্ঠান যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, তাহার বিবিধ ব্যাপারে যে সব গলদ ও দুর্নীতি জনসাধারণের সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তাহাতে শিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রেই লজ্জায় অধোবদন হইয়াছেন। এতৎসম্পর্কে কমিটির পর কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে, আলোচনার বাদ-বিতণ্ডারও অন্ত নাই, অথচ এযাবৎ কোন প্রতিকার-ব্যবস্থা ত দূরের কথা, অনুসন্ধান কমিটির বিবরণ বা রিপোর্ট পর্য্যন্ত সাধারণ্যে প্রকাশের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। গভীর লজ্জা ও পরিতাপের কথা। ছাত্রসমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ও দুর্নীতির কথা ত আমরা অহরহঃই শুনিতে পাই : কথাটা অলীক নহে, পরন্তু বহুল পরিমাণে সত্য ও সর্ব্বথা নিন্দনীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্রবাক্য ত ভুলিলে চলিবে না—"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং"—শ্রদ্ধাই জ্ঞানলাভের উপায়। কিন্তু যদি শিক্ষিত-সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের কার্য্যকলাপে তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাই ছাত্রসমাজ হারাইয়া ফেলে, তবে ছাত্র-সমাজের চারিত্রিক উন্নতি ও প্রকৃত

জ্ঞানার্জ্জনের সম্ভাবনা আর থাকে কোথায়? শিক্ষকদিগের, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা-বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তি-দিগের, দায়িত্ব গুরুতর ; সে বিষয়ে তাঁহাদিগকে সচেতন হইতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, "যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ তত্তদেবেতরো জনঃ," "আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরে শিখাও" প্রভৃতি আমাদের দেশ-প্রচলিত উপদেশগুলি ফাঁকা কথা নহে। বস্তুতঃ এই সমস্ত বাণীর সত্যতা ও সার্থকতা শাশ্বত ও সনাতন। ইহাদের উপরই সমাজ-কল্যাণ নির্ভর করে। ভরসা করি সমাজপতিগণ এই শাশ্বত উপদেশ বিস্মৃত হইবেন না।

তারপর, শিক্ষক-সমাজের প্রতি সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের পরম ঔদাসীন্যের কথা। বক্তৃতার সময়ে আমরা শিক্ষকের মহনীয় আদর্শ সম্বন্ধে পঞ্চমুখ হই ; কথাটাও মিথ্যা নহে ; আদর্শ বাস্তবিকই মহৎ। কিন্তু শিক্ষককে যদি সেই আদর্শ অনুসারে জীবনযাপন করিতে হয়, তবে অন্ততঃ তাহার জীবনরক্ষা হইতে পারে এমন ব্যবস্থা ত সমাজ ও রাষ্ট্রের করিতেই হইবে। জীবনই যদি দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল, জীবনযাপনই যদি দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল, প্রাণ রাখিতেই যদি প্রাণান্ত হইল, তাহা হইলে আদর্শ অনুসরণের আর অবকাশ রহিল কোথায়? একটা গল্প মনে পড়িল। এক সভাতে জনৈক বক্তা আধ্যাত্মিক ধরণের বক্তৃতা করিতে করিতে শ্রোতাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, Man does not live by bread alone ; একজন শ্রোতা তদুত্তরে বলিয়া উঠিলেন, Yes, he also requires butter!

গল্পটিতে যথেষ্ট শিক্ষার বিষয় আছে। আমাদের এই বাঙ্গালাদেশে bread and butter এখন আল্‌নাস্কারের স্বপ্নবিলাস মাত্র, সামান্য ডাল-ভাতের সংস্থান করাই শিক্ষকের পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। ১৯৩৯ সনের অর্থাৎ মহা-সমর-পূর্ব্ব বৎসরের দ্রব্যমূল্য-মানকে ১০০ ধরিয়া লইয়া অর্থবিদ্‌গণের নির্ণীত বর্ত্তমান দ্রব্যমূল্যের index number বা সূচকসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৪০০-র কাছাকাছি, অর্থাৎ চতুর্গুণ, আর যদি ১৯০০ সালের দ্রব্যমূল্য-মান ধরা যায়, তাহা হইলে বোধ করি বর্ত্তমান দ্রব্যমূল্য দাঁড়াইবে চতুর্দ্দশগুণ। সুতরাং ১৯০০ সনে যদি কোন শিক্ষক বেতন পাইতেন ৫০৲ টাকা (এবং অনেকেই তাহা পাইতেন), দ্রব্যক্রয়-শক্তি হিসাবে তাঁহার বেতনের মূল্য বর্ত্তমানের ৭০০৲ টাকার সমান। স্কুলের কোন শিক্ষক আজ ৭০০৲ টাকা বেতন পাইতে পারেন, ইহা তাঁহার কল্পনারও অতীত। বর্ত্তমান বাজারেও হাইস্কুল শিক্ষকের গড়ে মাসিক বেতন বোধ করি ৭০৲ টাকার অধিক হইবে না, অর্থাৎ ১৯০০ সনের ৫৲ টাকা বেতনের সমান। ইহার উপরে আর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

শিক্ষকদিগের এই অবর্ণনীয় দুরবস্থা ও অর্থ-সঙ্কটের বিষয়ে বহু আলোচনা হইয়াছে; আপনাদের সমিতির পক্ষ হইতেও যথেষ্ট আন্দোলন হইয়াছে; কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট অনেক দরবার হইয়াছে, অনেক deputation গিয়াছে; কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে আড়াই-হাজারী তিন-হাজারী মন্ত্রী মন্‌সব্‌দারগণের

নিকট হইতে মৌখিক কিছু কিছু আশ্বাসবাণী ব্যতীত বিশেষ কিছুই সুফল পাওয়া যায় নাই। শিক্ষা-বিষয়ে ও শিক্ষক সম্পর্কে সরকারী ঔদাসীন্য ও কার্পণ্য ত এই প্রকার; অথচ নানাবিধ বিলাসব্যসনে পোষাকী আড়ম্বরে সরকারী বদান্যতার অন্ত নাই। মহা-চীন হইতে পেরু পর্য্যন্ত নানা দেশ-বিদেশে ছাপ্পান্ন দফা ভারতীয় রাজদূতাবাস বসিয়া গিয়াছে; কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয়ে সেই সব দেশে রাজসিক ধরণে বিভিন্ন প্রাসাদ ক্রয় করা হইয়াছে; তদনুপাতী বেশ-ভূষা, সাজ-সরঞ্জাম, যান-বাহন প্রভৃতির জন্যও বরাদ্দের সীমা নাই। কমিটি, কমিশন, ডেলিগেশন প্রভৃতিরও অবধি নাই। প্রজাসাধারণের ব্যয়ে বিমানযোগে মন্ত্রী ও প্রতিনিধিদিগের বিশ্ববিহার ত লাগিয়াই আছে; এমন অবস্থা হইয়াছে যে একটা প্রবচনই দাঁড়াইয়া গিয়াছে—Join the Government of India and see the world! কলিকাতার তলদেশ খনন করিয়া নল-মার্গ প্রবেশ করান যায় কি না, বঙ্গোপসাগরে গভীর জলের মাছ ধরিবার ব্যবস্থা করা যায় কি না, এই সব বিষয়ে গবেষণা করিবার জন্য ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবার নিমিত্ত কোন মন্ত্রী চলিলেন প্যারিসের under-world-এ, কোন কর্ম্মচারী উড়িলেন ডেন্‌মার্কে, ইত্যাদি। রাজসিক আড়ম্বরের অন্ত নাই। কিন্তু বিদ্যালয়ের দরিদ্র শিক্ষকদের বেলায় সরকারের প্রসারিত অঙ্গুলি একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া যায়। Dearness Allowance বরাদ্দ হয় মবলগ মাসিক ৫৲ টাকা

অর্থাৎ পঞ্চ তঙ্কা, বা ৮০ আনা বা ৩২০ পয়সা; সঙ্গে সঙ্গে আরও ফতোয়া জারী হয় যে, কোন স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষ ইচ্ছা ও সামর্থ্য থাকিলেও ১০৲ টাকার বেশী D.A. দিতে পারিবেন না (বলাই বাহুল্য, উক্ত ১০৲ টাকার মধ্যে মহামান্য সরকার বাহাদুর প্রদত্ত ৫৲ টাকাও ধরা হইবে), এবং যদি কোন স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষ অতিরিক্ত দয়াপরবশ হইয়া এই আইন অমান্য করে এবং একুনে ১০৲ টাকার অধিক D.A. দিয়া ফেলে, তবে সেই বে-আদবীর ফলে সেই স্কুলের grant-in-aid বা সরকারী সাহায্য বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। হাল ১৯৫০ সনে প্রচারিত সরকারী grant-in-aid rules-এর অনুশাসন এবম্প্রকার। বেতনাদি সম্বন্ধেও যে স্কেল সরকার খাড়া করিয়াছেন তাহাও এইরূপ হৃদয়হীন কৃপণতারই পরিচায়ক। এ ত গেল অর্থের দিক্ দিয়া।

শিক্ষকের অধিকারের বিষয়েও আলোচনা করা যাউক। শিক্ষাসংস্কার সম্পর্কে কমিশন বসিয়াছে নেহাৎ কম নহে—এই সেদিনও রাধাকৃষ্ণন্ মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক কমিশন বসিয়াছিল, এবং তাহার রিপোর্টও যথারীতি প্রকাশিত হইয়াছে। ভাল ভাল sentiment তাহাতে পাওয়া যায়। তেত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যে স্যাড্‌লার কমিশন বসিয়াছিল, তাহাতেও ভাল ভাল আদর্শ পরিকল্পনার কোন ত্রুটি ছিল না; কিন্তু সে কমিশনের বড় বড় তের ভল্যুম পোকাতেই কাটিতেছে। রাধাকৃষ্ণন্ কমিশনের ভল্যুমগুলির কি অবস্থা হইবে, তাহাও

সরকারী বিধাতারাই বলিতে পারেন। এ ছাড়া সার্জ্জেণ্ট সাহেবের রিপোর্টও বহু দিন পূর্ব্বে বাহির হইয়া এতদিনে পুরাতন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই সকল পরিশ্রমই নেহাৎ গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্ম ; সফল করা বা কার্য্যে পরিণত করা সহজ নহে : ইহার মুখ্য কারণ হইল "মুদ্রা-দোষ", অর্থাৎ চিরন্তন অর্থাভাব—অবশ্য শিক্ষা-বিষয়ে।

শিক্ষকের অধিকারের কথা বলিতেছিলাম। শিক্ষা-বিষয়ক যে সমস্ত আইন-কানুন-বিধি প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা দৃষ্টে ইহাই অনুমিত হয় যে শিক্ষা-বিষয়ে কথা বলিতে, শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিতে, শিক্ষা-পরিষদ্ প্রভৃতিতে যোগদান করিতে আর সকলেরই অধিকার আছে—মোক্তারের আছে, ডাক্তারের আছে, ব্যবসাদারের আছে, সরকারী কর্ম্মচারীর ত কথাই নাই—নাই কেবল শিক্ষকদিগের। উদাহরণ হাতের কাছেই আছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে যে Secondary Education Act পাস হইয়াছে, যাহা দ্বারা যাবতীয় স্কুল ও স্কুলের শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা হইবে, তাহাতে মূল যে বোর্ড স্থাপিত হইবে, তাহাতে সভ্য-সংখ্যা মোট হইবে ৪৪ জন, তন্মধ্যে স্কুলের শিক্ষকগণের মধ্য হইতে প্রতিনিধি থাকিবেন কয় জন আন্দাজ করিতে পারেন? ৫ জন পুরুষ শিক্ষক ও ২ জন শিক্ষয়িত্রী—একুনে মোট ৭ জন। স্বদেশী সরকারের এই সব বিধি-ব্যবস্থা দৃষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক আলোচনাদি করাই কঠিন হইয়া পড়ে।

তারপরে, পাঠ্যনির্ব্বাচন বা সিলেবাস সম্বন্ধে। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কেহ যে অভিনিবেশপূর্ব্বক কদাপি চিন্তা করেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সিলেবাস সম্বন্ধে দুই প্রকার কর্ম্মধারার পরিচয় পাওয়া যায়। হঠাৎ হয়ত একজন পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি এবিষয়ে কর্ণধার হইয়া বসিলেন, তিনি স্থির করিলেন, একটা "নতুন কিছু" অবশ্যই করিতে হইবে; সুতরাং তিনি পূর্ব্বাপর বিশেষ বিবেচনা না করিয়াই অনতিবিলম্বে একটা "নতুন কিছু" করিয়াই বসিলেন; নিরুপায় অসহায় ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিলেন; সুতরাং কিছুদিন পরে সেই "নতুন কিছু" নাকচ হইয়া গেল। এই হইল এক প্রকার কর্ম্মধারা। অপর এক কর্ম্মধারা হইল প্রাতঃস্মরণীয় নিউটন সাহেবের First Law of Motion-এর কিংবা Law of Inertia-র অনুযায়ী: অর্থাৎ যাহা আছে তাহাই থাকুক, বিশেষ উচ্চবাচ্য বা সোরগোল বা ধাক্কাধাক্কি না হইলে কে আবার অদলবদল করে? এই দ্বিবিধ ধারার কোনটিতেই মস্তিষ্ক পরিচালনার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। সুতরাং অচলায়তন অচলই থাকিয়া যায়।

যাহা হউক, এ বিষয়ে আর পুঁথি বাড়াইতে চাহি না। আপনারা অসহায় নিরুপায় শিক্ষকগণের প্রতিনিধি হইলেও একত্র হইয়া একটা সভায় যখন সমবেত হইয়াছেন, তখন আপনাদের ধৈর্য্যেরও একটা সীমা আছে। আমি সেই সীমা লঙ্ঘন করিতে ভরসা করি না। আমার শুধু আপনাদের

নিকট এই নিবেদন ও এই প্রার্থনা যে, অতীব নৈরাশ্যজনক ও প্রতিকূল অবস্থার আবেষ্টনী সত্ত্বেও আপনারা বিশ্বাস ও সাহস হারাইবেন না। আপনারা অনেক সহ্য করিয়াছেন, দেশের অসীম দুর্গতি হইয়াছে, দুঃসহ সঙ্কটের মধ্যে আমরা সকলে পড়িয়াছি—কিন্তু ভরসা আছে পরম করুণাময় বিধাতা একদিন মুখ তুলিয়া চাহিবেন, এবং দেশভক্ত কবি দ্বিজেন্দ্রলালের উজ্জ্বল ভবিষ্যদ্বাণী অচিরে সফল হইবে ঃ

যদিও মা তোর দিব্য আলোকে
ঘিরে আছে আজি আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা
ভাতিবে আবার ললাটে তোর।
আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা—
মানুষ আমরা, নহি ত মেষ।
দেবী আমার, সাধনা আমার,
স্বর্গ আমার, আমার দেশ।

বন্দে মাতরম্

৩১শে আষাঢ়, ১৩৫৭।

বিবেক-বুদ্ধি

বিবেক-বুদ্ধি

মনে পড়ে থিয়োডোর পার্কারের জীবনীতে পড়িয়াছিলাম যে, পার্কার যখন বালক মাত্র, তখন একদিন তিনি একটি কূর্ম্ম দেখিতে পাইয়া তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে, হঠাৎ তাহার হৃদয়ের মধ্য হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল, "কি কর, কি কর, উহাকে মারিও না," এবং তিনিও সে বাক্য অবহেলা করিতে পারিলেন না। তিনি বাটীতে ফিরিয়া জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, আমাকে ওরূপ করিয়া কে নিষেধ করিল ?" জননী বলিলেন. "উহার নাম বিবেক, সর্ব্বদা উহার কথা শুনিয়া চলিও।"

এই আখ্যায়িকাটিতে যে বিবেকের কথা উল্লেখ করা হইল, সাধারণ ধর্ম্মশাস্ত্রে ও নীতিজ্ঞানমূলক গ্রন্থাদিতে ইহাকে খুব উচ্চস্থান প্রদান করা হয়। সাধারণতঃ বিবেক-বুদ্ধি সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা প্রচলিত আছে, তাহা কতকটা এই প্রকার যে, সংসারে নানা প্রলোভন নানা বিপদের মধ্যে মানুষের যে চিত্তবৃত্তি তাহাকে সর্ব্বদা সৎপথে পরিচালিত করে, ধর্ম্মের দিকে উৎসাহিত করে, তাহাই বিবেক। বিবেক কখনও মিথ্যার অধর্ম্মের অন্যায়ের প্রশ্রয় দেয় না, সুতরাং সব সময়েই বিবেকানুমোদিত পথে বিচরণ করাই শ্রেয়ঃ ও যুক্তিযুক্ত। সংসার-সমুদ্রে গন্তব্য পথ নির্দ্ধারণ পক্ষে বিবেকই অভ্রান্ত দিঙ্‌নির্ণায়ক যন্ত্র।

একথা নিঃসন্দেহ যে, যদি এই প্রকার কোন আশ্চর্য্য ক্ষমতা মানুষের অন্তরে থাকিয়া থাকে, তবে মানুষ ভাগ্যবান্। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এই রকম কোন ক্ষমতা মানুষের বাস্তবিক আছে কিনা, বিবেক বলিয়া কোন অভ্রান্ত বুদ্ধি মানুষের চিত্তবৃত্তির মধ্যে স্থান পায় কিনা? হঠাৎ শুনিয়া মনে হইতে পারে যে, এ প্রশ্ন নিরর্থক; কারণ, আমরা বিবেকের বাণীর কথা এতই অহরহঃ শুনিয়া আসিতেছি যে, বিবেকের অস্তিত্বে সন্দেহ করা পরম দুঃসাহসের কথা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রশ্নটি মোটেই অলীক অথবা কাল্পনিক নহে। মানুষ দেশ-কাল-পাত্র নির্ব্বিশেষে সমস্ত অবস্থায় সকল বিষয়ে নৈতিক বিচার ও ন্যায়ান্যায়ের সমাধান বিশুদ্ধরূপে এবং অভ্রান্তরূপে করিতে

পারে কিনা, তাহা গুরুতর সন্দেহের বিষয়। এমন কি যদি ধীর ভাবে বিচার ও আলোচনা করিয়া দেখি, তবে বরং ইহাই আমাদের চক্ষে পড়ে যে কালভেদে দেশভেদে ও অবস্থাভেদে মানুষের নৈতিক বুদ্ধির গুরুতর তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

বিবেক-বুদ্ধিকে আমরা এই জন্যই উচ্চস্থান দিয়া থাকি যে তদ্দ্বারা আমরা নৈতিক বিচার, সত্য-মিথ্যা নির্দ্ধারণ, ন্যায়ান্যায় নিরূপণ নির্ভুল রূপে করিতে পারি। কোন একটা সামাজিক রীতি ভাল কি মন্দ, কোন একটা কার্য্য করণীয় অথবা পরিহার্য্য, এই সমস্ত বিচার আমরা যাহা দ্বারা করিয়া থাকি, তাহারই নাম দিয়া থাকি বিবেক। কিন্তু মানুষ এই প্রকার বিচার সব সময়ে সব অবস্থাতে একই রকমে করে না। যদি বিভিন্ন সমাজের বিষয় আলোচনা করি—এমন কি, একই সমাজের বিভিন্ন অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করি—তাহা হইলে দেখিতে পাই যে একই বিষয়ে বিভিন্ন সমাজে ও একই সমাজে বিভিন্ন অবস্থায়, মতামত কতই বিভিন্ন। যে আচার-পদ্ধতি এক সমাজ নীতি ও ধর্ম্ম বিগর্হিত বলিয়া মনে করিতেছে, সেই একই আচার-পদ্ধতিতে অন্য এক সমাজ কোন দোষ দেখিতে পাইতেছে না। দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ধরা যাউক বিবাহের পদ্ধতি। কোন সমাজ বাল্য-বিবাহ সমর্থন করে, কোন সমাজ ইহাকে বিষবৎ ত্যাগ করে; কোন সমাজ অনুরাগ-মূলক বিবাহকে খুব উচ্চস্থান দেয়, কোন সমাজে উহাকে দুর্নীতিরই নামান্তর বলিয়া ধরা হয়; কোন দেশে বিধবাদের বিবাহ অবাধে প্রচলিত, অপর দেশে বিধবা-বিবাহ

সমাজের চক্ষে নিতান্ত হেয় এবং ঘৃণ্য। এই মত-বৈষম্যের ভিতরে কোন্‌টাকে ঠিক মত বলিয়া গ্রহণ করিব? অবশ্য যথার্থ ধার্ম্মিক পুরুষ—যাঁহাদিগকে আমরা বিবেকী পুরুষ বলিয়া নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিতে পারি—তাঁহারা সব দেশেই আছেন। কিন্তু তাঁহাদের বিবেক এই সমস্ত প্রথা-পদ্ধতি বিষয়ে কি উপদেশ দেয়? উপদেশ যাহাই হউক তাহাতে ঐকমত্য নাই, ইহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

কথা উঠিতে পারে যে, যে দৃষ্টান্তগুলি উপরে প্রদত্ত হইল অথবা সহজে ঐ প্রকার যে সব মত-বৈষম্যের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, তাহা বাস্তবিক ধর্ম্ম-জগতের ভিতরের কথা নহে; ঐগুলি কতক পরিমাণে বাহিরের জিনিষ, সুতরাং ঐ বিষয়ে যথার্থ বিবেকবান্ লোকের ভিতরেও মতান্তর হওয়া সম্ভব; কিন্তু এমন কতকগুলি সত্য আছে, এমন কতকগুলি নীতি আছে, যাহাদের উল্লেখমাত্রেই সকল লোকে এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকে, হাঁ, ইহাই ঠিক বটে, এবং এ সম্বন্ধে কোন দুই মত উঠিতেই পারে না। এই বিষয়েও একটু আলোচনা প্রয়োজন। যদি ধরিয়াই লই যে, নৈতিক জগতে কতকগুলি অবিসংবাদিত বিষয় আছে, তাহা হইলেও আমরা বিবেককে সহজে বাঁচাইতে পারি না। কারণ একথা ঠিক যে, ঐ কয়েকটা অবিসংবাদিত বিষয় অবলম্বন করিয়াই মানব-সমাজের যাবতীয় ক্রিয়া-কলাপ অনুষ্ঠিত হইতেছে না। সুতরাং এমন অনেক বিষয় আমাদের প্রত্যহ বিচার করিতে হয়, যাহা অবিসংবাদিতের কোঠায় পড়ে না।

কাজেই সেগুলি সম্বন্ধে বিভিন্ন বিবেকী লোকেরও বিভিন্ন মত হওয়া সম্ভব। বিবেকের অভ্রান্ততা সুতরাং রহিল কোথায়?

দ্বিতীয়তঃ, কোন অবিসংবাদিত নৈতিক সত্য আছে কিনা, সেটাও তর্কের বিষয়। দুই একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। মিথ্যাভাষণ দূষণীয়, নরহত্যা মহাপাপ, পরস্বাপহরণ অন্যায়—এই সব নীতিকে সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া আমরা একরকম মোটামুটি ধরিয়া লইতে পারি। শাদা কথাগুলি এইভাবে লিপিবদ্ধ করিলে ইহাতে বিশেষ মতভেদও হইবে না। কিন্তু দেশ-কাল-পাত্রভেদে অবস্থার বিপর্য্যয়ে এই সকল নীতিতেও সকলে সম্মতি প্রদান করেন কিনা সন্দেহের বিষয়। নরহত্যা যে মহাপাপ, আজিকালিকার সভ্য সমাজে মোটামুটি সর্ব্বত্রই সেকথা স্বীকৃত হয়; কিন্তু যখন এক সমাজের সহিত অন্য সমাজের স ঘর্ষ উপস্থিত হয়, জাতিতে জাতিতে সংগ্রাম বাধিয়া উঠে, তখন নরহত্যা সম্বন্ধে লোকের বিবেক কি বলে? তখন কি শত্রুহন্তা লোক-চক্ষে ঘৃণিত হয়, অথবা সমাজে খ্যাতিলাভ করে? নিজের মনেও কি সে অত্যন্ত লজ্জিত থাকে, অথবা দেশের শত্রুর নিধন-সাধনে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করে? সময়োপযোগী নীতিশাস্ত্র তখন ঘোষণা করিতে থাকে, "আততায়িবধে দোষো ন হি ভবতি কশ্চন।"

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার "হাসির গানে" একস্থলে ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন, "অমন অবস্থায় পড়লে সকলেরই মত বদলায়।" বাস্তবিকই বিবেক-বিভ্রাট অবস্থা বিপর্য্যয়েই ঘটিয়া থাকে। এই

মাত্র যে দৃষ্টান্ত দিলাম, ইহা ত বর্ত্তমান সভ্য মানব সমাজের নৈতিক বিচার-ব্যতিক্রমের একটি দৃষ্টান্ত। বিভিন্ন যুগের সমাজের, বিভিন্ন স্তরের সমাজের মতামত আচার-ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিলে ব্যতিক্রম আরও স্পষ্টরূপে প্রতীত হইবে। সতীদাহ ভাল না মন্দ? এখন আমরা ইহাকে মন্দই মনে করিয়া থাকি, কিন্তু বহু শতাব্দী ধরিয়া হিন্দু-সমাজের বিবেকের ইহা সম্পূর্ণ অনুমোদিত ছিল; এমন কি এখনও সতীধর্ম্মের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যাঁহারা অতিরিক্ত মাত্রায় জাগরূক, তাঁহারা জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় সতীর স্বেচ্ছায় দেহ-ত্যাগের ভিতরে সৌন্দর্য্য ও মহিমাই দর্শন করিয়া থাকেন। নরবলি ভাল না মন্দ? এই প্রশ্ন করিতেও এখন আমরা শিহরিয়া উঠি; কিন্তু ইহা এক কালে প্রায় প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক জাতির মধ্যে ধর্ম্মের অঙ্গরূপে অনুষ্ঠিত হইত। সেকালের ও তত্তদ্দেশের বিবেক ইহার বিরুদ্ধবাদী ছিল না। দৃষ্টান্ত বাড়াইবার আর বোধ হয় প্রয়োজন নাই। দেশ কাল ও অবস্থা ভেদে নৈতিক বিচারের ব্যতিক্রম এতই সাধারণ এবং সর্ব্বদা পরিদৃষ্ট হয় যে, এ বিষয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করা বাহুল্য বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু ইহাতে বিবেকের নিশ্চয়তা ও ভ্রান্তিহীনতা থাকে কোথায়?

বিবেকের ভ্রান্তিহীনতা এবং নিশ্চয়তা যদি না থাকে, যদি বিবেকের বিচার অবস্থার তারতম্যের উপর নির্ভর করে, অনুরাগ ও বিরাগ দ্বারা আন্দোলিত হয়, সমাজের আবেষ্টনের

দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে বিবেক বলিয়া একটা অপৌরুষেয়, অভ্রান্ত ও নিশ্চিত চিত্তবৃত্তির কল্পনা আমরা খাড়া করি কেন? বস্তুতঃ নিরবলম্ব নিরপেক্ষ অপরির্ত্তনীয় নিশ্চিত বিবেক বাস্তবিকই এক অলীক কল্পনা মাত্র বলিয়া মনে হয়।

তবে কি ইহাই আমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে নৈতিক জীবনে যে অভিজ্ঞতা হইতে বিবেকের অস্তিত্ব অনুমিত হইয়াছে, সে অভিজ্ঞতাও অলীক? পার্কারের যে গল্প এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে উল্লিখিত হইয়াছে, বাস্তবিকই কি আমাদের প্রত্যেকের নিজের জীবন হইতে ঐ প্রকার ঘটনার সাক্ষ্য দিতে পারি না? মানুষ যখন একটা কাজে প্রবৃত্ত হয়, তখন কি ঐ জাতীয় নানা প্রকার নিষেধ দ্বিধা দ্বন্দ্ব উত্থিত হয় না? এই সব অভিজ্ঞতার যাথার্থ্য অস্বীকার করিলেও ত চলিবে না। এই সব প্রশ্ন, এই সব দ্বিধা, এই সব নিষেধ যদি সত্য সত্যই আমাদের মনে জাগে, তবে ইহার কারণ কি?

ইহার কারণ এক কথায় বলিতে গেলে, সংস্কার। কোন জীবই নিরবলম্ব, আত্মস্থ, আত্মপ্রতিষ্ঠ নহে। সে এক বিরাট্ সমাজের অঙ্গীভূত—যে সমাজ তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছে, তাহার পিতৃপিতামহকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছে, তাহার সমস্ত পূর্ব্ব-পুরুষকে আপনার আবেষ্টনীর ভিতরে বর্দ্ধিত করিয়াছে, আপনার ভাবধারায় তাহাদের মানস-শরীরকে পুষ্ট করিয়াছে। সেই ভাবের ও সেই আবেষ্টনের প্রভাব নবজাত জীবের শরীরে ও মনে নিহিত রহিয়াছে। তার পরে শিশু যখন বাড়িয়া

উঠিতে থাকে, তখনও ত সে সমাজকে এড়াইতে পারে না ; সমাজের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি শিল্প-সাহিত্য তাহার মনকে এক বিশেষ ছাঁচে গড়িয়া তুলে ; তাহার নৈতিক জ্ঞান ও সংস্কার সমাজের প্রচলিত সংস্কারের অনুরূপভাবেই মোটামুটি বিকশিত হইয়া উঠিতে থাকে। সুতরাং বিভিন্ন সমাজের ভিতরে প্রচলিত সংস্কার ও অবস্থা যে পরিমাণে পৃথক্, সেই সেই সমাজের ব্যক্তিগণের নৈতিক ধারণা ও বিবেকও সেই পরিমাণেই পৃথক্। যে সমাজ যে সমস্ত আচার-ব্যবহারকে নিজের রক্ষা ও পুষ্টির অনুকূল বলিয়া নিজের বহুকাল-সঞ্চিত অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারে, সেই সমাজ সেই সমস্ত আচার-ব্যবহারকেই অনুমোদন এবং ধর্ম্ম-সঙ্গত বলিয়া মনে করে।

অবশ্য এমন কতকগুলি ব্যাপার আছে যাহা প্রায় সকল সমাজেই তুল্যরূপে নিন্দিত হইয়া আসিতেছে—যেমন নরহত্যা। মানব-জাতির শৈশব অবস্থায় মানুষের সমাজ-বন্ধন দৃঢ় ছিল না, একরকম ছিল না বলিলেই হয়। তন্মধ্যে যে সমস্ত মানব-মণ্ডলীর মধ্যে বেশী সদ্ভাব ছিল, সেই সব মণ্ডলী জীবন-যুদ্ধে অপরাপর মণ্ডলীকে পরাস্ত করিয়া জয়ী হইয়াছে এবং জগতে টিঁকিয়া রহিয়াছে। তাহারা দেখিল যে, তাহাদের নিজেদের মধ্যে পরস্পরের হত্যা যদি চলিতে থাকে, তবে তাহারা কখনই পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য মণ্ডলীর সহিত যুদ্ধ করিয়া টিঁকিয়া থাকিতে পারিবে না। সুতরাং সমাজের মধ্যে নরহত্যা অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ বলিয়া সাব্যস্ত হইল। কিন্তু সমাজের বাহিরে নরহত্যা

অর্থাৎ অন্য সমাজের লোককে হত্যা করা কিছুমাত্র দূষণীয় মনে হইল না। অবশ্য ক্রমে সমাজের গণ্ডীর প্রসার হওয়াতে নরহত্যা সম্বন্ধে প্রতিকূলতা ও ঘৃণা ক্রমেই বদ্ধমূল হইতে লাগিল, এবং নির্দ্দোষ নরহত্যার গণ্ডী ক্রমশঃই সঙ্কীর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু এখনও নির্দ্দোষ নরহত্যার ধারণা যে লুপ্ত হইয়াছে তাহা নহে—বর্ত্তমান সভ্য মানবের যুদ্ধ-বিগ্রহই তাহার প্রমাণ। সে যাহা হউক, মানুষের নৈতিক সংস্কার প্রধানতঃ পিতৃ-পরম্পরাগত সমাজ-প্রচলিত সংস্কারের ছায়া মাত্র। অবশ্য এই স স্কারও যে সর্ব্বদাই একরূপ অপরিবর্ত্তনীয় স্থাণু হইয়া বসিয়া আছে তাহাও নহে। মানুষের অভিজ্ঞতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই সংস্কার সকলও উন্নত ও প্রসারিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়া উঠিতেছে; এবং অবস্থার আবেষ্টনীর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বুদ্ধি ও সংস্কার অভিব্যক্ত ও বিকশিত হইয়া উঠিতেছে বলিয়াই মানুষ জগতের সংগ্রামে এখনও টিঁকিয়া আছে।

এই সহজ এবং অর্জ্জিত, inherited and acquired, উভয়বিধ সংস্কারের সমাবেশেই মানুষের নৈতিক জীবনের ভিত্তি। ইহার উপরে নির্ভর করিয়াই মানুষ তাহার যত প্রশ্নের সমাধান করিয়া থাকে। ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত, ভাল-মন্দ প্রভৃতির মাপকাঠি এই সংস্কারেই নিহিত। ইহা ব্যতিরেকে কোন দৈবলব্ধ প্রত্যক্ষ intuitive বিচার-প্রণালী নাই—থাকিলে বিচার-প্রণালী সর্ব্বত্র সমান হইত। মানুষ যখন কোন কাজে অগ্রসর হয়, তখন যদি তাহা এই সংস্কারের বিরোধী হয়, তবে

এই সংস্কারই নিষেধ-আজ্ঞা প্রচার করে, সংশয় আনয়ন করে, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। ব্যক্তিগত সুখ-লাভের জন্য যখন লোকে চেষ্টিত হয়, তখন তাহার ভিতরের সামাজিক জীবটি হয়ত বাঁকিয়া বসে, হয়ত বলে, উহা করিও না।

সামাজিক প্রয়োজনই মূলতঃ বিবেকের সৃষ্টিকর্ত্তা হওয়ায় বিবেকের সঙ্গে আর একটি জিনিষের কতকটা সাদৃশ্য ও সাহচর্য্য দেখা যায়। সে জিনিষটি লোকমত। অধিকাংশ স্থলেই বিবেক ও লোকমত অভিন্ন। ইহাই স্বাভাবিক। মানুষ যখন সমাজেরই সন্তান, তখন সমাজ-প্রচলিত মতামত ও তৎসমাজস্থ মানুষের বিবেক প্রায়ই পরস্পর পরস্পরের অনুরূপ; এবং বিবেকের দংশন এবং লোকনিন্দা-জনিত মনঃপীড়া, ইহাদের ভিতরেও গুণগত অনেকটা সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য একথা স্বীকার্য্য, এমন লোক আছেন, যাঁহাদের বিবেক এতটা উন্নত যে লোকমত অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের বিবেকানুমোদিত কার্য্য করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন। ইহার কারণ এই যে, তাঁহারা প্রচলিত সামাজিক সংস্কারকে তাঁহাদের নিজেদের যুক্তিবলে কতকটা অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন।

লোকমত এবং বিবেকের সাহচর্য্য ত প্রতিদিনই আমরা দেখিয়া থাকি। যে লোকের বিবেক-বুদ্ধি বিশেষ প্রখর নহে, সেও লোকের নিন্দার ভয়ে বহুল পরিমাণে মন্দ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকে এবং বিবেক-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিও লোকমতের প্রাবল্য হইতে অনেকটা সাহায্য পাইয়া থাকেন। নিজের বিবেকের অননুমোদিত

বিবেক বুদ্ধি

কোন কার্য্য করিতে উদ্যত হইলে মনে যেমন একটা খটকা উপস্থিত হয়, লোকমতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে গেলেও সাধারণতঃ সেই রকমই দ্বিধা উপস্থিত হয়; এবং এই দুই দ্বিধার গুণগত বা qualitative বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। এই জন্যই ইংরাজীতে একটা কথা আছে, "Conscience is the conservative element in human nature"— বিবেকই মানুষের চরিত্রের ভিতরে সংরক্ষণী বৃত্তি। নূতন কিছু করিতে গেলে, অনভ্যস্ত কিছু অনুষ্ঠান করিতে গেলে, অনধিকার কিছু চর্চ্চা করিতে গেলে বিবেক আসিয়া বাধা দেয়। বাস্তবিক সেই বাধা গ্রাহ্য করা উচিত কিনা, সেই দ্বিধার জন্য পিছাইয়া পড়া ঠিক কিনা, সেটা সব সময়ে ঠিক করিয়া বলা যায় না। যুক্তি দ্বারা বিচার করিয়া সে স্থলে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হয়।

বিবেক যুক্তি নহে, প্রধানতঃ ভাব; reason নহে, feeling—অবশ্য সেই feeling বা ভাব বা সংস্কারের পশ্চাতে যথেষ্ট যুক্তি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। কিন্তু মানুষের মনে যখন বিবেকের কোন বাণী উত্থিত হয়, তখন সেটা যুক্তির দোহাই দেয় না, সেটা মানুষের মনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রতিক্রিয়া। ভাব-প্রধান বলিয়াই বিবেক সনাতন-পথাবলম্বী, নূতনকে সে বিশেষ পছন্দ করে না, বরঞ্চ সন্দেহের চক্ষেই দেখিয়া থাকে, এবং গম্ভীর ভাবে সাবধান করিয়া দেয় "অবিবেকঃ পরমাপদাং পদম্।"

বিবেকের এই যে ব্যাখ্যা, জীববিদ্যার তরফ হইতে দেখিলে, সামাজিক ইতিহাসের দিক্ দিয়া দেখিলে, ইহাই মনে হয় সঙ্গত ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যাই বিবেকের বিচার-বিভ্রাটের সমাধান করে, ইহাই বিবেককে তাহার কাল্পনিক উচ্চ সিংহাসন হইতে নামাইয়া আনিয়া তাহার প্রকৃত পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করে। ইহাতে আমাদের আত্মাভিমানের কিঞ্চিৎ হানি হইলেও, বিবেকের প্রকৃত মর্য্যাদার যে বিশেষ কোন হানি হয়, তাহা ত মনে হয় না। বিবেক সংস্কার মাত্র হইলেই যে তাহা তুচ্ছ করিবার জিনিষ তাহা ত নহে; সে সংস্কারের পশ্চাতে একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তিমানবের ভ্রান্তি-সঙ্কুল যুক্তিতর্ক এবং মতিভ্রমকারী রাগদ্বেষ অপেক্ষা বহুগুণে স্থিরনিশ্চিত বিরাট্ মানব-সমাজের বিপুল অভিজ্ঞতা বর্ত্তমান। সেই অভিজ্ঞতাই পিতৃপুরুষক্রমে সমাজে সংক্রামিত হইয়া মানব-সমাজকে বিধৃত রাখিয়াছে। ধর্ম্মে কর্ম্মে, আচারে অনুষ্ঠানে, সেই অভিজ্ঞতা অনুস্যূত হইয়াই সমাজের প্রাণধারা অক্ষুণ্ণ এবং অব্যাহত রাখিয়াছে। সুতরাং ব্যক্তির পক্ষে বিবেককে দৈববাণী বলিলে বিশেষ কিছু অসঙ্গত হয় না। কারণ, সাক্ষাৎ দেবলোক হইতে আহৃত না হইলেও, ইহা পিতৃলোক হইতে প্রাপ্ত মানুষের উত্তরাধিকার; এবং এই উত্তরাধিকারকে অবিকৃত অপরিম্লান রাখিয়া মানুষ যদি এই রিক্থকে আরও নির্ম্মল, আরও উজ্জ্বল, আরও সুন্দর করিয়া তুলিতে পারে, তবেই তাহার সন্তান-ধর্ম্ম সফল হয়।

আষাঢ়, ১৩৩৪।